প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫এ, ক্ষুদিরাম
বসু রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

॥঩॥ সূচীপত্র ॥঩॥

দ্বিতীয় খণ্ড : আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের অনুশীলন

১

কোন দেশের সাহিত্যে বা সমাজ-চেতনায় আধুনিকতার উন্মেষ-মুহূর্ত ঠিক-বে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সকল যুগেই এমন এক একজন ব্যতিক্রমধর্মী লেখক কেন, যাঁহারা সমসাময়িক প্রচলিত আদর্শের সুরে সুর মিলান না—তাঁহাদের লখায় ও মনোভঙ্গীতে ইহার বিরুদ্ধে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়। হিন্দুদর্শনের যুগে বৌদ্ধমতবাদ, এমন কি চার্বাকদর্শনও এই প্রতিবাদমূলক ষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন।

মঙ্গলকাব্য-ধারার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতারা দেবমহিমা-কীর্তনের অন্তরালে নবজীবনের রসকে প্রাধান্য দিয়া এক নূতন বাস্তবতা ও সমাজ-সচেতনতার বর্তন করিয়াছেন। জনজীবনের প্রতি কৌতূহল, দেব-নির্ভরতা-মুক্ত মনের স্বচ্ছন্দলীলা, সমাজের অসঙ্গতির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ব্যঙ্গশরক্ষেপ—এ সবই আধুনিক মনোভঙ্গীর নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে। অন্যান্য ধারার মঙ্গলকাব্যেও বারমাস্যা-বর্ণনা, নারীগণের পতিনিন্দা ও ভোজ্যদ্রব্যের বিস্তৃত তালিকা দৈবনির্ভরশীল সমাজে বাস্তব রসের ফল্গুধারার পরিচয় দেয়। কৃত্তিবাস-কাশী-দাসের রামায়ণ-মহাভারত ও বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলীর ভক্তিরসপ্রধান কাব্যের মধ্যেও বাস্তব জীবনের খণ্ডাংশ আবিষ্কার করা যায়। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় অনার্য-সংস্কৃতির সহিত মিশ্রিত, প্রবল জীবনবেগ-চঞ্চল, এক দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার বাস্তব ছবি চিত্রিত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বীজ যে আদি যুগ হইতেই কাব্যরচনার তলার মাটিতে উপ্ত ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর বীজ

কিন্তু যেমন দুই একটি কোকিলের বিচ্ছিন্ন ডাক বসন্তের আবির্ভাবের প্রমাণ দেয় না, তেমনি ব্যতিক্রমধর্মী দুই একটি কবির অস্তিত্বই যুগচেতনায় বাস্তবতার

প্রসারের নিদর্শনরূপে লওয়া যায় না। মনে হয় যে বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র এই দুইজন কবির বাস্তবতার দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল এবং উভয়েই রাজসভার আবেষ্টনের মধ্যে—অন্ততঃ অভিজাত-সম্প্রদায়ের চোখে—বাস্তব জীবন যেভাবে প্রতিভাত হইত, তাহার যথার্থ প্রতিচ্ছবি আঁকিয়াছেন। উভয়েরই মনোভঙ্গী বস্তুধর্মী ও ব্যঙ্গপ্রবণ ছিল; কিন্তু তাঁহাদের যুগপ্রচলিত কাব্যপ্রথা ও মানস সংস্কার এই বস্তুচেতনার পূর্ণ পরিণতিকে বাধা দিয়াছে। বিদ্যাপতির যুগে ভক্তিবাদের প্রথম উচ্ছ্বাস আধুনিক জীবনবোধকে প্লাবিত করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের যুগে এই ভক্তির নিঃশেষিত-প্রায় ভাবধারা এই জীবন-চেতনার স্বচ্ছন্দ বিকাশকে বাধা দিয়াছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হইতে পারে নাই—ইহার জন্য বস্তুচেতনাসমৃদ্ধ বিদেশী জাতি ও সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের জন্য ইহাকে প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাই ইংরেজ-আগমনের কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্থায়ী আবির্ভাব বিলম্বিত হইয়াছিল।

বিদেশী-সংযোগে আধুনিকতার স্ফূর্তি

আধুনিকতার আবির্ভাবের পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া উহার আগমনের জন্য মানস প্রস্তুতি চলিতে থাকে। সেইজন্য যদিও অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে জাতীয় চেতনাতে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমেই সাহিত্যে আধুনিক মনোভাবের স্থির সঞ্চার লক্ষিত হয়, তথাপি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার পূর্বাভাস ও অনিশ্চিত পদ-চারণা জীবনবোধের মধ্যে এই পরিবর্তনের সূচনা করে। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুরশিদ কুলি খাঁ-র দ্বারা বাংলার সিংহাসন-অধিকার একটি নূতন যুগের প্রারম্ভরূপে গৃহীত হইতে পারে। মুরশিদ কুলি খাঁ দেশে যে নূতন শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব-নীতির প্রবর্তন করিলেন, তাহার ফলে বাংলা দেশ কার্যতঃ দিল্লীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া এক অজ্ঞাতপূর্ব আত্মস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই শাসনে সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের পরিবর্তে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনীতির প্রাধান্যই মূল লক্ষ্যরূপে দেখা দিল। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মবিরোধ, মোগল সাম্রাজ্যের জোর করিয়া চাপানো কেন্দ্রিক প্রশাসন-ব্যবস্থা, বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হঠাৎ গৌণ ও তাৎপর্যহীন হইয়া পড়িল। নূতন নবাবের আমলে হিন্দুরা গুণানুসারে শাসন ও রাজস্বসংগ্রহ-বিভাগের উচ্চতর পদসমূহে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন; রাজানুগ্রহের সমান অংশীদাররূপে হিন্দু-মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ অনেকটা লুপ্ত হইল। মুরশিদ কুলি খাঁ যেমন মোগল দরবারে নির্ধারিত রাজস্ব

১৭০০ খ্রীঃ মুরশিদ কুলি খাঁর সিংহাসন-লাভে নূতন যুগের সূচনা

দাখিল করিয়াই স্বাধীন রাজার সমস্ত অধিকার ভোগ করিতে লাগিলেন, তেমনি তাঁহার অধীনস্থ হিন্দু জমিদারেরাও হিসাবমত খাজনা দিয়া নিজ নিজ এলাকায় অবারিত ক্ষমতায় আসীন হইলেন। নবাব কেবল দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি না হইয়া স্বাধীন বাংলার রাজারূপে দেশবাসীর নিকট প্রতিভাত হইলেন। বাংলা দেশ কেবল দিল্লীর বাদশাহীর অঙ্গমাত্র না হইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন আদর্শের অনুগামী, নিজ অভিরুচি-অনুসারে নিজ জীবনযাত্রা-নির্বাহের অধিকারী রাষ্ট্ররূপে নবজন্ম লাভ করিল। মুরশিদ কুলি খাঁ-র শাসনে যে অত্যাচার-উৎপীড়ন ছিল না তাহা নয়; বরং কোন কোন বিষয়ে দিল্লীর সুদূর-পরিচালিত, শিথিল শাসনব্যবস্থা হইতে আরও কড়াকড়ি ও প্রশ্রয়হীন নিয়মকানুন প্রচলিত হইল। বিশেষতঃ রাজস্ব-আদায় সম্বন্ধে কোনওরূপ চুক্তিভঙ্গ অমার্জনীয় অপরাধরূপে গণ্য হইয়া কঠোর শাস্তির বিষয় হইত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে এই অপরাধে 'বৈকুণ্ঠ'-বাস করিতে ও অকথ্য অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই উৎপীড়নের মূলে খামখেয়ালি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না, ছিল সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অপরাধের জন্য মাত্রাতিরিক্ত নৃশংসতা।

আলিবর্দি খাঁর আমলের রীতি

মুরশিদ কুলি খাঁ-র উত্তরাধিকারী আলিবর্দি খাঁ-র আমলেও এই নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। তাঁহার আমলে বর্গী-আক্রমণের জন্য বাংলা দেশের কোন কোন অংশে যে ব্যাপক লুণ্ঠন ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি বাংলার পল্লীছড়ায় এখনও রক্ষিত আছে। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেও মায়ের মন বর্গীর অত্যাচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ও একদিকে যেমন বর্গীর লুণ্ঠন, অন্যদিকে তেমনি খাজনা দিবার অসামর্থ্য—এই উভয় বিষয়েই সে সমান উদ্বেগ অনুভব করিয়াছে। এই ছড়া অন্ততঃ ইহাই প্রমাণ করে যে, দেশের সাধারণ গৃহস্থের চিন্তা অর্থনীতিপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মধ্যে আধুনিক যুগ-লক্ষণ-প্রকাশ

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন-চ্যুতির ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগোষ্ঠী একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা রাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ ঈর্ষা বা দ্বন্দ্বপ্রসূত নহে—ইহা মূলতঃ নেতৃস্থানীয় প্রজাশক্তির গোপন বিদ্রোহ। মনে হয় ইংরেজ বণিক ক্লাইভ ও ওয়াটসনের সংসর্গের প্রভাবেই এই চক্রান্ত পাশ্চাত্যদেশসুলভ রাষ্ট্রনৈতিক রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজের কূটনীতি ও চক্রান্ত-কৌশল

যে ক্রমশঃ প্রাচ্য রাষ্ট্রজগতে অনুপ্রবেশ করিতেছিল ও ইহার প্রাচীন ধর্মকে পরিবর্তিত করিয়া ইহাকে আধুনিকতার সূক্ষ্মতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছিল, সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তাহার প্রমাণ মিলে। ইহার শুধু ফল নহে, ইহার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিও অনেকটা আধুনিকলক্ষণাক্রান্ত।

আধুনিক মনোভাবের দ্বিতীয় নিদর্শন হইতেছে পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্যনীতি ও দ্রব্যবিনিময়-প্রথার সহিত বাঙালী ব্যবসায়ী-সমাজের পরিচয়। অবশ্য প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগেও বাংলা দেশের বহির্বাণিজ্য উৎকর্ষে ও পরিমাণে নিতান্ত নগণ্য ছিল না। বাংলার সূক্ষ্মশিল্পের চাহিদা দেশের মধ্যেও প্রচুর ছিল। কিন্তু এই বাণিজ্যের প্রসার ও গতি ছিল মন্থর ও স্বাভাবিক নিয়মানুগ—দুর্ভিক্ষ বা অরাজকতা না থাকিলে ইহার মধ্যে কোন অতর্কিত হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যাইত না। ইহা একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণের নিয়মিত কক্ষপথেই আবর্তিত হইত। শিল্পী তাহার বিক্রয় ও লাভের পরিমাণ সম্বন্ধে যে প্রত্যাশা করিত, তাহা প্রায়ই নির্ভুল হইত। কিন্তু ইউরোপীয় বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-স্থাপনের ফলে এই ব্যবসায়ের মধ্যে এমন একটা অনিশ্চিত ও দ্রুতক্রিয়াশীল প্রভাবের সংযোগ হইল, যাহাতে ইহার সম্বন্ধে সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা-সমর্থিত পূর্বধারণা হঠাৎ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। এ যেন বানের জল ঢুকিয়া পুষ্করিণীর জল বাহির করিয়া লইয়া গেল—প্রচুর উৎপাদনের মধ্যে এক কৃত্রিম-নিয়ন্ত্রণজাত অভাবের সৃষ্টি করিল। পলাশীর যুদ্ধের পর যখন ইংরেজ প্রকৃত রাজশক্তির অধিকারী হইল, তখন সে সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে ধ্বংস করিবার আয়োজন করিল। বস্ত্রশিল্পী, নীলচাষী হতবুদ্ধি হইয়া আবিষ্কার করিল যে, তাহাদের পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেন কোন ভোজবাজির দ্বারা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হইল। এই শিল্প-উৎসাদন-ব্যাপারে কয়েকজন বাঙালী দালাল—যাহাদিগকে কোম্পানির বেনিয়ান নামে অভিহিত করা হইত—ব্যবসায়ের সমস্ত অন্ধি-সন্ধির সন্ধান দিয়া ও জোর করিয়া দাদন গছাইয়া—সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল ও কোম্পানির ধনসম্পত্তির কিছু অংশ পাইয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া কলিকাতার নব অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইল। এই বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি-রহস্যের সহিত পরিচয় বাঙালীর আধুনিক মনোভাবকে দৃঢ়ীভূত করিতে সাহায্য করিল।

আধুনিক মনোভাবের দ্বিতীয় নিদর্শন : পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্যনীতির সহিত বাঙালী সমাজের পরিচয়

তৃতীয়তঃ, ইংরেজ শাসনব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার ফলে শাসন সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা

ক্রমশঃ জনসমাজে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ইংরেজের বিচারালয়, রাজস্বনির্ধারণ, দশসালা ও চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত কিছু পরিমাণে পুরাতন ব্যবস্থার অনুসৃতি হইলেও অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনব আদর্শের ও নীতির পরিচয় বহন করিল। বাংলার জনসাধারণ ধীরে ধীরে এই শাসন-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিল ও তাহাদের বৈষয়িক জীবনে আধুনিক চিন্তাধারার প্রভাব অনুভব করিল। সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে ইংরেজদের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল ও পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার তাহাদের মনকে নূতনের দিকে আকর্ষণ করিল। তখনও রীতিমত ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু সমাজ-জীবনে মেলামেশার জন্য ইংরেজী সাহিত্যকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে প্রসারিত হইল। দেশীয় রাজনীতিবিদেরা গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির মর্ম অনুধাবন করিতে লাগিলেন। মহারাজা নন্দকুমার ব্রিটিশ শাসনের আদিযুগের সর্বপ্রথম অর্থনীতি-বিশারদ ও তিনিই প্রথম ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার পথপ্রদর্শক। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব, রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ ইংরেজী শিক্ষা-প্রবর্তনের পূর্বেই ইহা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলেন ও ইহার হিতকর প্রভাব ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সুতরাং যখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার ফলে বাংলা সাহিত্যের উপর আধুনিক মনন ও অনুভূতির প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করিল তখন দেশের প্রগতিশীল ব্যক্তিবৃন্দ উহাকে সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানাইতে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন ও এই আগ্রহপূর্ণ সহযোগিতার জন্যই আধুনিকতার অগ্রগতি এত দ্রুতবেগে সাধিত হইল।

তৃতীয় নিদর্শন : ইংরেজের শাসন-সম্বন্ধীয় আধুনিক ধারণাদির পরিচয়

২

গদ্যের উদ্ভব

প্রাগ্-আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—ইহার মধ্যে গদ্যের একান্ত অভাব। এতাবৎকাল বাংলা ভাষা ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবের ন্যায় কেবল ছন্দোবদ্ধ, নৃত্যশীল পদক্ষেপেই অভ্যস্ত ছিল। গীতিধর্মী, সুরের ছোঁয়াচ-লাগা ধ্বনিপ্রবাহের সাহায্যেই সে সাহিত্যের বিচিত্র কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে

—ইহারই মাধ্যমে সে যুক্তিতর্ক করিয়াছে, গল্প বলিয়াছে, জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় বাঙালীর সমস্ত মনন ও তথ্য-জ্ঞান এক অবিচ্ছিন্ন কাব্যময়, আবেগপ্রধান মনোভাবের মধ্যেই বিধৃত ছিল। সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ জাগিয়া উঠিলেও তাহা যেমন সমুদ্রেরই অংশ, তেমনি উর্ধ্বলোকচারী কল্পনা মাঝে মধ্যে ভূমি স্পর্শ করিলেও উহা বায়ুসঞ্চরণের ছন্দটি ত্যাগ করে নাই। বাংলা সাহিত্য উড়িবার ডানাকে পায়ে হাঁটিবার উপায়-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি পদচারণার চাল অভ্যাস করে নাই। মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে অতিপ্রচলিত পয়ার ছন্দ স্থল ও জলের মধ্যে সংযোজক প্রণালীর কাজ করিয়াছিল বলিয়া ইহা আবেগ ও প্রয়োজনের মধ্যে প্রকাশরীতির পার্থক্য অনুভব ও অনুশীলন করিতে বিরত ছিল। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে পদ্যের গদ্যান্বয় করিলে বা ব্যবহারিক জীবনে সংলাপ-রীতিকে সাহিত্যে প্রয়োগ করিলেই যে গদ্যের অনায়াসে জন্ম হইতে পারিত, সেই সামান্য পরিবর্তন বা অনুসরণের কল্পনাও কোন প্রাগ্-আধুনিক লেখকের মনে জাগে নাই। অথবা যে সংস্কৃতের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সর্বব্যাপ্ত, তাহার দার্শনিক সূত্র ও ভাষ্যও কোন বাঙালী লেখককে অনুরূপ প্রয়োগে প্রেরণা দেয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বকে পয়ারের অসম বিন্যাসের মধ্যে কায়ক্লেশে প্রবেশ করাইয়াছেন, তথাপি গদ্যের কথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ গদ্যে লেখা হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের খঞ্জ, হোঁচট-খাওয়া বাহন প্রয়োজনের কাঁটার বেড়া ডিঙাইয়া সাহিত্যের রাজপথে পদক্ষেপ করিতে কোন দিনই সাহসী হয় নাই। পুঁথি লিখিতে বসিলেই লেখকের কানে যে অস্পষ্ট কাব্যগুঞ্জন ধ্বনিত হইত তাহাই তাহার মুহূর্ত-পূর্বের মুখের কথাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিত।

প্রাগ্-আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ভাষা—পদ্য

যে কোন কারণেই হউক, যখন আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব হয় নাই, তখন এই অভাব-মোচনই যে ইহার মধ্যে আধুনিকতার প্রথম সূচনা হইবে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু এই গদ্যের উদ্ভব হইয়াছে ঠিক অন্তরের প্রেরণায় নহে, বাহিরের প্রভাবে। বাঙালীর মন ঠিক গদ্যানুকূল না হইলেও বাহিরের প্রয়োজন-সাধনের জন্য উহাকে গদ্যচর্চায় ব্রতী হইতে হইয়াছে। যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কৃত্রিম বায়ুসঞ্চালনের ফলে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া প্রবর্তিত হয়, তেমনি কাব্যরসনিমজ্জিত বাঙালী লেখকের ক্ষেত্রেও গদ্যরচনারূপ

বাংলা গদ্যের প্রথম উদ্ভব বাহিরের প্রভাবে ও প্রয়োজনে

আরোপিত কর্তব্যের চাপ ক্রমশঃ স্বভাবকুশলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় পরিণত হইয়াছে। ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মের বাণীপ্রচার ও দেশীয় চিত্তকে আকর্ষণ করিবার প্রয়াস, শাসনকার্যে সুবিধার জন্য তরুণ ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শিখাইবার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০ খ্রীঃ অঃ), মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন ও সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব ও বিস্তার ও ধর্মবিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ, তীক্ষ্ণ সমাজ-পর্যবেক্ষণ ও সর্বশেষে মৌলিক মননশক্তির আবির্ভাব প্রভৃতি নানামুখী কারণের সমবায়ে এই নবজাত গদ্যসাহিত্য শিক্ষানবিসি-স্তর হইতে পরিণত শিল্পসৌন্দর্যের পর্যায়ে উন্নীত হইল। এই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে একটু সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক)

খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগোষ্ঠীর প্রভাব

পাশ্চাত্ত্য বণিকের সহযাত্রী ও পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতার পূর্বসূরি-রূপেই বাংলার মাটিতে খ্রীষ্টীয় পাদরির আবির্ভাব। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বাণিজ্য প্রায় সমকালেই এ দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই ধর্মযাজকদের ধর্মানুরাগের আন্তরিকতায় সংশয় করিবার কোন হেতু নাই। হতভাগ্য পৌত্তলিকদের মধ্যে সত্যধর্মপ্রচারের কল্যাণময়তায় ইহাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, তাহা কতকটা স্বার্থবুদ্ধি ও হীন চাতুরির দ্বারা কলুষিত হইলেও, মোটের উপর আন্তরিক নিষ্ঠা-সঞ্জাত। পাদরিরা গোড়া হইতে জনসমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য চলতি ভাষা-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। দোম এণ্টনিয়ো নামে পোর্তুগীজ পাদরি-দের দ্বারা ধর্মান্তরিত একজন বাঙালী খ্রীষ্টান ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এবং পোর্তুগীজ পাদরি মানোএল তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুধর্মের অসারতা-প্রতিপাদন জন্য আঞ্চলিক কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান যাজক-সম্প্রদায় বাংলা গদ্যের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাকে প্রধান তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়—(১) বাই-বেলের অনুবাদ—এই অনুবাদগুলি ইংরেজী বাক্‌রীতি ও বাঙালীর পক্ষে অপরিচিত ভাবধারার অনুসরণের ফলে আড়ষ্টতা অতিক্রম করিতে পারে নাই ও বাংলা সাহিত্যে ইহাদের প্রভাব নগণ্য; (২) বাংলা মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন ও ব্যাকরণ-প্রণয়নের দ্বারা ইহারা পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্যরচনারীতিকে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধিতে

খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের গদ্য-প্রচেষ্টার তিনটি ধারা: বাইবেলের অনুবাদ; বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন; কেরীর সংস্কৃতপ্রধান গদ্য

ও গদ্যগ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিতে সহায়তা করিয়াছেন ; (৩) কেরী সাহেব এক-দিকে বাংলা গদ্যকে আরবী-ফারসীর প্রভাবমুক্ত করিয়া ও সংস্কৃত আদর্শের অনুগামী করিয়া উহার গঠন-সৌষ্ঠব ও প্রকাশ-মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন ; অপর দিকে 'কথোপকথন'-জাতীয় গ্রন্থ লিখিয়া বা অপরকে দিয়া লিখাইয়া সাহিত্যে কথ্যভাষার একটি সম্মানিত স্থান নির্দেশ করিয়াছেন ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও আদিযুগের অন্যান্য লেখকদের প্রভাবিত করিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ন্যায় নূতন ভাষাদর্শ-প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছেন।

(খ)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

কেরী সাহেবের প্রধান কীর্তি হইল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ সুলেখক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সুখপাঠ্য বিবিধবিষয়ক গদ্য গ্রন্থ-রচনার ব্যবস্থা করা। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে গদ্যে বিষয়-বৈচিত্র্য ও সাহিত্যিক গুণ-বিকাশের প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মিলে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবন-চরিত (রামরাম বসু—'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র', ১৮০১ ; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', ১৮০৫), ইতিহাস-সংকলন (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—'রাজাবলি', ১৮০৮), ছোট ছোট সামাজিক ও কাল্পনিক গল্প-কাহিনী (কেরী—'কথোপকথন', ১৮০১, ও 'ইতিহাসমালা', ১৮১২), আদর্শপত্রের নমুনা (রামরাম বসু—'লিপিমালা', ১৮০২) অনুবাদ (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—'বত্রিশ সিংহাসন', ১৮০২, 'হিতোপদেশ', ১৮০৮ ; গোলকনাথ শর্মা—'হিতোপদেশ', ১৮০২ ; চণ্ডীচরণ মুন্‌সি—'তোতা ইতিহাস', ১৮০৫ ; তারিণীচরণ মিত্র—'ঈশপের ও অন্যান্য গল্প', ১৮০৩ ; হরপ্রসাদ রায়—'পুরুষ-পরীক্ষা', ১৮১৫) ও দার্শনিক নিবন্ধ (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—'প্রবোধচন্দ্রিকা', ১৮৩৩)—এই তালিকা হইতেই আদিযুগের গদ্যের বিষয় ও রচনারীতি-বৈচিত্র্যের একটা ধারণা করা যাইবে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর গদ্যরচনার বিষয়-বৈচিত্র্য

এই বিষয়পঞ্জী হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে লেখকেরা সর্বপ্রথম প্রথাবদ্ধ বিষয়ের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে বিষয় নির্বাচন করিয়াছেন। অবশ্য হয়ত সাহেবদের শিক্ষার প্রয়োজনে পাঠক্রমের একটা ধারা কলেজকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে ; কিন্তু কলেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাভাষাশিক্ষণ, বিষয়বিশেষে জ্ঞানলাভ

বিচিত্র বিষয়-নির্বাচনের নানা উদ্দেশ্য

নহে। সুতরাং প্রত্যেক লেখকই নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে আলোচ্য বিষয় স্থির করিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত। এই গ্রন্থগুলি হইতে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানের পরিধি-পরিমাপ ও কৌতূহলের দিক্-নির্ণয় করা যায়। অনেকেই স্বাধীনতার অধিকার পাইয়াও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস হেতু অনুবাদের মধ্যে মূলানুসরণের আশ্রয় লইয়াছেন। কেরী সাহেব বাঙালী সমাজে প্রচলিত পুরাণ ও কিংবদন্তী হইতে প্রাপ্ত গল্প-কাহিনীগুলিকেই বাংলা ভাষায় লিখিয়া সিভিলিয়ান ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—প্রথম, কথ্যভাষা-শিক্ষণ ও দ্বিতীয়, সমাজের রীতি-নীতি সম্বন্ধে ইংরেজ তরুণদিগকে ওয়াকিবহাল করিয়া তাহাদের শাসন-কর্তব্যপালনের উপযোগী অভিজ্ঞতাদান। চিঠিপত্রের নমুনা দিয়া লেখক কোন বিশেষ সাহিত্যিক গুণ বা বিশ্রম্ভালাপের অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, কেবল সামাজিক আদব-কায়দা, লঘু-গুরুস্থানীয় অথবা সমান অবস্থার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্বোধন-রীতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেরই বশবর্তী হইয়াছেন—ইহার মধ্যে সাহিত্যরস একেবারেই অনুপস্থিত। লেখনভঙ্গীর শিষ্টাচারানুস্যূতিই বড়, ইহা যেন শিশুবোধকেরই বয়স্ক সংস্করণ। যে দুইখানি জীবনচরিত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রেরণা ঠিক গুণিসংবর্ধনা, বীরপূজা অথবা ইতিহাস-রসাকর্ষণ নহে—ইহা অনেকটা বংশমর্যাদার পরোক্ষ প্রচার। প্রতাপাদিত্য ও কৃষ্ণচন্দ্র লেখকদের আত্মীয় বলিয়াই তাঁহারা রচনার বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছেন; তাঁহারা যে যুগপ্রতিনিধি বা ইতিহাস-বিশ্রুত পুরুষ, ইহা তাঁহাদের গৌণ পরিচয়। বংশগরিমার সহিত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার আকস্মিক সংযোগই তাঁহাদের জীবনী-সাহিত্যের নায়করূপে নির্বাচিত হইবার প্রকৃত কারণ।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার বহুমুখিতা

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই একাধিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার কৌতূহলের ব্যাপকতা ও সাহিত্যকৃতির নানামুখিতার পরিচয় দিয়াছেন। দুইখানি অনুবাদ-গ্রন্থ, একখানি ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ ও একখানি বিবিধবিদ্যাসম্বন্ধীয় ও মুখ্যতঃ দার্শনিক নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি যে কেবল ফরমায়েসী লেখক নহেন ও তাঁহার মননশক্তি যে বিচিত্রগামী, তাহা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র লেখক, যিনি বিষয় দ্বারা অভিভূত না হইয়া বরং নানা বিষয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের শক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গদ্যভাষার মধ্যেও বিষয়োপযোগী প্রয়োগ-কুশলতা ও বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া নূতন পথে পদক্ষেপ ও নবপরীক্ষার সাহসিকতা

দেখা যায়। যেখানে তাঁহার সহযোগীরা এক ঘোড়ার এক্কাগাড়িতে কোনও মতে টাল বাঁচাইয়া চলিয়াছেন, সেখানে মৃত্যুঞ্জয় বহু-অশ্ব-বাহিত রথের আরোহী হইয়া মসৃণ স্বচ্ছন্দ গতিতে ও সম্ভ্রান্ত চালে স্থির লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন।

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে কাহার হাতে গদ্যরীতি কতটা অগ্রসর ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে তাহার পরিমাণনির্ণয় সহজও নহে, একান্ত প্রয়োজনীয়ও নহে। মনে রাখিতে হইবে যে ইঁহাদের মধ্যে কেহই ভাষার নূতন প্রয়োগের জন্য সচেতনভাবে প্রস্তুত ছিলেন না; সকলের স্কন্ধেই এই দায়িত্ব অতর্কিতভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইঁহাদের মুন্সিয়ানার জন্য কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল, এবং এই খ্যাতির জন্যই হয়ত কেরী সাহেব তাঁহাদিগকে এই গদ্যরীতি-অনুশীলনের জোয়ালে জুড়িয়া থাকিবেন। এক মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া তাঁহাদের সম্মুখে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না; তাঁহারা তাঁহাদের আরবী-ফারসী-উর্দু-সংস্কৃতের উপর কম-বেশি অধিকার লইয়া, তাঁহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে প্রচলিত সংলাপ-রীতি বা তাঁহাদের কর্মজীবনে অর্জিত বিশেষ মানস রুচি ও প্রবণতাকে সম্বল করিয়াই তাঁহাদের নির্বাচিত বিষয়সমূহের সহিত মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনভ্যস্ত ভাষায় নূতন বিষয়ের যে প্রকাশ-দুরূহতা, অনির্দিষ্ট ছাঁচে অবাধ্য ভাবকে ঢালাই করার যে গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা তাহাকে প্রায় মল্লযুদ্ধের পর্যায়েই ফেলা যায়। এই দুঃসাধ্য কাজে যাঁহারা অনুবাদের, বিশেষতঃ সংস্কৃত হইতে অনুবাদের যষ্টি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের পদক্ষেপ অনেকটা সুষম হইয়াছে। যাঁহারা উর্দু, হিন্দী বা ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারা নির্ভরযোগ্য আদর্শের অভাবে প্রায়ই হোঁচট খাইয়াছেন। কেরীর নামে যে দুইখানি বই প্রচলিত আছে তিনি তাহাদের যথার্থ রচয়িতা কিনা সন্দেহ। তথাপি ইহাদের মধ্যে সংলাপের সরল রীতি ও গল্প বলার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত বাক্য-যোজনা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া ইহারা মোটামুটি ঠিক পথেই চলিয়াছে। রামরাম বসুর 'লিপিমালা' পত্রের গতানুগতিক লিখনভঙ্গী অনুসরণ করিয়াছে ও কতকগুলি মামুলি খবর দেওয়া ও জিজ্ঞাসা করা ছাড়া আর কোন নূতনত্বের অবতারণা করে নাই বলিয়া ইহাকে সাহিত্যিক ভাষার মানদণ্ডে বিচার করা অবিধেয়। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র'-এ আরবী-ফারসী শব্দের আধিক্য ও বাক্যাংশের অন্বয়ে কিছু অপটুতা আছে বলিয়া ইহার রচনারীতিকে অভিযুক্ত করা হয় ও এই দোষের অভাবের জন্য 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' বইখানিতে উৎকর্ষ আরোপিত করা হয়; কিন্তু

এই যুগে গদ্যলেখক-গোষ্ঠীর নানা আদর্শ

রাজীবলোচনের সহিত তুলনায় রামরামের বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনা আরও জটিল। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুমঘাট-বর্ণনায় ও যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিস্ফুট করিতে রামরামের ভাষা যেরূপ কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে রাজীবলোচনের ভাষাকে সেরূপ কোন দুঃসাধ্য-সাধনে ব্রতী হইতে হয় নাই। রামরামের আরবী-ফারসী শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বাংলা ভাষার পরবর্তী পরিণতির সহিত খাপ খায় নাই, ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহা সে যুগের বাংলা গদ্যের উপর ইসলামী প্রভাবের যথার্থ নির্দেশক—তিনি কৃত্রিম সংস্কৃত-আদর্শের পরিবর্তে তৎকালপ্রচলিত চিঠি-পত্রে, আইন-আদালতে ও দলিলে বহু-প্রযুক্ত গদ্যধারা অনুসরণ করিয়া সৎসাহসই দেখাইয়াছেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সচেতন শিল্পিমন ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া গদ্যনির্মিতির ভিত্তিরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার এই মুটে-মজুরের কাজেও তিনি খানিকটা সাহিত্যিক রসবোধ ও সৃষ্টির আনন্দের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যের সৌন্দর্য গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহ্যহীন, অপাংক্তেয় বাংলা গদ্যের মধ্যেও কিছুটা মর্যাদা, রুচিবোধ ও ছন্দ-স্পন্দের একটা ক্ষীণ আভাস প্রবর্তন করিয়াছেন। কাদম্বরীর অলঙ্কার-ও-সমাস-বহুল, প্যাচে প্যাচে শৃঙ্খলিত সুদীর্ঘ বিন্যাস, বাহুল্যবর্জিত, যুক্তিনিষ্ঠ গঠন, সরল বিবৃতির সুষম ভঙ্গী ও অমার্জিত কথ্যরীতির নিঃসঙ্কোচ প্রয়োগ—বাক্যনির্মিতির সর্ববিধ শিল্পরূপই তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন ও সর্বত্র আঙ্গিক-সৌষ্ঠব লাভ করিতে না পারিলেও অধিকাংশ স্থলে অনুভূতির বেগ সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার 'রাজাবলি' হয়ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ-অবলম্বনে রচিত ও ইহার ইতিহাস অনেকটা পুরাণের ন্যায় কল্পনাশ্রিত। কিন্তু গদ্যের একেবারে উদ্ভব-যুগে তিনি যে এই অপরিণত গদ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা-পরম্পরা কালানুক্রমিকভাবে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সাহস ও গদ্যের ভবিষ্যতের প্রতি দৃঢ় আস্থা একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-তেও তেমনি এক বিরাট জ্ঞানপরিধিকে আয়ত্ত ও প্রকাশ করিবার মহনীয় কল্পনা, দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সঙ্কল্প নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করে যে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপর পর্বতপ্রমাণ ভার চাপাইতেও তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। পা সময় সময় টলিয়াছে, বাঁধন মাঝে মধ্যে আল্‌গা হইয়াছে, কিন্তু বোঝা যথাস্থানে পৌছিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার বৈশিষ্ট্য

এই যুগে সুষ্ঠু গদ্যরচনার প্রধান বাধা ছিল—(১) শব্দ-নির্বাচনে ও সন্নিবেশে অপটুতা, (২) দুরান্বয়ের জন্য বাক্যাংশসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বোধে অনিশ্চয়তা ও (৩) সমগ্র বাক্যটির দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য-নিরূপণে সুমিতিহীনতা। এই ত্রুটিগুলি এতই ব্যাপক ও সাধারণ ছিল যে যে-কোন লেখকের রচনায় বিরল স্থানেও ইহাদের অভাব দৃষ্ট হইয়াছে তাহাকেই আমরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার অঞ্জলি দিয়াছি। হয়ত ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মাঝে মধ্যে দুই একটি ত্রুটিহীন ও ভারসাম্যযুক্ত বাক্য রচনা করিয়াছেন। হয়ত এই প্রশংসা যথার্থ প্রাপ্য লেখকের নহে, বক্তব্য বিষয়ের বা অনুসৃত মূলরচনার। যিনি গভীর জলে প্রবেশ না করিয়া তীরের কাছাকাছি থাকিয়া নিজেকে ভাসমান রাখিয়াছেন তাঁহাকেই আমরা সন্তরণদক্ষ আখ্যা দিয়াছি। মৃত্যুঞ্জয় যে ইঁহাদের মধ্যে আংশিক ব্যতিক্রম তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গদ্যরীতির উৎকর্ষ যথার্থতঃ মৌলিক মনন ও চিন্তার স্বচ্ছতার উপর নির্ভরশীল। যাহার সত্য সত্য কিছু বলিবার আছে সে-ই শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু প্রকাশবাহন আবিষ্কার করিবে; যাহার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে স্থিরতা আছে সে-ই বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ করিয়া লইবে। পরবর্তী যুগে আমরা এই পথিকৃৎ-গোষ্ঠীর স্তর ছাড়াইয়া মননশীল লেখকবৃন্দের হাতে গদ্য কেমন করিয়া স্বরূপধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা দেখিতে পাইব।

এই যুগে গদ্যরচনার প্রধান বাধাসমূহ

(গ)

মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন

পদ্য অপেক্ষা গদ্যরচনার প্রসারের উপর মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব যে অনেক বেশী তাহা একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে। পদ্য স্মৃতিনির্ভর, গদ্য লেখনীনির্ভর। পদ্য লেখা না হইলেও মুখে মুখে প্রচলিত থাকে। গদ্যকে লেখার স্থায়িরূপ না দিলে তাহা অচিরেই বিস্মৃত হয়। সেই জন্য মুদ্রাযন্ত্রের অভাব সত্বেও বাংলা সাহিত্যে পদ্যচর্চার বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কিন্তু গদ্যসাহিত্য মুদ্রাযন্ত্রের পাকা হরফের সূত্র ধরিয়াই প্রসার লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, কাব্য কবির প্রেরণাসঞ্জাত; ইহা বিশেষ উপলক্ষ্যের মুখাপেক্ষী; ইহা নিত্য নহে, নৈমিত্তিক। গদ্য কিন্তু প্রাত্যহিক প্রয়োজনে উদ্ভূত—প্রতিদিনই গদ্য লিখিবার কোন না কোন কারণ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা না পাইলে সে রচনা কেহ স্মরণ করিয়া রাখিবে না। যাহা

গদ্য-রচনায় মুদ্রাযন্ত্রের দান ও গুরুত্ব

উপযুক্ত আধারের অভাবে অচিরাৎ বিলুপ্ত হইবে সেই গদ্যরচনায় ব্রতী হইতে কোন লেখকই উৎসাহিত হন না। সেইজন্য বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা গদ্যের প্রসার ও অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ছাপার ব্যবস্থা না থাকিলে, পাঠার্থীদের জোর করিয়া পড়াইবার বিধান না থাকিলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থগুলি অলিখিতই থাকিয়া যাইত এবং হয়ত কোন অনিশ্চিত সুদূর ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানানুরাগের অন্তর-প্রেরণাতেই গদ্য-সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটিত। ছাপাখানার সুযোগ লইয়া অনেকগুলি সাময়িক পত্র আবির্ভূত হইয়া গদ্যরীতিকে পুষ্ট ও সর্ববিধ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রিত গ্রন্থ

১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুরের যাজকসম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রথম বাংলা দেশে বাংলা-অক্ষরসংযুক্ত মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব হয়। হালহেদের বাংলা ব্যাকরণ সর্বপ্রথম ছাপা বাংলা গ্রন্থ। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স্ বাংলা প্রাচীন পুঁথি ও সমকালীন বাঙালী অনুলিপিকারদের হস্তাক্ষরের অনুকরণে বাংলা মুদ্রণের অক্ষরাবলী প্রস্তুত করিবার ভার লন। বাংলা অক্ষর ও যুক্তবর্ণমালা খোদাই করিবার কাজে তিনি পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তা গ্রহণ করেন। উভয়ের মিলিত প্রয়াসে যে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল তাহাই সমগ্র ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি ও বাঙালীর জ্ঞান-মনন-সাধনার মূলে।

(ঘ)

সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব

বাংলা সংবাদপত্র-আবির্ভাবের পটভূমি

সাময়িক সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার মুদ্রাযন্ত্র-আবিষ্কারের অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ ফল। বই লিখিতে দীর্ঘকালব্যাপী প্রস্তুতি, বিষয়নির্বাচন, উপকরণ-সংগ্রহ, লিখিবার শ্রম ও মুদ্রণের সুযোগ-প্রতীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু সাময়িক পত্রের প্রস্তুতির কাল অতি সংক্ষিপ্ত ও ইহার প্রকাশ দ্রুত ও নিয়মিত। বিষয়ের জন্য ইহাকে অপেক্ষা করিতে হয় না; হাতের কাছে যে উপাদান আছে, সদ্যঃসংঘটিত ঘটনা, প্রচলিত মতবিরোধ, সামাজিক রীতি-নীতির ভালমন্দ-বিচার, কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ-পরিবেশন ইত্যাদি লঘু সামগ্রীই ইহার আলোচ্য বস্তু। অবশ্য সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন ও কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য লেখা বলিয়া ইহার রচনা সরল ও সাবলীল হওয়া

প্রয়োজন। বিশেষতঃ পণ্ডিতী ভাষার উৎকট সংস্কৃতানুকরণ ও অনুবাদের উগ্র বৈদেশিক গন্ধ দূরীভূত না হইলে ইহার মধ্যে জীবনরস-পরিবেশন সম্ভব হইতে পারে না। সেইজন্য গদ্যচর্চার আদিযুগের পর যখন গদ্যভাষা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিল, তখনই (১৮১৮ খ্রীঃ অঃ) প্রথম সংবাদপত্রের আবির্ভাব। পণ্ডিত ও মুন্সিরা গদ্যের অকর্ষিত জমির উঁচু-নীচু, ঢেলা-মাটি প্রভৃতি ভাঙিয়া কতকটা সমান করিলে সাংবাদিকেরা উহাতে মানবিক কৌতূহলের প্রথম বীজ বপন করিতে অগ্রসর হইলেন।

বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রের স্থান

কোন দেশেই সংবাদপত্র, এমন কি সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকাও, সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান পায় না। বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রের স্থান নির্দেশ করিতে হইতেছে তিনটি বিশেষ কারণে—(১) গদ্যরীতির সরলীকরণে ও উন্নয়নে ইহার উল্লেখযোগ্য অংশ আছে; (২) ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক, আক্রমণ ও জবাবের ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার অবতারণা করিয়া ইহা বাংলার মনীষা ও লিপিকুশলতাকে পুষ্ট করিয়াছে; এবং (৩) সমাজের উৎকেন্দ্রিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করিয়া ইহা বাংলা বিদ্রূপাত্মক উপন্যাসের প্রেরণা যোগাইয়াছে—এখানেই সাহিত্যের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন, প্যারীচাঁদ ও কালী-প্রসন্ন এই সাংবাদিকতার সূত্র ধরিয়াই সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এই যুগের সাময়িক পত্রিকা

এই যুগে যে সমস্ত পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত 'সমাচারদর্পণ' (১৮১৮, ২৩শে মে, প্রথম সংখ্যা); (২) রামমোহন রায়-প্রবর্তিত 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' (সেপ্টেম্বর, ১৮২১) ও 'সম্বাদকৌমুদী' (১৮২১, ৪ঠা ডিসেম্বর, প্রথম সংখ্যা); (৩) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচারচন্দ্রিকা' (১৮২২খ্রীঃ); ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রবর্তিত 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩১, ২৮শে জানুআরি, প্রথম সংখ্যা)। ইহাদের মধ্যে 'সমাচার-দর্পণ'-এ খ্রীষ্টানদের কর্তৃক হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবার জন্য রাম-মোহনের 'সম্বাদকৌমুদী'র আবির্ভাব। আবার সতীদাহনিবারণ-বিষয়ে রামমোহনের সহিত মতভেদ হওয়াতে ভবানীচরণ রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্ররূপে 'সমাচারচন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। 'সংবাদপ্রভাকর'-এ গঠনমূলক সাহিত্য-সমালোচনা, বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যসংগ্রহ ও পূর্বকালীন কবিদের জীবনতথ্য-সংকলনের সূত্রপাত হয় ও সম্পাদকের ব্যঙ্গাত্মক কাব্য-রচনা ইহাতে প্রধান স্থান

পায়। এইরূপে সাংবাদিকতা ক্রমশঃ সাহিত্যপদবিতে আরোহণের যোগ্যতা অর্জন করে।

৩

সাহিত্যিক গদ্যের আবির্ভাব

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই যুগের প্রধান গদ্যলেখকগণ হয় সংবাদপত্রের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ফলে, না হয় সংবাদপত্রের নিকট প্রেরণা পাইয়া স্বাধীন ও সাহিত্যিকগুণবিশিষ্ট গদ্যরচনায় ব্রতী হন। ইঁহাদের মধ্যে **রামমোহন রায়** (১৭৭৪-১৮৩৩) বয়স ও রচনার দিক দিয়া সর্বপ্রথম। রাম-

রামমোহনের গদ্যের বৈশিষ্ট্য

মোহনের গদ্যের শিল্পরূপ ও গঠনসৌষ্ঠব যে পূর্বযুগের সহিত তুলনায় সর্বত্র উন্নততর ছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু নদী যেমন নিজ স্রোতোবেগের দ্বারা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া অগ্রগতির পথ করিয়া লয়, রামমোহনও তেমনি নিজমতপ্রতিষ্ঠার ও তত্ত্বপ্রতিপাদনের আগ্রহে, নিজ নিষ্ঠা, প্রত্যয় ও আবেগের ভিতরের টানে ভাষার সমস্ত আড়ষ্টতা ও পারিপাট্যের অভাবকে অতিক্রম করিয়া নিজ বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। অন্তরের ভাব ও অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক, মৌলিকতা-হীন রচনার শিথিল মাংসসমষ্টির মধ্যে তিনি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের দৃঢ় অস্থিসংস্থান সংযোজনা করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার ভাষা শ্রুতিমধুর না হইলেও ও সময় সময় কর্কশ হইলেও ইহার শক্তি ও আকর্ষণীয়তা অনুভূত হয়। যুক্তিনিষ্ঠ মনের স্বভাব-শৃঙ্খলা তাঁহার বাক্যগঠন ও শব্দপ্রয়োগকেও সু-গ্রথিত করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম লেখক যিনি আধুনিক অনুশীলিত মন লইয়া গদ্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; তাঁহার গদ্য ললিত-মধুর না হইলেও মননদীপ্ত ও ভাবের সমুন্নতিতে মর্যাদাময়।

রামমোহনের বহুমুখী কর্মোদ্যমের মধ্যে সাহিত্যচর্চা অন্যতম ছিল। তিনি প্রধানতঃ দেশমধ্যে সমাজ-সংস্কার ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রচলিত করিতেই

রামমোহনের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস

ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রূপে দেশ-বাসীর মনে প্রকৃত ধর্মচেতনা জাগ্রত করিতে যত্নবান হন। সর্ববিধ আচারমূঢ়তা ও কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজে উদার ও স্বাধীন চিন্তাধারা প্রবর্তন করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। দেশমধ্যে ইংরেজী-শিক্ষার প্রসার ও স্বাধীনতাবোধের উদ্রেকে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনিই

বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁহার মানবতাবোধ দেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ফরাসী বিপ্লব ও ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি যে কেবল নিজেই সাহিত্য-রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, বাঙালীর চিত্তে নূতন চিন্তা-মননের বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া উন্নত ও অভিনব সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও **অক্ষয়কুমার দত্তের** (১৮২০-১৮৮৬) হাতে গদ্যভাষা আরও মননশীল ও পরিমার্জিত রূপ গ্রহণ করে। ইঁহারা উভয়েই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার (প্রতিষ্ঠা ১৮৪৩ খ্রীঃ অঃ) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। অক্ষয়কুমার বিশেষ করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোচনায় রত ছিলেন। কিন্তু এই দুরূহ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে কল্পনাবিলাসেরও অভাব ছিল না তাহা প্রমাণ হয় তাঁহার 'চারুপাঠ'-এর অন্তর্ভুক্ত স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি রূপক-কল্পনার নিপুণ ও সার্থক প্রয়োগের উদাহরণ দিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার রচনায় সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও অপূর্ব প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। রামমোহন রায়ের যুক্তিনিষ্ঠ ধর্মচেতনা দেবেন্দ্রনাথে আবেগময় ভক্তি ও অনুভূতি-রসে আপ্লুত হইয়াছে। অথচ এই ভক্তিপ্রবণতা দৃঢ় সংযমের বন্ধন স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া কোথাও মাত্রাতিরিক্ত ভাবালুতায় পর্যবসিত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ বা অক্ষয়কুমার কেহই প্রথম শ্রেণীর লেখক ছিলেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যে দৃঢ়বদ্ধ যুক্তিশৃঙ্খলা ও নিরাবেগ তত্ত্বনিষ্ঠা ও দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে ধ্যান ও উপলব্ধির নিবিড়তা যোগ করিয়া ইহার সমৃদ্ধতর পরিণতির সূচনা করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের গদ্য

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)—রামমোহন বাংলা গদ্যকে পরিণতির যে স্তরে লইয়া গিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ ও অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া উহাকে পরিণতির এক উচ্চতর পর্যায়ে স্থাপিত করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার হাতেই গদ্যভাষা কৈশোরের অনিশ্চয়তা ও অস্থির গতি ছাড়াইয়া পূর্ণ সাহিত্যিক রূপের স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইল। গদ্যের কাঠামো ও বাক্যের

বাংলা গদ্য ও ঈশ্বরচন্দ্র

ভারসাম্য ও অন্তশ্ছন্দ-স্থিরীকরণে তাঁহারই প্রভাব যে সর্বাধিক তাহা নিঃসন্দেহ। বাংলা গদ্যের জনক কে ইহা লইয়া সমালোচকদের মধ্যে নানারূপ মতবাদ দেখা দিয়াছে। অবশ্য সন্তানের পিতৃত্বনিরূপণের ন্যায় ভাষার পিতৃত্বনিরূপণ নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কথ্যভাষার জন্ম লোকমুখে; সাহিত্যিক ভাষা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বহু জননীর স্তন্যপানে, বহু ধাত্রীর লালন-পালনে, বহু শিক্ষা-দাতার সযত্ন অভিভাবকত্বে বাড়িয়া উঠে, সুতরাং ভাষা সম্বন্ধে একজনকত্ব অপেক্ষা বহুমাতৃকত্বই অধিকতর প্রযোজ্য। মৃত্যুঞ্জয় এই নবজাত ভাষাশিশুকে সূতিকাগৃহে স্তন্য দিয়াছিলেন; রামমোহন ইহাকে কৈশোরক্রীড়ার ক্ষেত্রে আপন নৈপুণ্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে শিখাইয়াছিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র ইহাকে পূর্ণ যৌবনের গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের বিচিত্র কর্তব্যপালনের উপযোগী দীক্ষায় অভিষিক্ত করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না—তাঁহার কর্মজীবন সাহিত্য ছাড়াইয়া বিশালতর সমাজক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজসংস্কার ও নীতিপ্রতিষ্ঠার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যরচনা শিল্পচেতনা অপেক্ষা প্রবলতর সমাজবোধের দ্বারাই বেশী প্রভাবিত। তিনি শিক্ষক ও সমাজসেবীর ভূমিকা হইতেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের অধিকাংশই বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তক বা ভাবানুবাদ। একদিকে 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী' প্রভৃতি শিক্ষামূলক গ্রন্থ, অন্যদিকে 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) ও 'সীতার বনবাস' (১৮৬০)-জাতীয় অনুবাদ গ্রন্থের ভিতর দিয়াই তিনি বাংলা গদ্যের বহিরঙ্গের সুষমা ও অন্তরের লাবণ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে তিনি মূলের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভাবপরিবর্তন সাধন করিয়াছেন ও ভাষাকে যেরূপ নিপুণতার সহিত ভাবের অনুগামী করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শিল্পজ্ঞান ও সমকালীন সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। শকুন্তলা ও সীতা তাঁহার হাতে যেন আমাদের পারিবার-জীবনের স্নেহ-মমতা-লজ্জা-অভিমান প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তির অধিকারিণী বাঙালী নারীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যে অনমনীয় পৌরুষ ও করুণা-বিগলিত কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহার ছাপ তাঁহার সমাজচেতনা-প্রসূত 'বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫) ও তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'আত্মজীবনচরিত'-এর

স্থানে স্থানে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদ ও স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে তাঁহার ব্যক্তিসত্তা-প্রকাশের কোন অবসর ছিল না—সেগুলি হইতে তাঁহার জ্ঞান-ও-শিল্পসাধকের রূপটিই চোখে পড়ে। কিন্তু তিনি শুধু বিদ্যাসাগর ছিলেন না, দয়ার সাগরও ছিলেন ; এবং তাঁহার অন্তরের অপরিমেয় করুণা যখন বিরোধী শক্তির সংঘাতে গভীরভাবে মথিত হইত, তখন ইহা ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের রুদ্র তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিত। তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত, নিস্তরঙ্গ রচনাভঙ্গী এক প্রবল আবেগের ভাবপ্লাবনে আলোড়িত হইয়া উঠিত। তাঁহার 'বিধবা-বিবাহ' গ্রন্থে যখন তিনি দেশাচারের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও অনুযোগ ধ্বনিত করিয়াছেন বা তাঁহার আত্মজীবনীতে যখন তাঁহার শৈশব-স্মৃতি-পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে রাইমণির সুধাস্নিগ্ধ মাতৃস্নেহের কথা স্মরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ভাষা লেখকের দীর্ঘকালের অন্তঃসঞ্চিত উত্তাপে, ব্যক্তি-অনুভূতির নিবিড় স্পর্শে যেন প্রাণময়তার বিদ্যুৎ-শিখায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। এইসব স্থলে তাঁহার অনবদ্য শিল্পবোধের পাষাণমূর্তি যেন জীবন্ত প্রতিমায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বিদ্যাসাগরী ভাষা বঙ্কিমী ভাষাকে স্পর্শ করিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রবৈশিষ্ট্য

৪

উপন্যাসধর্মী-গদ্যের আবির্ভাব

টেকচাঁদ ঠাকুর নামে পরিচিত **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৩—১৮৮৩) ও হুতোম প্যাচার ছদ্মনামধারী **কালীপ্রসন্ন সিংহ** (১৮৪০—১৮৭০) রামমোহন-বিদ্যাসাগর হইতে এক পৃথক পথ ও মেজাজ অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহাদের ভাষা চলিত ভাষা ও গুরুগম্ভীর সাহিত্যিক ভাষা হইতে শব্দে ও চালে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিদ্যাসাগরী ভাষা মহৎ ও কোমল ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং শ্রুতিমধুর ও ধ্বনিপ্রবাহ-সমন্বিত হইলেও জীবনের লঘুতর দিকের, ইহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাস্য-পরিহাসের ও চটুল গতিচ্ছন্দের রূপ ফুটাইবার পক্ষে অনুপযোগী ছিল। চোখের সামনে যে জীবন খেয়ালে, হুজুগে, উৎসবে ব্যসনে, রঙ্গ-কৌতুকে মাতিয়া উঠিয়াছে তাহাকে যথাযথ প্রতিবিম্বিত করার শক্তি ইহার ছিল না। গুরুতর বিষয়ের আলোচনা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও প্রশান্ত সৌন্দর্যসৃষ্টির বাহিরে জীবনের যে স্থূল, রসোচ্ছল অংশ আছে তাহা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা দাবি করিল।

আলালী ও হুতোমী ভাষা-উদ্ভবের পটভূমি

প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নের রচনা সেই দাবি মিটাইবার প্রয়াস হইতে উদ্ভূত। ইঁহারা বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রকাশ্য বিরোধিতা না করিয়া সর্বজনবোধ্যতার প্রয়োজনে ইঁহাদের অভিনব রীতি-প্রবর্তনকে সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরী ও আলালী ভাষাকে পরস্পরের পরিপূরকরূপে উপস্থাপিত করিয়া উভয়ের সুষ্ঠু সংমিশ্রণেই যে আদর্শ গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ও নিজের রচনায় উহা হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক দিয়া বিচার করিলে আলালী ও হুতোমী ভাষা কেরীর 'কথোপকথন', মৃত্যুঞ্জয়ের লঘু রচনা, 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস'-এর ভাষার পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ। বাংলা গদ্যের উদ্ভব-যুগ হইতে যে দুই ধারা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছিল, উহাদের মধ্যে কথ্যধারা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের নবসৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষার প্রবলতর প্রভাবের নিকট সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। এখন অনুকূল উপলক্ষ্য পাইয়া ইহা আবার মাথা তুলিল ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ বিস্তার করিল। আলালী-হুতোমী ভাষার যথার্থ অভিনবত্ব রচনা-রীতিতে নহে, নূতন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ইহার বলিষ্ঠ প্রয়োগে।

আলালের ঘরের দুলাল ও হুতোম প্যাঁচার নকশার বৈশিষ্ট্য

টেকচাঁদ-হুতোমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল বাস্তব-জীবন-চিত্রণে ও গল্পরসের অনুশীলনে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর আদর্শের মানদণ্ডে জীবনের বিচার করিয়াছেন; তাঁহারা জীবনের রস পরিবেশন করেন নাই। রামমোহনে গল্প একেবারেই নাই; বিদ্যাসাগরে যাহা আছে তাহা যৎসামান্য ও অন্যের ভাণ্ডার হইতে গৃহীত। 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) ঘটনার ভিতর দিয়া চরিত্র-চিত্রণে ও জীবনের বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের রসসিক্ত বর্ণনায় ঔপন্যাসিক আদর্শের সচেতন অনুসরণ করিয়াছে। কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' খণ্ডচিত্রের সমষ্টি—তৎকালীন কলিকাতার গাজনের সং, যাত্রাগান, রথ-যাত্রার সমারোহ, বিবিধ হুজুক উপলক্ষ্যে কৌতূহলী জনতার ভিড়, প্রাচীনকালের রীতি-অনুষ্ঠান, নানাপ্রকারের ভণ্ডামি ও ইতর আমোদ প্রভৃতির কৌতুকপূর্ণ ও বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা দিয়াছে—ইহাতে ব্যক্তিচরিত্র-অঙ্কনের বা সমগ্র গল্প বলিবার কোন চেষ্টা নাই। সুতরাং ইহা ব্যঙ্গাত্মক সমাজ-চিত্র, উপন্যাস নহে। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ঐক্যবদ্ধ ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে একটি পরিবারের কয়েকটি লোকের ভাল-মন্দের, উত্থান-পতনের কাহিনী বিবৃত

করিয়াছে এবং ইহারই সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত গৌণ চরিত্র ঘটনায় অংশ গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণতিতে সহায়তা করিয়াছে ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জীবনযাত্রার ধারা-ধরন, উহার শিক্ষা, বিচার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বড় মানুষের মোসাহেব-পরিবৃত, আড়ম্বরপূর্ণ, অসার কালক্ষেপ—ইহাদের একটি কৌতুকোজ্জল ছবি আঁকিয়াছে। 'নববাবুবিলাস'-এর বাবু-চরিত্র এখানে একটি অর্ধ-শরীরী কল্পনা হইতে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভবানীচরণের রচনায় মানুষ গৌণ, সমাজচিত্র মুখ্য; প্যারীচাঁদের ক্ষেত্রে উভয়েরই সমান মর্যাদা, ব্যক্তি সমাজের ভিড়ে নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই। এমন কি মোসাহেব-জাতীয় গৌণ চরিত্রগুলিও—বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বর, ঠক চাচা—শুধু উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র নহে, তাহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। ভবানীচরণের সঙ্গে প্যারীচাঁদের আর একটা পার্থক্য এই যে ভবানীচরণ কেবল সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতিই দেখিয়াছেন; কিন্তু প্যারীচাঁদ বরদাচরণ ও রামলালের মধ্য দিয়া সমাজনীতি ও জীবনাদর্শের একটা উন্নততর পুনর্গঠনের সম্ভাবনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা কেবল যে উচ্ছন্ন যাইবার পথেই ঠেলিয়া দেয় না, ইহা যে উচ্চতর সমাজচেতনা ও নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করে এই আশাবাদী অভিজ্ঞতা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার ও বাংলার নৈতিক জীবনের চল্লিশবর্ষব্যাপী ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের ভিতর দিয়াই যে লেখকের মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

'আলালের ঘরের দুলাল' যে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয় নাই, ইহার প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ভাল করিয়া ফোটে নাই, ইহার জীবন-চিত্রণ যে তরল কৌতূহল ও সুলভ নীতিবাদের দ্বারা অযথা ভাবে প্রভাবিত তাহা যেমন সত্য, তেমনি ইহা যে উপন্যাস-রচনার দিকে সার্থক অগ্রগতি তাহাও তেমনি সত্য। 'আলাল' সম্পূর্ণ উপন্যাস হয় নাই বলিয়া ইহাকে যদি খারিজ করিতে হয়, তবে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের অপটু ও অসম্পূর্ণ গল্পরচনা-প্রয়াসও অনুরূপ কারণে বর্জনীয়।

আলালী ও হুতোমী ভাষার তুলনা

প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন উভয়ের মধ্যে কথ্যভাষা-প্রয়োগে কে অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে তাঁহাদের আপন আপন উদ্দেশ্যের উপর। প্যারীচাঁদ একটা গভীর বিষয়, জীবনের একটা চিরন্তন নীতিকে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন—কাজেই তাঁহার রচনারীতির মধ্যে বিষয়ানুরূপ খানিকটা গাম্ভীর্য থাকিবেই। তিনি হালকা সুরের চরম পর্যায়ে নামিতে পারেন না কিন্তু

কালীপ্রসন্ন সুরু হইতেই ফষ্টি-নষ্টি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কলম ধরিয়াছেন—কোন সামগ্রিক জীবন-নীতি বা ভাল-মন্দ আচরণের নৈতিক ফলাফল ফুটাইয়া তোলা তাঁহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত ছিল। তিনি হোলিখেলার কর্দমাক্ত আবীরের পিচকারি হাতে আসরে নামিয়াছেন—অবশ্য যাহাদের কাপড়-চোপড়ে এই কাদা-মাখা রং ছড়াইয়াছেন তাহাদের নীতির বিচারে অপদস্থ করাও তাঁহার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে নৈতিকতা একেবারেই গৌণ। সুতরাং তিনি ভাষাকে যতটা হালকা ও ইতরতা-দুষ্ট করিতে পারিয়াছেন প্যারীচাঁদের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। উভয়ের গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নামকরণেই উভয়ের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা পরিস্ফুট। টেকচাঁদের মধ্যে খানিকটা সম্ভ্রমবোধ আছে, হুতোম প্যাঁচা নিজের ছদ্মনাম-গ্রহণে যেরূপ, সেইরূপ তাঁহার রচনারীতিতেও সমস্ত মর্যাদাবোধকে হাসি-হুল্লোড়ের আবিল জোয়ারে ভাসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার শক্তি, ব্যঙ্গপ্রয়োগ-নিপুণতা অনস্বীকার্য, কিন্তু তিনি খোলাখুলি ভাঁড়ের অংশ অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া পোশাক-পরিচ্ছদে শালীনতার আদর্শ বেপরোয়াভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। ভবিষ্যতের বাংলায় আলালের উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়; হুতোমের উত্তরাধিকারিগোষ্ঠী সাহিত্যসভা ত্যাগ করিয়া নিছক ইতরজনের আসরে, বড়তলায় ছাপা কুরুচিপূর্ণ পুস্তিকায় নামিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাটক ও নাট্যশালা

১

নাটকের প্রথম উৎস

১

কবি, পাঁচালি, যাত্রা ইত্যাদি

পূর্ণাঙ্গ নাটকের আবির্ভাবের পূর্বে গীত-প্রধান আবৃত্তির মধ্যে নাটক ও অভিনয়-কলার প্রথম বীজ নিহিত থাকে। প্রথম প্রথম হস্তলিখিত পুঁথির অনুলিপি যখন খুব অল্প সংখ্যায় পাওয়া যায় ও অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন পাঠকও খুব বিরল, তখন আবৃত্তির মাধ্যমেই তাহাদের কাহিনী শ্রোতার গোচর করা হয়। কাব্যের যে সমস্ত অংশে নাটকীয় রসের স্ফুরণ হইয়াছে বা জোরাল উক্তি-প্রত্যুক্তির দ্বারা নাট্য-সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাদের আবৃত্তির সুরেই উদ্‌গাতার অজ্ঞাত-সারে অভিনয়ের ক্ষীণ পূর্বাভাস শোনা যায়। কাব্যের অন্তর্নিহিত বীররস ও করুণরস এই প্রকারে ভাবস্ফুরণদক্ষ কণ্ঠের সহযোগিতায় শ্রোতার চিত্তে অভিনয়-তৃপ্তির আস্বাদন জাগায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আদিযুগের কাব্যই নাটকের প্রথম উৎস। লেখক ও শ্রোতৃমণ্ডলী এইরূপ পরোক্ষভাবে নাট্যরস-উপলব্ধিতে অভ্যস্ত হইলে ধীরে ধীরে কাব্যের মধ্যেই সচেতনভাবে নাটকীয়তা-স্ফুরণের চেষ্টা হয়। আবার সাহিত্য ছাড়াও লৌকিক নৃত্য-গীত-অঙ্গভঙ্গীর ভাবপ্রকাশিকা শক্তির ভিতর দিয়া নাটকের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতে পারে। দেব-পূজা বা গণ-উৎসব উপলক্ষ্যেও পূজা বা উৎসবের সহিত সম্পৃক্ত কোন বিষয় লইয়া মুখে মুখে নাটকীয় দৃশ্যরচনার দ্বারাও জনগণের নাট্যরস-পিপাসার কিছুটা পরিতৃপ্তি-সাধন সম্ভব। এই ক্রমবিবর্তনের পথ ধরিয়া বহু বিলম্বে হয় অন্য সাহিত্যের অনুসরণে কিংবা নিজ দেশীয় প্রেরণার বলে, নিজস্ব-আঙ্গিক-বিশিষ্ট নাটকের উদ্ভব হয়। কিন্তু সব দেশেই নাটক অতীত ঐতিহ্যের প্রভাব বহন করে। বহিরবয়বে ইহা সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেও ইহার অন্তঃপ্রকৃতিতে গীত ও কাব্যের অনুপ্রেরণা, ভাবোচ্ছ্বাসের অসংযত আধিক্য চিরকালই সক্রিয় থাকে।

নাটকের প্রথম উৎস: আদিযুগের কাব্য

বিশেষ করিয়া বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে জন্ম-ইতিহাসের উপরি-উক্ত স্তরগুলি উদাহৃত হইয়াছে। যদিও ইহার সামনে সংস্কৃত সাহিত্যের সুপরিণত, উৎকৃষ্ট নাটকের প্রচুর দৃষ্টান্ত উপস্থিত ছিল, তথাপি সংস্কৃত অনুসরণের পথে ইহার আবির্ভাব ঘটে নাই। ইহা ঘুরপথে পাক খাইতে খাইতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে জাতীয় চেতনা-সংহতি, গৌরবময় কর্ম-প্রেরণা ও পরিণত রসবোধ থাকিলে সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকের জন্য উদগ্র আগ্রহ জাগে, বাঙালী-জীবনে সেরূপ পরিণতি আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত লক্ষ্যগোচর হয় না। আধুনিক কালেও উন্নত নাটকীয় আদর্শের উপযোগী জীবনাকৃতি বাঙালীর মধ্যে জাগিয়াছে কিনা সন্দেহ। আমরা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, নাটকের ক্ষেত্রে, জীবন-প্রস্তুতির অভাবের জন্যই হউক বা বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাতের জন্যই হউক, তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া আছি ইহা সর্বসম্মত সত্য।

বাংলা নাটকের দুর্বলতা

বাংলা সাহিত্যের একেবারে আদিলগ্নে, 'চর্যাপদে' আমরা বুদ্ধনাটক, তৎ-সম্পর্কিত নৃত্য-গীত ও নটপেটিকা অর্থাৎ অভিনেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার বাক্সের কথা শুনি। ইহা সম্ভবত বুদ্ধজীবনীর কোন কোন অংশকে নাটকীয় রূপ দিবার প্রচেষ্টা এরূপ অনুমান করা যায়। বাংলা সাহিত্যে নাটকীয় অঙ্কুরের প্রথম বিকাশ হইল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া। এই প্রেম লইয়া যে আদিকবিরা কাব্য রচনা করিয়াছেন—জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি—সকলেই ইহার মধ্যে নাটকীয়ত্বের আরোপ করিয়াছেন। এ প্রেমের রসবৈচিত্র্য, ঘটনাপ্রবাহ ও আবেগসংঘাত এত প্রচুর ও বেগবান যে ইহা কাব্যের চিত্রিত ঘট হইতে নাটকের তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে অনিবার্যভাবে উপচাইয়া পড়ে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমনিবেদনে তাই সংলাপ ও গভীর চিত্তমন্থনের পরিমাণ এত বেশী। বিশেষত এই মধুর প্রেমকাহিনী এত জনপ্রিয় হইয়া পড়িল, পণ্ডিত ও আনুষ্ঠানিক ভক্তের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া আপামর-সাধারণের মধ্যে এত বিস্তৃতিলাভ করিল যে শুধু কাব্যের সুললিত ঝঙ্কার ও রসনিবিড় বর্ণনা শুনিয়া অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতদের তৃপ্তি হইল না। তাহারা এই আদর্শ প্রেমিকযুগলকে ও তাঁহাদের ছলনা-মধুর, বাধা-বিঘ্নে উদ্বেল, বেদনায় মর্মস্পর্শী ও উচ্চতর ভাবব্যঞ্জনায় রহস্যময়, ধর্মসাধনার ইঙ্গিতবাহী এই প্রণয়লীলাকে নাটকের প্রত্যক্ষতায় দর্শন ও অনুভব করিতে চাহিল। তাই প্রাক্-চৈতন্য যুগের জয়দেব ও বিদ্যাপতি রাজসভার কবি হইয়াও

চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে নাটকের মূল

তাঁহাদের বর্ণাঢ্য কাব্যে নাটকীয় গতিবেগ, দুর্বার আবেগের অকৃত্রিম সুর সঞ্চার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস গ্রাম্য সমাজের জন্য তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহার মধ্যে নাটকীয়তা আরও তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হইয়াছে —ইহার কাব্যগুণকে ছাপাইয়া ইহার নাট্যগুণই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড প্রভৃতি সংঘাতমূলক আখ্যান সংযোজনা করিয়া ইহার নাটকীয় আবেদনকে ঘনীভূত করিয়াছেন। নাটকের যে প্রধান লক্ষণ— প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর মুখে চরিত্রানুযায়ী ভাষার আরোপ—তাহাও রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই-এর সংলাপের মধ্যে চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'কে শুধু কাব্য না বলিয়া গীতিনাট্য বা নাটগীতি বলাই অধিকতর সঙ্গত।

চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে নাটকের লক্ষণ আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল। চৈতন্যদেব নিজে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে এত বিভোর ছিলেন যে তিনি সর্বদাই এই প্রেমলীলার অনুধ্যান ও অভিনয় করিতেন। তাঁহার দিব্যোন্মাদ তাঁহার এই ভাবতন্ময়তারই বহিঃপ্রকাশ। অভিনেতা যেমন অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, চৈতন্যদেবও তেমনি আপনাকে রাধা বা কৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি মনে করিয়া নিজ ব্যক্তিসত্তাই বিস্মৃত হইতেন। আমরা চৈতন্য-জীবনী হইতে জানিতে পারি যে তিনি একাধিকবার কৃষ্ণলীলার অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই অভিনয় কতখানি প্রাচীন যাত্রার পূর্বাভাস তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কিন্তু অভিনয়-প্রেরণা হইতে নাটকের রূপকল্প উদ্ভূত হয় বলিয়া এই সময় যে নাট্যাঙ্গিকের আদর্শ কিছুটা স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। চৈতন্যযুগে তৎপ্রচারিত প্রেমধর্মের প্রভাবে জাতীয় জীবনে যে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল তাহা নাটক-রচনার উপযোগী পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় রূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব' নামে কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত দুইটি নাটকে ও কবি কর্ণপূরের চৈতন্যলীলা-বিষয়ক 'চৈতন্য-চরিতামৃত' নাটকে। এই নাটক তিনখানি সংস্কৃত ভাষায় ও নাট্যাদর্শে রচিত বলিয়া উহাদের বাংলা নাটকের উদ্ভবে বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। উহারা কেবল যুগের নাটকপ্রবণতার নিদর্শন ও কোন কোন লৌকিক নাট্যধারা, বিশেষতঃ প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা এই উৎস হইতে ভাবপ্রেরণা ও কিছু কিছু আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে।

চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে নাট্যধারা

চৈতন্যদেব যেমন কৃষ্ণলীলার মূর্ত অভিনয়-বিগ্রহ ছিলেন, তেমনি চৈতন্যলীলাও আমাদের অন্তরে নাট্যাবেগের আলোড়ন জাগাইয়াছে। রাধাকৃষ্ণকে যেমন আমরা চৈতন্যদেবের আবেগ-বিহ্বল অনুভূতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে ও তাঁহাদের লীলাবিলাসকে নাট্যকলার বিষয়রূপে অনুভব করিতে শিখিলাম, তেমনি চৈতন্য-জীবনও —বিশেষতঃ তাঁহার জগাই-মাধাই উদ্ধার ও সন্ন্যাসগ্রহণ—আমাদের মনে নাট্যমুক্তির উপযোগী আবেগ সঞ্চার করিল। বোধ হয় 'কৃষ্ণযাত্রা' ও 'নিমাই-সন্ন্যাস' যাত্রা-পালার আদিম প্রেরণা চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তী যুগ হইতে উদ্ভূত। ইহাদের লিখিত রূপ হয়ত লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এই ধারা যে অষ্টাদশ শতকের নাট্যপ্রচেষ্টার পিছনে প্রবহমান এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণযাত্রা ও নিমাই-সন্ন্যাস যাত্রা

কিন্তু কার্যতঃ আমরা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ নাটক পাই নাই, পাই গীতিকবিতার মধ্যে নাট্য-ইঙ্গিতের ফল্গুপ্রবাহ। পদাবলী সাহিত্যের পালা-বিভাগ, নায়ক-নায়িকার মানস অবস্থা-অনুযায়ী পদবিন্যাস, মান-অভিমান-বিষয়ক পদে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক সংলাপের প্রাধান্য, সখী ও দূতীর মুখে তীক্ষ্ণ অভিযোগের আরোপ, কীর্তনিয়াদের আঁখরের সাহায্যে অন্তর্নিহিত ভাব ও অস্ফুট সংঘাতের পরিস্ফুটন—এ সমস্তই এক সর্বব্যাপী নাটকীয় পরিবেশের দ্যোতক। কোন কোন সমালোচক* মনে করেন যে এই আঁখরের সম্প্রসারণ ও গায়কের তত্ত্বব্যাখ্যা ও মন্তব্যের সংযোজনার মাধ্যমে কীর্তন হইতে যাত্রার উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

কীর্তন হইতে যাত্রার উদ্ভব

২

মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই এই অভিনয়প্রবণতা, সুরসংযুক্ত আবৃত্তির দ্বারা রস-সঞ্চার-প্রয়াস বাঙালীর নাট্যকৌতূহলের সাক্ষ্য দেয়। ইহার সঙ্গে নৃত্য ও গান নাট্যরস-স্ফুরণের সহায়তা করিয়াছে। চণ্ডী ও ধর্মমঙ্গলে আখ্যায়িকার সরল প্রবাহ ও ঘটনার ত্বরিত গতি বিশেষ একটি নাটকীয় মুহূর্তকে জমাট বাঁধিবার অবসর দেয় নাই। কিন্তু 'মনসামঙ্গল'-এ চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বৈরথ সংগ্রাম ও বাসরঘরে সদ্যঃ-

মঙ্গলকাব্যে নাটকীয়তা

* বঙ্গসাহিত্যে নাটকের ধারা—বৈদ্যনাথ শীল

পতিহারা বেহুলার স্তম্ভিত-করা দুর্ভাগ্য সুস্পষ্ট নাটকীয় আবেদন লইয়া আমাদের কল্পনাকে আলোড়িত করে। বেহুলা ও চাঁদসদাগরের বিষয়ে আধুনিক কালে যেসব নাটক লেখা হইয়াছে তাহাদের মধ্যযুগীয় কোন পূর্বরূপ ছিল কি না তাহা জানা যায় নাই, তবে এই জাতীয় আবৃত্তির মধ্যে জনসাধারণের কাব্যরস অপেক্ষা নাট্যরস-পিপাসাই যে অধিক নিবৃত্তি লাভ করিত এরূপ অনুমান করা চলে।

রামায়ণ-মহাভারতের নাট্যরূপ-গ্রহণে বিলম্ব

রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি হইতে বর্তমান যুগের নাটক অনেক উপাদান সংগ্রহ করিলেও মধ্যযুগে ইহারা যে বিশেষ নাটকীয় প্রেরণা যোগাইয়াছে এরূপ কোন নিদর্শন নাই। এগুলি পাঁচালি-কাব্যরূপে অভিহিত হইয়াছিল। ইহাদের সুরসংযোগে আবৃত্তি করার প্রথা অবশ্যই ছিল; কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেদনের প্রাধান্য ও আদ্যন্ত সমগ্র কাহিনীর প্রতি সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হওয়ার জন্য কোন বিশেষ ঘটনার নাট্যসম্ভাবনা হয়ত দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যকথার অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্যই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, রামায়ণ-মহাভারতের নাট্যরূপায়ণের জন্য আমাদিগকে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

প্রথম বাংলা নাটক

নেপালে আবিষ্কৃত চারিখানি নাটক সপ্তদশ শতকের কাছাকাছি বাংলা যাত্রা-গানের মিশ্রপ্রকৃতি ও আঙ্গিক-শিথিলতার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর নাট্যরূপ বাংলা নাটকের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে গীত ও অশ্লীলতা সমান মাত্রায় মিশ্রিত। ইহার 'গীতাভিনয়' নামই ইহার মধ্যে গীতি-প্রাধান্য সূচিত করে।

কবিগান ও নাটক

পাঁচালি ও প্রাচীন যাত্রার মধ্যে নাটকীয় উপাদান ও আদর্শ কতটা ছিল তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। নাটক-প্রসঙ্গে কবিগানের উল্লেখ নাটকের গীতিপ্রাধান্য ও গীতোদ্ভবতার আর একটি নিদর্শন। বাস্তবিক কবিগানের মধ্যে খানিকটা অসংলগ্ন ও যদৃচ্ছাপ্রবর্তিত কথা-কাটাকাটি ছাড়া আর কোন নাটকীয় লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দুই প্রতিযোগী কবির দলপতি দুই বিভিন্ন অথচ পরস্পর-সম্পর্কিত চরিত্র রূপে আবির্ভূত হইয়া চরিত্রানুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি করিতেন ও শ্লীলতাহীন আক্রমণের দ্বারা পরস্পরকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতেন।

এই অংশ-অভিনয় ও চরিত্র-সঙ্গত বাক্যযোজনার জন্য কবিগানের মধ্যে নাটকের ঈষৎ স্পর্শ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার সহিত আসল নাটকের যোগসূত্র অতিশয় ক্ষীণ। কবিগান প্রকৃতপক্ষে কাব্যশাখারই অন্তর্ভুক্ত।

কবিগানের উদ্ভব ও বিস্তার

ঈশ্বর গুপ্তের মতে কবিগানের উন্মেষ-কাল অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে। তখনও কলিকাতার নাগরিক জীবন আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অভিমত—যে, কবিগান নাগরিক প্রতিবেশে উদ্ভূত হইয়াছিল ও হঠাৎ-ধনী কলিকাতার ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য গাওয়া হইত—সম্পূর্ণ গ্রহণীয় মনে হয় না। গ্রামীণ পরিবেশের চিহ্ন ইহার ভাবানুপ্রেরণার মধ্যে অতি পরিস্ফুট। সব কবিওয়ালাই কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন না। অবশ্য উঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দুই জনের—হরু ঠাকুর ও রাম বসুর—নিবাস কলিকাতাতেই ছিল। তবে ইহা সত্য যে রাজা নবকৃষ্ণপ্রমুখ অভিজাতবংশীয়দের রুচিসমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরবর্তী যুগে কবিগানের আসর কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কিন্তু সে কলিকাতা আধুনিক কালের যান্ত্রিক ও সমাজসংহতিরিক্ত কলিকাতা নয়; উহা ছিল গ্রাম্য সমাজেরই সম্প্রসারিত সংস্করণ।

কবিগানের লৌকিক অংশ

কবিগানের প্রধান উৎস ছিল রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অধ্যাত্মভাব-বর্জিত, স্থূলদেহাসক্তি-প্রধান লৌকিক অপভ্রংশ। যখন এই প্রেমের রস ইতর জনসাধারণের আসরে অশিক্ষিত-পটু, স্বভাব-নির্ভর কবিসম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত হইতে লাগিল, তখন যে উহা রুচিতে বিকৃত, অতিমাত্রায় লঘু-তরল ও কাব্যগুণে নিকৃষ্ট হইবে ইহা স্বাভাবিক। আসরে মুখে মুখে ও হঠাৎ-প্রয়োজনের তাগিদে যে সমস্ত গান রচিত হইত তাহারা যে ক্ষণজীবী হইবে ইহাতেও আশ্চর্যের কিছু নাই। যখন কথা, কাটাকাটি কবিগানে প্রধান হইয়া উঠিল ও ইতর শ্রোতৃবৃন্দের রুচির সমর্থন পাইল তখন উহার কবিত্বও যে উপিয়া যাইবে তাহাও অনিবার্য। কিন্তু তথাপি যে সমস্ত কবিগান কালের শাসন এড়াইয়া আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাদের ভাবের সরল আন্তরিকতা ও কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে লজ্জিত হইবার কিছু নাই। বরং বাংলা দেশে যে এত উচ্চদরের স্বভাবকবি ছিলেন ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

কবিগান সম্বন্ধে আমাদের বিভ্রান্তিকর ও স্ববিরোধী ধারণা স্পষ্ট করিয়া

লইবার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবিগানের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত "স্থূল, মূঢ় ও রূঢ়" ছিল কালের আগুনে তাহারা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। কবির আসরে সদ্যোরচিত যে সমস্ত অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ গান ইতর শ্রোতাদের আনন্দ দিত ও সুরুচিসম্পন্ন সমালোচকদের দ্বারা তীব্র ভাষায় নিন্দিত হইত তাহারা কিছুদিন লোকের স্মৃতির মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া এখন বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ছাপার অক্ষরে তাহাদিগকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। অশ্লীল কবিগানের দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগের ব্যক্তিরা বোধ হয় বিশেষ উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না। উহার যে সমস্ত নমুনা মুদ্রিত আকারে আমাদের নিকট পৌছিয়াছে ও চিরন্তন সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে রুচিবিকার ও অশালীনতার অভিযোগ প্রযোজ্য নহে। তাহাদের বিরুদ্ধে বড়জোর গঠনের শিথিলতা ও অতিভাষণ-প্রবণতার অভিযোগ করা যাইতে পারে। গোঁজলা গুঁই-এর 'এসো চাঁদবদনি', বাসু-নৃসিংহের 'কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা,' কেষ্টা মুচির 'হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে,' রাম বসুর বিরহের গান, কিছু কিছু আগমনী ও বিজয়া গান—এ সবই উচ্চাঙ্গের কবিত্বসম্পন্ন ও আন্তরিকতায় মর্মস্পর্শী। বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাসংগ্রহে এগুলি স্থান পাইবার উপযুক্ত। মনে হয় এইজাতীয় গান আসরে রচিত হয় নাই; কবির নির্জন অনুভূতি ইহাদের উৎস। রাম বসুর আগে কবিগানে বাগ্‌যুদ্ধের প্রথা পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তৎপূর্বে পালার উপযোগী গান বাঁধিয়া আনিয়া আসরে গীত হইবার রীতি ছিল। কবির শ্রেষ্ঠ গানগুলি এই পূর্বচিন্তনেরই ফল বলিয়া মনে হয়।

কবিগানের কাব্যোৎকর্ষ

কবিওয়ালাদের গানে আর একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব লক্ষণীয়। ইহাদের গানে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার সুর শোনা যায়। পদাবলী সাহিত্যের প্রেমগীতির পিছনে কিছু মানবিক অনুভূতি ছিল কি না সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। যদি বা ইহার মূলে কবির কোন ব্যক্তিগত বা সমাজ-সম্ভব আবেগ ছিল, ধর্মবোধের ঘন প্রলেপে তাহা চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে যখন এই প্রলেপের আবরণ ক্ষীণ হইয়া আসিল, তখন সমাজ-মনের নবোদ্ভিন্ন আবেগ-আকূতি বৈষ্ণবসাধনার ভাববৃত্তকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। কবিগানে যদিও রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের রূপক ও চিত্র বহুল প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি

কবিগানে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার সুর

মনে হয় যে ইহার প্রেমবর্ণনায় এক অনভ্যস্ত, বাস্তবজীবন-সম্ভব উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছে। রাম বসুর বিরহ-গীতি বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর বিরহের প্রতিধ্বনিমাত্র নহে; ইহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। মনে হয় যে কৌলীন্যপ্রথা-প্রচলনের ফলে বাংলার উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতি পরিবারে যে বিচ্ছেদজ্বালা, স্বামিসঙ্গবঞ্চিতা, পিতৃসংসারে অবজ্ঞাতা নারীর মর্মবেদনা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহাই যেন এই গানের রন্ধ্রপথে চাপা সুরে উদ্গীরিত হইয়াছে। বাংলা গীতিকবিতা উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্ম হইতে লোক-জীবনে অবতরণ করিয়াছে, সেই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা কবিগানেই পাওয়া যায়। কবিগানে যাহা মরণীয় তাহা মরিয়া গিয়াছে; যাহা স্মরণীয় তাহাই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং কবিগান সম্বন্ধে আমাদের যে মুরুব্বিয়ানার মনোভাব তাহা বর্জন করিয়াই ইহার শাশ্বত মূল্যাবধারণ কর্তব্য।

পাঁচালি ও যাত্রাগানের আদিরূপ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে। মধ্যযুগে সমস্ত আখ্যায়িকা-কাব্যকে 'পাঁচালি' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হইত। রামায়ণ মহাভারতকে শ্রীরাম-পাঁচালি ও ভারত-পাঁচালি বলা হইত। পাঁচালির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনিশ্চিত; তবে ইহার প্রয়োগগত অর্থ এই বিরাট আখ্যান-কাব্যগুলি যে গীত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল তাহারই নির্দেশ দেয়। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৮) হাতে যে নবপর্যায়ের পাঁচালি প্রবর্তিত হয় তাহা গীতিপ্রধান ও কবিগানের উন্নততর, শিল্পগুণান্বিত সংস্করণ। এই পাঁচালির গীতিগুলি অলঙ্কার-যমক-প্রাচুর্যে ও শ্লিষ্ট উক্তির বহুল প্রয়োগে চমকপ্রদ; ইহারা পালাকারে গ্রথিত বলিয়া ইহাদের পিছনে একটা আখ্যায়িকার যোগসূত্র বর্তমান। দাশরথি প্রাচীন ভক্তিরস-উদ্বেলতার শেষ কবি। আদি পাঁচালির আখ্যায়িকার পিছনে সুর ও গানের গৌণ সংযোগ ছিল; দাশরথির পাঁচালির ক্ষেত্রে গীতপরম্পরার পিছনে যাত্রাপালার অবিচ্ছিন্ন আখ্যানধারা প্রবাহিত। বাঙালী কবির ভাবকেন্দ্র যে আখ্যায়িকা হইতে গীতিকবিতায় সরিয়া আসিয়াছে, পাঁচালির রূপান্তরে তাহাই প্রমাণিত।

পাঁচালি ও দাশরথি

২

নাটক-রচনার সূত্রপাত

বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার নাটক আসিল ইহার পূর্ব-প্রবণতার স্বাভাবিক পরিণতিরূপে নহে, সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের সচেতন অনুকরণ ও বিলাতী

রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জার আকর্ষণে। বস্তুতঃ বাংলার সমাজ-পটভূমিকায় আগে আসিয়াছে রঙ্গমঞ্চ, পরে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অভিনয়-যোগ্য নাটকের সন্ধান হয়। এইভাবে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িয়া আধুনিক নাটক বিপরীতমুখী হইয়া বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে।

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটকের উদ্ভব

১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে হেরাসিম লেবেডেফ নামে রুশদেশীয় এক ভদ্রলোক কলিকাতায় প্রথম নাট্যশালা নির্মাণ করেন। ইহারই অনুকরণে দেশীয় নাট্যমোদী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বাটীতে অথবা উদ্যান-ভবনে পাশ্চাত্য আদর্শে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও এই সমস্ত রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য নাটক-রচনার ভার সে যুগের খ্যাতনামা লেখকদের উপর অর্পণ করেন। এইভাবে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে (১৮৩৫) ও বেলগেছিয়ার রাজাদের বাগানবাড়িতে (১৮৫৮) রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নের দ্বারা 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ করা হয় এবং এই অভিনয়দর্শনের ফলে সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন দত্তের মৌলিক নাটক লিখিবার প্রেরণা জাগে। এইখান হইতে বাংলায় মৌলিক নাটকের ধারার আরম্ভ। তৎপূর্বে সংস্কৃত ও ইংরেজী হইতে অনুবাদ ও মৌলিক রচনার প্রথম অপটু প্রয়াসের কথা মনে রাখিলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পরিস্ফুট হইবে।

প্রথম যুগের নাট্যশালা ও অনুবাদ-নাটক

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার-কৃত 'বেণীসংহার', 'রত্নাবলী' ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'র নাম করা যাইতে পারে। এই নাটকগুলিতে সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে লেখক বাংলা বাচন-রীতি গ্রহণ করিয়া ও মাঝে মধ্যে যাত্রার অনুসরণে গানের সংযোজনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যখন বাংলা নাটক সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত আঙ্গিক বা রীতির বিশেষ প্রভাব পড়িল না।

রামনারায়ণের সংস্কৃত নাটক

ইংরেজী হইতে অনুবাদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' (১৮৪৩) ও 'চারুমুখচিত্তহরা' (১৮৬৪) নাটকদ্বয়ের যথাক্রমে শেক্সপিয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভিনিস' ('Merchant of Venice') ও 'রোমিও জুলিয়েট' ('Romeo Juliet')-এর ভাবানুকরণ করেন। কিন্তু নাটকগুলি মঞ্চে অভিনীত হয় নাই ও অন্যান্য নাট্যকারকে প্রভাবিতও করে নাই।

ইংরাজী নাটকের অনুবাদ

ইহার পূর্বেই মৌলিক নাটকরচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) বাংলা ভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। লেখকের ভূমিকাতে বোঝা যায় যে তিনি ট্রাজেডির ভাবের দিক দিয়া যৌক্তিকতা অনুধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ ইহার রূপ দেওয়া তাঁহার শক্তির অতীত ছিল। নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকের বিসদৃশ যোগসাধনে ও রূপকথার অবাস্তবতার মধ্যে ট্রাজেডিবিধানের অমোঘতা প্রবর্তন করিয়া তিনি এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ী তৈরী করিয়াছিলেন। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) পৌরাণিক কাহিনী-অবলম্বনে রচিত—তিনি ইহাতে ইংরেজী নাটকের দৃশ্য-সংযোজনা ও বিভাজন-পদ্ধতি অনুসরণ করেন, কিন্তু নাটকীয় সংলাপে পয়ার ব্যবহার করায় ইহার নাটকীয় আবেদন প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

মৌলিক নাটকের উদ্ভব

৩

নাটকের পরিণত রূপ

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) প্রথম সার্থক নাটকের গৌরব দাবি করিতে পারে। ইহাতে লেখক পুরাণ ও পরানুকরণ ছাড়িয়া সর্বপ্রথম বাস্তব সামাজিক জীবনে পদক্ষেপ করিয়াছেন। বাংলা সমাজে যাহা সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় ও কুফলপ্রসূ প্রথা সেই কৌলীন্যের করুণ ও উপহাস্য দিক উদ্ঘাটন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার দৃশ্যাবলী পরস্পর-বিচ্ছিন্ন থাকিয়া নাটকীয় সংহতির নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই; ইহার কৌতুকরস কোথায়ও করুণ ও কোথাও প্রহসন-ধর্মী হইয়াছে; ইহার সংলাপ কখনও বা অলঙ্কারভার-বিড়ম্বিত, কখনও বা কথ্যভাষার ইতরতার আতিশয্যে ভাঁড়ামোতে পর্যবসিত। চরিত্রসমূহ ব্যক্তি নয়, শ্রেণীপ্রতিনিধি (type); কোন কোন চরিত্র—যেমন অনৃতাচার্য—সস্তা হাস্যরসের খাতিরে অবাস্তব হইয়াছে। তথাপি সমস্ত দোষ সত্ত্বেও ইহাতে প্রথম সত্যকার সমাজ-জীবনের স্পর্শ ও মানবহৃদয়ের আন্দোলন অনুভব করা যায়। সমস্যাপীড়িত মানবজীবনের অন্তরবেদনা, প্রথানুগত্যের পিছনে গোপন মর্মব্যথা, হাসির অন্তরালে অশ্রুর আভাস নাটকখানিকে জীবন-রসোচ্ছল করিয়াছে। বাঙালী শ্রোতা সর্বপ্রথম নিজ সমাজ-পরিবেশে আপনার হাসি-কান্নায়, বিদ্রূপ-সমবেদনায় দোলায়িত হইয়া আত্মপরিচয় লাভ করিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগর যে নূতন সমাজ-চেতনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাই

কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক

একটি বিশেষ সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া রামনারায়ণের হাতে নাটকীয় রূপ লাভ করিল। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' সমাজসংস্কার-উদ্দেশ্যে লেখা বাংলা নাটকের প্রথম নিদর্শনরূপে নাট্যসাহিত্যে অমর হইয়া রহিল।

নাট্যকার মধুসূদন

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) নিজ প্রতিভার স্পর্শে বাংলা নাটককে অনিশ্চিত পরীক্ষার অস্থির ও উদ্দেশ্যহীন গতি হইতে মুক্তি দিয়া উহার নিজস্ব প্রকৃতিটি আবিষ্কার করিলেন; ইহার নানামুখী উদ্‌ভ্রান্ত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রসংহত করিয়া ভবিষ্যৎ গতিপথটি স্থির করিয়া দিলেন। তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) ও 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) এই তিনটি নাটক ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এই দুইটি প্রহসন বাংলা নাট্যকলার প্রথম সার্থক ও সুসংবদ্ধ প্রকাশরূপে চিরস্মরণীয়। মধুসূদনের নাট্যরচনায় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুকরণের চিহ্ন থাকিলেও, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে ঘনীভূত নাট্যরসে, নাটকীয় রস-পুষ্টির জন্য ঘটনা-বিন্যাসে এবং চরিত্রসৃষ্টি ও মূল্যায়নে আধুনিক যুগের বাঙালীর প্রাণধর্ম ও জীবননিষ্ঠতার পরিচয় সুস্পষ্ট। তাহার প্রহসন দুইটিতে স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে তাঁহার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও অভ্রান্ত লক্ষ্য তাঁহার নিখুঁত সঙ্গতি-বোধ ও নাটকীয় উদ্দেশ্যের একমুখিতাকে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। সমাজ-জীবনের অসংখ্য দুর্নীতি-অসঙ্গতির মধ্যে আপন শক্তিকে বিক্ষিপ্ত ও ব্যঙ্গাতিরঞ্জনে স্বাভাবিকতাকে বিকৃত না করিয়া তিনি সুনির্বাচিত একটি বিষয় হইতেই পূর্ণ কৌতুকরসের বিকাশ সাধন করিয়াছেন। নবীনের অশোভন উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রাচীনের ধর্মাভিনয়ের অন্তরালে পাপাসক্তি উভয়কেই সমানভাবে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি আপনার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। তবে নবীনের দোষ ব্যক্তিগত নহে, গোষ্ঠীগত এবং ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষমার্হ; কিন্তু প্রাচীনের ভণ্ডামি ও ইন্দ্রিয়লালসার প্রতি তাঁহার ব্যঙ্গ আরও তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। প্রথমটিতে নীতিবাদ ও রুচিবোধের এবং দ্বিতীয়টিতে ব্যঙ্গের মাধ্যমে মুখোস-খোলার প্রশ্রয়হীন কঠোরতার প্রাধান্য।

শর্মিষ্ঠা নাটক

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের রূপায়ণ ও ভাষণভঙ্গী সংস্কৃতাশ্রয়ী। আখ্যানের নাট্য-সম্ভাবনা মধুসূদন পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মুখ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ অভিনয়ের সাহায্যে না ফুটাইয়া বিবৃতির মাধ্যমে গোচর করিয়াছেন—আবার গৌণ বিষয়কে সুদীর্ঘ সংলাপের ভিতর দিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর যুগ্ম আকর্ষণে

যযাতির চিত্তের দোলায়মানতা, দেবযানীর প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে দাঁড়াইতে শর্মিষ্ঠার সঙ্কোচ ও প্রকাশ্য ও গোপন প্রেমের মধ্যে যযাতির মনোভাবের তারতম্য—এইগুলিই ছিল নাট্যরসের মুখ্য উপাদান। কিন্তু মধুসূদন এই সমস্ত সূক্ষ্ম মানস প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দেবযানীর অতি-উচ্ছ্বসিত অভিমান, শুক্রাচার্যের অভিশাপ প্রভৃতি ঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। মধুসূদন মহাভারতের মূল কাহিনীটিরই অনুবর্তন করিয়াছেন—পৌরাণিক আখ্যানরসই নাট্যরস অপেক্ষা তাঁহার নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত অলক্ষ্য নাটকীয়তাকে তিনি প্রস্ফুটিত করেন নাই। শর্মিষ্ঠার মধ্যে আদর্শ সতীর সহিষ্ণুতা মূর্ত হইয়াছে। এই গুণ যতটা কাব্যোচিত, ততটা নাটকোচিত নহে। ইহাতে পুরাণাভিভূত কবিচিত্তেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

পদ্মাবতী নাটক

'পদ্মাবতী' গ্রীক আখ্যানের ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। মধুসূদন অবশ্য গ্রীক পুরাণকে হিন্দু পুরাণের ছাঁচে ঢালিয়া উহাকে বাঙালী ধর্মসংস্কারের অনুযায়ী রূপ দিয়াছেন। শচীর ঈর্ষ্যাপরায়ণ, কর্তৃত্বাভিমানী চরিত্র গ্রীকদেবীর নিখুঁত প্রতিবিম্ব; কিন্তু মুরজা ও রতি হিন্দু আদর্শে রূপান্তরিত। পদ্মাবতী ভীরু, কোমলস্বভাবা, পরনির্ভরা বাঙালী নারী, হেলেনের মোটেই সমগোত্রীয়া নয়। ঘটনাবিন্যাস ও শেষ পরিণতি ভারতীয় অলৌকিক দৈবসংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঘটনাপুঞ্জের দ্রুত সঞ্চরণে, দৈবের মুহুর্মুহু হস্তক্ষেপে, পদ্মাবতী যে মুরজার কন্যা এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে নাটকীয় রস বায়ুতাড়িত সরোবরের ন্যায় কোথাও স্থির হইয়া জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই। এই দেবলোকের অবাস্তব আবহাওয়ায় মানবিক রসের একমাত্র স্ফুরণ ঘটিয়াছে রাজা ইন্দ্রনীলের ব্যাকুলতা ও পদ্মাবতীর করুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ে। দৃশ্যসংস্থানের দিক দিয়া 'পদ্মাবতী' শর্মিষ্ঠার তুলনায় অধিকতর অবিন্যস্ত। মনে হয় যে চমকপ্রদ আখ্যান-সন্নিবেশ ও বহিরাগত বিপদ্‌জালের মধ্যে যতটুকু নাটকীয় রস স্ফুরিত হইতে পারে লেখক তাহার বেশী আর কিছু চাহেন নাই। দৈব-নির্ভর, অলৌকিকতা-পিয়াসী বাঙালীর রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই তিনি তাঁহার নাট্যকলাকে নিয়মিত করিয়াছেন।

'কৃষ্ণকুমারী'-তে মধুসূদন দৈবশাসিত, মায়াময় সুখ-দুঃখে ভরা, পৌরাণিক জগৎ হইতে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ, অমোঘ কার্যকারণ-শৃঙ্খলায় গ্রথিত, দ্বন্দ্বময় রঙ্গভূমিতে নামিয়া আসিয়াছেন। অন্যান্য নাটকে যে বিপদের ঘনঘটা দৈবানুগ্রহে মুহূর্তে কাটিয়া গিয়াছে, এখানে তাহা ঘনীভূত হইয়া বজ্রনির্ঘোষে মানবভাগ্যকে অভিভূত

করিয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী'র আখ্যান কাজেই ট্রাজেডির পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

রাজপুত-ইতিহাসের রাজন্যবর্গের আত্মকলহ ও পরস্পর রেষারিষির সহিত গার্হস্থ্য জীবনের ছোটখাট চক্রান্ত মিশিয়া যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই এই শোকাবহ পরিণতি ঘটাইয়াছে। ঘরের ছোট আগুনেই রাজ্যব্যাপী বিরাট অগ্নিদাহের সৃষ্টি হইয়াছে। ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা নিজের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করিতে রাষ্ট্রবিপ্লবের আয়োজন করিয়াছে ও এক সরল, ফুলের মত শুভ্রশুচি রাজকুমারীর আত্মনাশের কারণ হইয়াছে। নাটকে বিরোধী দুই রাজা জয়সিংহ ও মানসিংহ উপলক্ষ্যমাত্র; কিন্তু তাঁহাদের উদ্ধত দাবি উদয়পুরের অসহায় রাজপরিবারে যে মর্মান্তিক অবস্থাসঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই নাটকের প্রকৃত উপজীব্য। রাজা, রানী, রাজভ্রাতা ও রাজকুমারী সকলেই এই আগুনের বেড়াজালে আটক পড়িয়া দারুণ অস্বস্তি ভোগ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ঠিক ট্রাজেডির বলিষ্ঠ দ্বন্দ্ব, দৈবের বিরুদ্ধে শৌর্যপূর্ণ সংগ্রাম নাই, আছে নিরুপায়ের হাহাকার ও করুণ রসের অতিপ্লাবন। কৃষ্ণকুমারীর নিজের কোন দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়া তাহার জীবনে এই নিদারুণ পরিণামের আবির্ভাব ঘটে নাই। মদনিকা তাহার মনে মানসিংহের প্রতি যে অনুরাগের বীজ বপন করিয়াছিল তাহা এত ক্ষীণ ও অপরিণত যে তাহা ট্রাজেডির সহায়ক কারণরূপে বিকশিত হয় নাই। শেষ পর্যন্ত যে সে অপরের হাতে বলি না হইয়া দেশরক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে আত্মবলিদান দিয়াছে ইহাতে তাহার ট্রাজেডির নায়িকার উপযুক্ত মর্যাদা কতকটা রক্ষিত হইয়াছে। মধুসূদনের শিল্পবোধ যে এখনও বিশুদ্ধ ট্রাজেডির রসে অভিষিক্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ এখানেও দেখা যায়। ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা-সম্বন্ধীয় দৃশ্যগুলি, তাহাদের চটুল বাগ্‌বিতণ্ডা, ছদ্মবেশধারণ, পরস্পরের মতলব বানচাল করিবার ধূর্ত প্রচেষ্টা--এই সবই হাস্যরস-প্রধান নাটকের লক্ষণাক্রান্ত; এই লঘু অস্ত্রক্ষেপ, এই "পঞ্চশরের বেদনামাধুরী" হইতে যে রুদ্রের রোষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে তাহা আমরা কেহই কল্পনা করিতে পারি না। কমেডির খোলসের মধ্যে ট্রাজেডির শাঁস ভরিয়া মধুসূদন যে ভাব-অসঙ্গতি ঘটাইয়াছেন তাহা ট্রাজেডির পরিপূর্ণ রস-বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে।

মধুসূদনের নাট্যরচনার কাল মাত্র দুই বৎসরব্যাপী। এই স্বল্পকালের মধ্যে এক অনভ্যস্ত শিল্পকলার প্রস্তুতিহীন অনুশীলনে তিনি যে পরিমাণ সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন। বাঙালীর জীবন-ঐতিহ্য ও

মন-মেজাজের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলার মিল ঘটাইতে যে সাময়িক ছন্দপতন অনিবার্য মধুসূদনের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহার চেয়ে বেশী গুরুতর নয়। সুতরাং যেমন কাব্যে, তেমনি নাটকেও তাঁহার প্রতিভা পূর্ণ অভিনন্দনের অধিকারী।

মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩) মধুসূদনের প্রায় সমসাময়িক নাট্যকার। এই দুই শ্রেষ্ঠ অথচ ভিন্নধর্মী নাট্যকারের যুগপৎ আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে নাট্যচেতনা যে কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর প্রকৃতি ও জীবনচর্চা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন জীবনকে দেখিয়াছেন কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে এক অদম্য উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসের ঘূর্ণিবায়ুর ভিতর দিয়া এবং পরবর্তী কালে এক মহাকাব্যোচিত মহিমা ও পৌরাণিক ভাবাসঙ্গের অন্তরাল হইতে। আর একজন জীবনকে দেখিয়াছেন তাহার অলিতে-গলিতে, তাহার পল্লী ও মফস্বল শহরের সহজ বিকীর্ণতায় ও ব্যাপ্তিতে, ইতর জনতার ভাঙা-চোরা মুখের কথায় ও মনোভঙ্গীতে, হাস্যরসিকের সমস্ত আবরণ-সরানো, অন্তর্ভেদী, তির্যক দৃষ্টিক্ষেপে। তাই মধুসূদন মিলনান্ত নাটকে সংযত-গম্ভীর, বিয়োগান্ত নাটকে অভিজাতরুচিতে আতিশয্য-বিরোধী। তিনি দীনবন্ধুর মত প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ও আশা মিটাইয়া কাঁদিতে জানিতেন না। বাংলার জীবন-যাত্রা তাঁহাকে উহার এই নিজস্ব অমার্জিত ভাবাতিশয্যের শিক্ষা দেয় নাই। দীনবন্ধুর নাটকে প্রথম বাংলা জীবনের উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তে মাটির স্পর্শ পাওয়া গেল। কোন ধার-করা কৃত্রিম উপাদান নহে, বাংলার জীবনসম্ভূত রসধারাই এখানে নাটকের দেহ ও মন গড়িয়াছে।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী

তাঁহার প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) কোন দৈবরোষসংঘটিত নহে, মানবিক-আচরণ-প্রসূত ট্রাজেডিকে রূপ দিয়াছে। ইহার শাশ্বত সাহিত্যমূল্যের সহিত সাময়িক প্রচার-তাৎপর্য মিশিয়া ইহাকে এক অসাধারণ গুরুত্ব দিয়াছে। ইহা শুধু জীবনের আবেগ-মুক্তির নহে, মনুষ্যত্ব-বিরোধী উৎপীড়ন-মুক্তিরও নাট্যকাহিনী। নীলকরদের অত্যাচার সে যুগে বাংলার প্রাণশক্তিকে পিষিয়া মারিতেছিল—ইহার প্রতিরোধ যেমন অর্থনৈতিক কারণে, তেমনি জাতীয় মর্যাদাবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যও একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। ইহার ভদ্র গার্হস্থ্য জীবন ও নিম্নশ্রেণীর লোকের ব্যক্তি-জীবন আশ্চর্যরূপ স্বাভাবিকভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও আবেগের মাত্রায় সম্পূর্ণ-

নীলদর্পণ

রূপে বাঙালী-ভাবাদর্শের অনুগামী। নীলকরের অত্যাচার যখন এই ভদ্র ও ইতর জীবনকে বিনষ্ট করিয়াছে, তখন কিন্তু ইহা এই উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম সুর জাগাইয়াছে। ইতর ব্যক্তিরা—যথা আদুরি, তোরাপ, সাধুচরণ প্রভৃতি—তাহাদের অভ্যস্ত ভাবের স্বচ্ছ দর্পণরূপ রসপূর্ণ কথ্য ভাষায়ই তাহাদের সুখ ও দুঃখ, সহজ জীবনানন্দ ও দুঃসহ লাঞ্ছনাবোধ প্রকাশ করে। ভদ্র ব্যক্তিরাই দুঃখের অসহ্য অভিঘাতে আত্মহারা হইয়া কৃত্রিম, আলঙ্কারিক ও অত্যুচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর লোক সম্বন্ধে দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ছিল, ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার সম্বন্ধে ছিল না এই মত স্পষ্টতঃ ভুল। মনে হয় যে ভদ্র ব্যক্তির আবেগ-প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার একটা ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ ও কৃত্রিম সাহিত্যাদর্শের প্রতি অকারণ মোহ ছিল। তিনি মনে করিতেন যে যে-ভাষায় সাধারণ লোকে দুঃখ জানায়, তাহা ভদ্র লোকের চূড়ান্ত ক্ষোভ ও অপমানবোধের প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যে অত্যাচার তোরাপকে কেবল দৈহিক নির্যাতন অনুভব করাইয়াছে, তাহাই গোলোক ও নবীনমাধবকে আত্মমর্যাদার উচ্চভূমি হইতে ধূলিসাৎ করিয়া তাহাদিগকে দেহযন্ত্রণার আতিরিক্ত এক দুঃসহতর আত্ম-গ্লানিতে জর্জরিত করিয়াছে। এই অনুভূতির পার্থক্যের জন্যই প্রকাশরীতির পার্থক্য। সহজ কথায় মনের যে চরম দুঃখ প্রকাশ করা যায় এই সত্য দীনবন্ধুর অজ্ঞাত ছিল। সংস্কৃত নাটকে চরিত্রের সামাজিক-মর্যাদা-অনুযায়ী ও নর-নারী-ভেদে যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ভেদ দেখা যায়, তাহারই অনুরূপ একটা পার্থক্য দীনবন্ধু নিজ নাটকে অনুসরণ করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর রচনার বিশিষ্টতা

বাঙালী জীবনে বাস্তব ট্রাজেডিকে রূপ দিতে গিয়া দীনবন্ধু মাত্রা রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে দুঃখের বীজাণু বাঙালী মনের অবচেতনে দীর্ঘকাল সুপ্ত ছিল তাহা যখন নাট্যানুভূতির উত্তাপে বাহ্যাভিব্যক্তি পাইল তখন ইহা প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে অতিমাত্রায় প্রকট হইল। যে গৃহস্থবধূ কখনও চেঁচাইয়া কাঁদে না, তাহার যদি একবার মুখ খুলিয়া যায়, তবে তাহার উচ্চকণ্ঠ সকলকে ছাড়াইয়া উঠে। তেমনি বাংলা সাহিত্যের স্বল্পবাক্ ট্রাজেডি-বধূ দীনবন্ধুর প্রশ্রয়ে চরম গলাবাজি করিয়াছে, শোককে উপভোগ-বিলাসিতার পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। স্তূপীকৃত মৃত্যু, উন্মাদ, আত্মহত্যার বীভৎস সমাবেশ বাংলা নাটকের সদ্যোজাত ট্রাজিক ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন হইয়াছে। উচ্চতম নাট্যাদর্শের মানদণ্ডে এই মরণ-বিলাসের

অনুপযোগিতা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই রুচিবিকার ও আতিশয্যপ্রবণতার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। প্রথম কারণ হয়ত নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা—নীলকরের অত্যাচারে একটা সমস্ত পরিবারকে উন্মূলিত না দেখাইলে জনমত ক্ষিপ্ত হইবে কি করিয়া? বিদ্যাসাগরকে রঙ্গমঞ্চে চটি-ছোঁড়ায় উত্তেজিত ও ইংরেজ সরকারের সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করিতে হইলে নাটকীয় সংযম অপেক্ষা নীতি-কৌশলগত অতিরঞ্জনই অধিক কার্যকরী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পৌরাণিক অতিভাষণের আদর্শও ইহার মূলে থাকিতে পারে। দীনবন্ধু পুরাণের বিষয় বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার সূক্ষ্মতর প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই—পৌরাণিক কল্পনাতিশয্য তাঁহার বস্তুনিষ্ঠতা ও স্বভাবচিত্রণের মধ্যেও অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, পুরাণ-রসপুষ্ট বাঙালীর রসরুচি ও মাত্রাজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও হয়ত তাঁহাকে সুর চড়াইতে হইয়াছে। 'নীলদর্পণ'-এর অতিরঞ্জনপ্রবণতার দায়িত্ব নাট্যকার ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সমভাগেই চাপাইতে হইবে—পরবর্তী যুগে গিরিশচন্দ্রও এই অস্থিমজ্জাগত সংস্কারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। 'নীলদর্পণ' দোষে-গুণে, বস্তুরসে ও ভাবাতিশয্যে বাঙালী-জীবনের নাটক।

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের মধ্যে—'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'জামাই-বারিক' (১৮৭২) ও 'কমলে কামিনী'-তে (১৮৭৩),—আর ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই, এগুলি সবই হাস্যরসাত্মক ও প্রায়শঃ প্রহসনজাতীয়। ইহাদের মধ্যে 'সধবার একাদশী' বিশেষভাবে আলোচ্য। এই নাটকে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিষয় আরও পূর্ণাঙ্গভাবে ও প্রচুরতর রসোচ্ছলতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর রসিকতা, তাঁহার তীক্ষ্ণ উত্তর-প্রত্যুত্তর-যোজনার অসাধারণ নৈপুণ্য, তাঁহার শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সার্থক ও সাবলীল প্রয়োগ এই নাটককে স্মরণীয় করিয়াছে। তরুণ বাঙালী সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগাসক্তি, তাহাদের খামখেয়ালী দুরন্তপনার নিত্যনূতন লীলা, স্ফূর্তি ও ইয়ারকির রঙীন আবেশ এই নাটকের দৃশ্যগুলির মধ্যে আশ্চর্য সরসতা ও স্বভাবানুবর্তিতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ডেপুটি জলধর ও কলিকাতায় আগন্তুক পূর্ববঙ্গীয় রামমাণিক্য এই লঘুপক্ষ-প্রজাপতিদলের সহিত মিশিতে গিয়া নিজেদের আরও উপহাসাস্পদ করিয়াছে। কিন্তু এই নাটকে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও গভীরভাবে পরিকল্পিত চরিত্র নিমচাঁদ। তাহার

চরিত্রে নব্যবঙ্গের ক্ষুরধার মনীষা ও অভাবনীয় নৈতিক অধঃপতন, আকাশস্পর্শী কল্পনা ও তাহার শোচনীয় বাস্তব পরিণতি, নির্লজ্জ মোসাহেবি ও মর্মভেদী অনুশোচনার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখানো হইয়াছে। সে শুধু একক ব্যক্তি নহে, সমগ্র যুগের প্রতিনিধি। নিমচাঁদ দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানবের রহস্যময় দ্বৈত-সত্তার অতুলনীয় প্রতিচ্ছবি। এই একটি চরিত্রের দ্বারা প্রহসন উচ্চাঙ্গের কমেডিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

৪

নট-নাট্যকারের আবির্ভাব ও সাধারণ রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা বাংলা নাটকের পরিণতির আর একটি স্তর সূচিত করিল। ইতিপূর্বে নাটকের অভিনয় হইত ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চে—তাহাতে কেবল নিমন্ত্রিত লোকেরাই দর্শক-শ্রেণীভুক্ত হইতেন, নাট্যামোদী জনসাধারণের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। সাধারণ লোকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে ও দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দল-গঠনপূর্বক অভিনয়কে একটা স্থায়ী বৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হইল। এই ব্যাপারে প্রথম দিকে নাট্যরচনার কোন নূতন প্রেরণার প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে যখন নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে হইল, তখনই প্রচলিত নাটকের অপ্রাচুর্য ও স্থলে স্থলে অনুপযোগিতাও অনুভূত হইল। দর্শকের রুচি-অনুযায়ী বৈচিত্র্য-প্রবর্তনের জন্যও নূতন নাটকরচনার প্রয়োজন দেখা দিল। এবং এই প্রয়োজনের সূত্র ধরিয়াই প্রতিভাশালী নট গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যকারের ভূমিকায় আবির্ভূত হইতে বাধ্য হইলেন। এই নট-নাট্যকারের দ্বৈতমিলন নাটক-রচনার ইতিহাসে নূতন যুগের সূত্রপাত করিল।

সাধারণ রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা

অভিনেতা কর্তৃক নাটকরচনার দোষ-গুণ দুইই আছে। গুণের মধ্যে হইল, রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় সম্বন্ধে অভিনেতা নাটকের নাট্যোপযোগিতা বাড়াইয়া তোলে। অভিনয়োৎকর্ষ নাটকের একটি প্রধান গুণ। রঙ্গমঞ্চের উপর ও দৃশ্যসংযোজনার মাধ্যমে কোন ভাবকে কিরূপ ফুটাইয়া তোলার সুবিধা, সংলাপের দীর্ঘতা ও ঘটনাসন্নিবেশের পারম্পর্য কিরূপ নিয়মিত করিতে হইবে এ বিষয়ে সাধারণ নাট্যকার হইতে নট-

অভিনেতা-নাট্যকারের দোষ-গুণ

নাট্যকার অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইবেন ইহা স্বাভাবিক। ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগে শেক্সপিয়র-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যখন নাটকরচনায় হাত দিলেন তখন নাট্যজগতে এক অভাবনীয় রূপান্তর সাধিত হইল। তেমনি গিরিশচন্দ্রের নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইবার ফলে বাংলা নাটকের যে গঠনদুর্বলতা, শ্লথ গতি ও পণ্ডিতী গন্ধ অনেক পরিমাণে কাটিয়া গেল, ইহা যে সাবলীল ও জীবনাবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিল তাহা নিঃসন্দেহ। দর্শকের রুচির সঙ্গে ইহার যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইল তাহাও স্বীকার্য। তবে এই সম্পর্কঘনিষ্ঠতা সব সময় হিতকর না হইয়া অপকর্ষেরও হেতু হইয়াছে। শ্রোতার স্থূল রুচি ও অহেতুক অন্ধ সংস্কারের দাবি মিটাইতে গিয়া বহু নাটককে যে পরিণতির স্বাভাবিকতা, ভাবসঙ্গতি ও আবেগের মাত্রাবোধ বিসর্জন দিতে হইয়াছে তাহা গিরিশচন্দ্রের খেদপূর্ণ স্বীকারোক্তিতেই পরিস্ফুট। তাহা ছাড়া বহুক্ষেত্রে নাটকের দ্বারা অভিনয় নিয়ন্ত্রিত না হইয়া অভিনয়ের দ্বারাই নাটক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। জনপ্রিয় অভিনেতৃবৃন্দের বিশিষ্ট ঝোঁক ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাট্যকাব্যকে চরিত্রসৃষ্টি ও পাত্রপাত্রীর মুখে ভাবের আরোপ করিতে হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১১), **ক্ষীরোদপ্রসাদ** (১৮৬৩-১৯২৭) ও **দ্বিজেন্দ্রলালের** (১৮৬৩-১৯১৩) যুগকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের নাটকের সংখ্যার অজস্রতা ও বিষয়ের বৈচিত্র্য অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ করে যে ইঁহাদের নিকট নাট্যপ্রেরণার একটা বিরাট উৎসমুখ খুলিয়া গিয়াছিল। ১৮৭২ হইতেই ১৯২২ এই পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা সাহিত্যে যত কাব্য ও উপন্যাস রচিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা নাটকের সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং এই যুগে সাহিত্য ও সমাজরুচির মুখ্য ধারা যে নাটকের খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য। এই কাল-পরিধির মধ্যে বাঙালী জীবনে যে দুইটি প্রধান ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—দেশাত্মবোধের নব উন্মাদনা ও পুনরুজ্জীবিত ভক্তিরসের প্রবল প্রবাহ—তাহা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ হইতে নাটকেই অধিকতর উদ্দীপনাময়, প্রাণ-মাতানো অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চাঙ্গের নাটকে সাহিত্যিক গুণের সহিত অভিনয়-নৈপুণ্য যুক্ত হইয়া উহার আবেদনকে আরও গভীর ও মর্মস্পর্শী করে। শ্রেষ্ঠ কাব্য ও উপন্যাস পড়িয়া আমাদের মনে যেটুকু ভাব জাগে, রঙ্গমঞ্চের সযত্নরচিত মায়াময় পরিবেশে ও অভিনয়ের প্রত্যক্ষবৎ উপস্থাপনে তাহা শতগুণে বর্ধিত হইয়া আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে। স্বাধীনতার স্পৃহা ও ধর্মানুভূতির উদ্বোধনে

নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ

বাংলা নাটক যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহার সহিত কাব্য-উপন্যাসের তুলনা হয় না। সাহিত্যের আবেদন কেবল শিক্ষিত, রসগ্রাহী মনের নিকট; কিন্তু নাটকের আবেদন উচ্চশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত-নির্বিশেষে প্রায় সর্বজনীন। কাজেই বলা যাইতে পারে যে এই সময়ে জাতির তীব্রতম জীবনাবেগ নাটকের মধ্যেই প্রতিফলিত হইয়াছিল।

দেশপ্রেমমূলক ও ঐতিহাসিক নাটক

তথাপি এইরূপ অনুকূল প্রতিবেশের মধ্যেও বাংলা নাটক চরম উৎকর্ষ ও নিখুঁত পারিপাট্য লাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে এই অতি-উচ্ছ্বসিত আবেগ মহৎ কর্মের আধারে বিধৃত হইয়া স্থায়ী আত্মপ্রতিষ্ঠা পায় নাই। কল্পনা-প্রধান দেশপ্রেমের উষ্ণ বাষ্পোচ্ছ্বাস হয়ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যকে মহৎ নাটকের গুণ-মণ্ডিত করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র নাটকটিকে সমবিন্যস্ত উৎকর্ষের উত্তুঙ্গতায় তুলিতে পারে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকখানি নাটক দেশপ্রীতির ভাবগৌরব ও নাট্যাবেগকে প্রশংসনীয় রূপ দিয়াছে, কিন্তু অবান্তর বস্তুর সমাবেশে ও প্রকাশের অসংযমে ইহারাও পূর্ণ সাফল্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য'-এ ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অবাস্তব কাল্পনিকতা ও অতি-স্ফীত ভাবালুতা মিশিয়া ইহার নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ ও দর্শকের রসানুভূতিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলিও সম্পূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ হয় নাই—উপাদান-বিশৃঙ্খলা ও বহুভাষণ এখানেও নাটকীয় সংহতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্ত নাটক আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতীতি হয় যে যে-দেশপ্রেম একটা সাময়িক বিক্ষোভ মাত্র এবং জাতীয় চরিত্রে অত্যাজ্য ভাবসংস্কাররূপে পরিণতি লাভ করে নাই, যাহা অপরিস্ফুট মুক্তি-কামনা হইতে স্থির অন্তর-সাধনায় উন্নীত হয় নাই তাহা শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রেরণা দিতে পারে না। স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবন হইতে নাটকে সংক্রামিত হয় নাই, বরং নাট্যকল্পনার বাস্তবাতিসারী মহনীয়তা অ-প্রস্তুত জাতীয় জীবনে এক ক্ষণিক উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাসেম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' (১৯০৭), 'মেবার পতন' (১৯০৮) 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সাজাহান' (১৯১২) ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' (১৯২১) বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। আলমগীরের দ্বৈতসত্তামূলক চরিত্র-রূপায়ণ ঐতিহাসিক নাটকে এক অভিনব মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন।

জাতীয় অনুভূতির দ্বিতীয় ধারা—ভক্তিরসপ্রবাহ—অবশ্য বাঙালী মানসের ঐতিহ্যগত স্থায়ী সংস্কাররূপে গণ্য হইতে পারে। উনবিংশ শতকের যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক প্রভাব শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই ধর্মসংস্কারের মূল কিছুটা শিথিল করিলেও ইহার সম্বন্ধে তাহার একটা মানস ঔৎসুক্য, বিচলিত নিষ্ঠার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা লালায়িত মনোভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় যখন আমাদের দেব-দেবী-কল্পনা ও অধ্যাত্মবোধ আবার প্রত্যক্ষ সত্যরূপে প্রতিভাত হইল, তখন ধর্মাকূতির একটা বিপুল ভাবোচ্ছ্বাস আমাদের অন্তরকে প্লাবিত করিল। এই উচ্ছ্বাস-তরঙ্গের প্রাণ-চাঞ্চল্যই গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ভক্তিমূলক নাটকে বিধৃত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের অলৌকিক ঘটনা, ঈশ্বরের মানবিক রূপে আবির্ভাব ও মনুষ্যবৎ ভাবাধীনতা, ভক্তির অসাধ্য-সাধন—সমস্তই আবার আমাদের নবজাগ্রত বিশ্বাস-প্রবণতার নিকট জীবন্ত সত্য ও রসচেতনার উদ্দীপকরূপে গৃহীত ও অভিনন্দিত হইল। মধ্যযুগের যাত্রাগান, প্রবল ধর্মাকূতি, উহার দার্শনিক তত্ত্বপ্রিয়তা ও সঙ্গীতপ্রাধান্য লইয়া, আধুনিক যুগের উচ্চতর অভিনয়কৌশল ও নাট্যরীতির সাহায্যে, আমাদের মানসলোকে আবার নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে অসংখ্য আখ্যায়িকা নাট্যরূপ লইয়া আমাদের অতীতের সহিত যোগসূত্রকে সুদৃঢ় করিল।

ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাটক

এইরূপ অলৌকিক আখ্যানবস্তুকে আধুনিক যুক্তিবাদী মনের নিকট গ্রহণীয় করিতে নাট্যকারদের বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক কলা-কৌশল অবলম্বন করিতে হইত না—আমাদের মনের সহজ বিশ্বাস, সুনিপুণ রচনাভঙ্গী ও অভিনয়ের দ্বারা যথাযথ ভাবোদ্রেক, বিশেষতঃ ভক্তিরসের মোহাচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা পৌরাণিক ঘটনাবলীকে কোনরূপ অদল-বদল না করিয়াই নাটকের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। অবশ্য আধুনিক বিচারের মানদণ্ডে এগুলি সম্পূর্ণ নাটক নহে, নাটকাধারে সংরক্ষিত অলৌকিক রসের আত্ম-বিস্তার ও যথাসম্ভব গাঢ় পরিণতি মাত্র। যেখানে দেব-মহিমা ও ভক্তের আত্মনিবেদনই নাটকের উপাদান, সেখানে জাগতিক নিয়ম বা কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকিতে পারে না। যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনাতে বা দুই বিরোধী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘর্ষে কিছুটা নাটকীয় উত্তাপ সৃষ্টি হয় বটে,—কিন্তু ইহাদের পিছনে সদা-সক্রিয় যে দৈবলীলা সমস্ত ঘটনার রশ্মিধারণ করিয়া আছে তাহারই অপ্রতিহত প্রভাবে মানবিক দ্বন্দ্বের উত্তেজনা মুহূর্তে স্তিমিত হইয়া পড়ে। তথাপি

এইজাতীয় নাটকই বাঙালীর সার্থকতম, তাহার মনোধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কান্বিত নাট্যরস-বিকাশের দৃষ্টান্ত। এই যাত্রাধর্মী, ভক্তিরস-প্লাবিত পৌরাণিক নাটকের প্রথম প্রবর্তকরূপে মনোমোহন বসুর (১৮৩১—১৯১২) নাম স্মরণীয়। এই পৌরাণিক নাটকে বাঙালী দর্শকের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আবেগের মাত্রাধিক্য ও সঙ্গীতের প্রাধান্য পুনঃপ্রবর্তিত হয়। তাঁহার 'সতী' (১৮৭৩) ও 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক (১৮৭৫) গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভাকে নূতন পথের সন্ধান দেয়। গিরিশচন্দ্রের' 'জনা' (১৮৯৩), 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৬) ও 'পাণ্ডবগৌরব' এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) বাঙালী নাটক হইতে যে রস আস্বাদন করিতে চাহিয়াছে, যে ভাবানুভূতিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

এই যুগে সমাজ ও পরিবার-জীবনের সমস্যামূলক নাটক অনেক রচিত হইয়াছে। পূর্বযুগের উদ্দেশ্যমূলক বা ব্যঙ্গাত্মক নাটক এখন প্রহসন ও অপেরা বা গীতি-নাট্যের রূপ লইয়াছে। সমাজজীবনের জটিলতাবৃদ্ধি ও পরিবারজীবনে আদর্শহীনতা ও ব্যক্তিসংঘাতের উগ্রতার জন্য এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে নাটকের উপযোগী হইয়া উঠিল। এই বিষয়ে নাট্যকারদের মনোভাব রামনারায়ণ ও দীনবন্ধুর মত মোটেই ব্যঙ্গপ্রবণ বা হাস্যরসপ্রধান নহে; তাঁহারা ইহার বিষাদান্ত, দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত দিকের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছেন। জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত যতই তীব্র হইল, ততই ইহা মিলনান্ত নাটকের সুলভ সমাধান অস্বীকার করিয়া ট্রাজেডির চরম দুঃখময় পরিণতিকে আহ্বান জানাইল। আবার ইহার সহজ দুঃখময়তার উপর শেক্সপিয়রের ট্রাজেডির আদর্শ—উহার নিয়তি-প্রেরিত অপ্রতিবিধেয় বেদনা, প্রতিকূল দৈব ও আপনার দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে মানুষের করুণ ব্যর্থতা, ছোটখাট ত্রুটির ভয়াবহ পরিণতি—আরোপিত হইয়া এক দুশ্ছেদ্য জটিলতার সৃষ্টি করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকে শেক্সপিয়রের ট্রাজেডির আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনুকরণের চিহ্ন মাঝে মাঝে অশোভনভাবে প্রকট হইলেও মোটামুটি একটা বিষয়োপযোগী ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছিল। সাজাহানের ভাগ্যবিপর্যয়ের ঐতিহাসিক সত্য শেক্সপিয়রের ট্রাজিক কল্পনার স্বাভাবিক আশ্রয়ভূমিরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু বাঙালীর অতি-সঙ্কীর্ণ ও গতানুগতিক গার্হস্থ্য জীবনে এইরূপ বিপর্যয়কারী, বিশৃঙ্খলা-বিধ্বংসী ট্রাজেডির অভ্যাগম আমাদের সঙ্গতিবোধের বিরোধী। উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে যে

গুরুগম্ভীর সামাজিক নাটক

বজ্র পড়িলে স্বাভাবিক হয় তাহাই যদি সমতলস্থিত লতাপাতা-ঘেরা কুটিরের উপর পড়ে, তবে ইহার ভাবসত্যে আমাদের সংশয় জাগে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' (১৮৯১)' 'বলিদান' (১৯০৫), ও 'শাস্তি কি শান্তি' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৪) ট্রাজেডির প্রতি এইরূপ অতিপ্রবণতার নিদর্শন ও সেইজন্য নাটক হিসাবে কম-বেশি অসার্থক।

বাংলা নাটকে সাধারণতঃ গম্ভীর ও বিষাদময় ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও ইহাতে যে রঙ্গরস, হাসি-খুশি ও লঘু, নিরঙ্কুশ কল্পনা-বিলাসেরও স্থান ছিল তাহা প্রমাণিত হয় ইহার প্রহসন ও অপেরাগুলিতে। সমস্ত প্রখ্যাত নাট্যকারই ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের গুরুগম্ভীর রীতির সঙ্গে সঙ্গে প্রহসন ও গীতি-নাট্যের লঘু ভঙ্গীরও অনুশীলন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—ইঁহাদের সকলেরই প্রহসন ও নৃত্যগীত-সমন্বিত, রোমাণ্টিক-কল্পনামধুর নাটকরচনাতেও দক্ষ হাত ছিল। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার শেক্সপিয়রের ট্রাজি-কমেডির আদর্শে গম্ভীর বিষয়ের মধ্যেও হাস্যরসিকতা ও তরল বাগ্‌ভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন। একজন মাত্র নাট্যকার প্রায় পুরাপুরি প্রহসন ও নকশা-রচয়িতা—তিনি রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫০—১৯২৯)। তাঁহার 'খাসদখল' (১৯১১) হাসির মধ্যে করুণ রস মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু এই উভয় রসের মধ্যে হাসি ও ব্যঙ্গচরিত্রেরই প্রাধান্য। তাঁহার প্রহসনাবলীর মধ্যে 'বিবাহবিভ্রাট', 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে' প্রভৃতির মধ্যে সামান্য ব্যঙ্গের খোঁচা থাকিলেও ইহারা প্রধানতঃ অনাবিল হাসির ফোয়ারাই ছুটাইয়া দেয়। গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার', 'আবু হোসেন' 'য্যায়সা কি ত্যায়সা,' দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' (১৮৯৭) ও 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) প্রহসন-শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

হাস্যরসাত্মক নাটক

ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রহসনে বা ব্যঙ্গরচনায় নহে, কল্পনা-প্রধান গীতিনাট্যে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে 'আলিবাবা' (১৮৯৭) ও 'বরুণা'য় কল্পনা-সঙ্গতি, দক্ষ ঘটনা-বিন্যাস, গান ও সংলাপের সুষ্ঠু মিশ্রণ এবং খামখেয়ালী, আকস্মিকতা-তাড়িত আচরণের মধ্যে নাটকোচিত মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই দুই গীতিনাট্যকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

গীতিনাট্য

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্য দিয়া আমরা বাংলার নাট্য-প্রতিভার শক্তি ও

দুর্বলতা, উহার বিষয় ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও মিশ্র, দ্বিধাজড়িত মনোভাব, উহার নাট্যকলার নিয়ন্ত্রণ-অসহিষ্ণু ভাবোচ্ছ্বাস, উহার প্রচুর প্রতিশ্রুতি ও অসম্পূর্ণ সিদ্ধির ইতিহাসের পরিচয় পাই। বাংলা নাটকের পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করিতেছে বাঙালীর চেতনায় পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে এক অন্তরঙ্গ ও অখণ্ড সংহতিস্থাপনের উপর। বাঙালী নিজ স্বভাবধর্মে স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার নাট্যকলাও যে অনুরূপ স্বকীয়তা ও দৃঢ়তা লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়।

বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাস ও ছোট গল্প

১

প্রস্তুতি-পর্ব

উপন্যাসের মূলবীজ নিহিত আছে মানুষের গল্পানুরাগে—তাহার গল্প শুনিবার ও উপভোগ করিবার সহজ প্রবৃত্তিতে। পৃথিবীর সমস্ত আদিযুগের সাহিত্যই আখ্যানমূলক। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসি প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলিতে আখ্যানের চমৎকারিত্ব ও জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি সুষ্ঠুভাবে সংমিশ্রিত হইয়াছে। আমরা গল্প পড়িতে পড়িতে যে সমস্ত চরিত্রের পরিচয় লাভ করি তাহারা সকলেই নিজ নিজ তীক্ষ্ণ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব লইয়া আমাদের অন্তরে স্থায়ী আসন গ্রহণ করে। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, একিলিস, আগামেমনন, প্যারিস, হেক্টর, হেলেন, এণ্ড্রোম্যাকি—ইহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাহাদের কথাবার্তা ও আচরণের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—ইহাদের আচরণের সঙ্গতি ও সংলাপের রীতি ইহাদিগকে সহজেই চিনাইয়া দেয়। মহাকাব্যরচয়িতারা সচেতনভাবে চরিত্র বিশ্লেষণ করেন না; ঘটনার প্রবাহ তাঁহাদের রচনায় এক মুহূর্তের জন্যও গতিহীন নহে। কিন্তু ঘটনাবিবৃতি ও ও ধর্মতত্ত্ব-আলোচনার মধ্য দিয়াও তাঁহাদের গভীর অনুভূতি ও কল্পনার সঙ্গতির জন্য চরিত্রগুলি সজীবত্ব ও আত্মবৈশিষ্ট্য লাভ করে।

আদিমযুগের আখ্যান-মূলক সাহিত্য

আর একপ্রকার গল্প আছে যাহা মুখ্যতঃ উদ্দেশ্যমূলক বা চমকপ্রদ ঘটনাবলীর সমাবেশ। উহাদের মধ্যে আমরা চরিত্র পাই না, পাই সমাজচিত্র, বাস্তব জীবনের বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত। পূর্ণবিকশিত স্বাতন্ত্র্য-তীক্ষ্ণ মানব-চরিত্র এখানে অনুপস্থিত—উদ্দেশ্য ও ঘটনার আকর্ষণই এখানে প্রধান। এই জাতীয় গল্পের দৃষ্টান্ত হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধ জাতক, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, ইটালী দেশের সাহিত্যে ডেকামেরন, রূপকথা প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিতে পশু-পক্ষীর রূপকচ্ছলে নীতিতত্ত্ব ও মানবপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; কতকগুলিতে

উদ্দেশ্যমূলক গল্পের ধারা

নিরঙ্কুশ রঙীন কল্পনার সাহায্যে অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা-পরম্পরার মাধ্যমে জীবনের রহস্যময়, আকস্মিক দিকটা সঙ্কেতিত হইয়াছে। ইহাদের চরিত্রগুলি অস্পষ্ট, ছায়াময়, কুহেলিকায় ঢাকা, ঘটনা-চমৎকারিত্বের আড়াল হইতে অর্ধ-পরিস্ফুট। এখানে আমরা মানুষ সম্বন্ধে ততটা কৌতূহলী নই, যতটা যে ঘটনা-জালে সে জড়াইয়া পড়ে তাহার প্রতি আগ্রহান্বিত। উপন্যাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই এই দুই ধারা বর্তমান ছিল এবং উহাদের হইতে প্রেরণা ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ও পরবর্তী যুগের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে উহাদের রূপান্তর-সাধন করিয়াই আধুনিক উপন্যাসের উদ্ভব। মানুষ যখন কেবলমাত্র শ্রেণীর প্রতিনিধি নহে, যখন সে নিজস্ব তাৎপর্য ও পরিচিতিতে প্রতিষ্ঠিত তখনই তাহার বিচিত্র জীবনকাহিনী লইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে।

বাংলা উপন্যাসের সুরু ব্যঙ্গচিত্রে

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস আসিয়াছে প্রধানতঃ সমাজের ব্যঙ্গচিত্রের সম্প্রসারণে; বিদেশী সভ্যতা ও জীবনাদর্শের অভিঘাতে আমাদের দীর্ঘকাল হইতে অনুসৃত স্রোতোহীন জীবনযাত্রায় যখন চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ জাগিল, যখন আমরা আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার দোষ-গুণ সম্বন্ধে সজাগ হইলাম, যখন অনুকরণ ও গোঁড়ামির বিপরীত-মুখী মোহান্ধতা আমাদের কৌতুকরস ও আঘাত করিবার প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করিল, তখনই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না হউক, উহার জন্মস্থল সমাজপ্রতিবেশ সাহিত্যের বিষয়রূপে গৃহীত হইল। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে 'নববাবুবিলাস' ও ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ভাবী উপন্যাসের আসন্ন পূর্বাভাসরূপে দেখা দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পটভূমি

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক মিলন-প্রচেষ্টা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল সেই প্রক্রিয়ায় পূর্ণ পরিণতির লক্ষণ দেখা দিল ও বাংলা সাহিত্য এই ভাবদৃষ্টি-সমন্বয়ের ফলে নূতন জীবনীশক্তিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। ইহার পরিচয় পাই কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের এবং উপন্যাস ও গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। প্রথম যুগের ব্যঙ্গাত্মক প্রবৃত্তি কাটিয়া গিয়া তাহার স্থলে গভীর মিলনের অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠিত হইল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বস্তু ও তথ্যকে ছাড়াইয়া এক বিশিষ্ট অন্তর্ভেদী ভাব-কল্পনা, মানবপ্রকৃতি-বিচারের এক নতুন অনুভূতি ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর রূপ পরিগ্রহ করিল। ইতিহাসবোধ জাগ্রত হইয়া অতীত যুগের বিস্ময় রসাশ্রিত কাহিনী ও

আবেগময় জীবনযাত্রার অস্পষ্ট স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ও তৎকালীন নরনারীকে জীবন্তবৎ আমাদের নিকটে উপস্থাপিত করিল। সমকালীন জীবনযাত্রায় মধ্যেও এক অভিনব ভাব-সংঘাত, আনন্দ-বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব আবিষ্কৃত হইয়া উহাকে অসাধারণ তাৎপর্য ও গৌরবে মণ্ডিত করিল। বাঙালী-জীবনের স্থির জলাশয়ে যেন এক অদৃষ্টপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাস, জোয়ার-ভাটার তরঙ্গলীলা খেলিয়া গেল। এই নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থলে অবস্থিত, জীবন-সমুদ্রমন্থনে অজ্ঞাত বিষামৃতের আস্বাদে বিহ্বল, নিজের অপ্রত্যাশিত পরিচয়-উদ্ঘাটনে বিস্মিত বাঙালী সমাজের চিত্রকর-রূপেই বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮—১৮৯৪) উপন্যাসাবলীকে মোটামুটি নিম্নলিখিত শ্রেণী-পর্যায়ে বিভাগ করা যায়—(১) ঐতিহাসিক: 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), রাজসিংহ (১৮৭৭); (২) ইতিহাস-পটভূমিকায় রচিত ও রোমান্টিক ভাবকল্পনা-রঞ্জিত গার্হস্থ্য জীবন-চিত্র: 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫); (৩) বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনাশ্রয়ী: 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৫), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৬); (৪) ধর্মতত্ত্ব-প্রভাবিত: 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী-চৌধুরানী (১৮৮৩), 'সীতারাম' (১৮৮৬); (৫) লঘু ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত: 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৩), 'রাধারানী' (১৮৭৫)।

২

বঙ্কিমচন্দ্র

এই বিভিন্ন শ্রেণীর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চিত্রণ ও ঘটনাবিন্যাসের বিশিষ্ট রীতিটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস লইয়া সর্বাপেক্ষা বেশী বিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। বঙ্কিমের উপস্থাপিত ঘটনাবলী কতদূর ইতিহাসসম্মত এই বিষয়ে সংশয় জাগিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সত্য অনুসরণ করা ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যবহির্ভূত ও ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস এখনও অনেকাংশে অনিশ্চিত। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের প্রয়োগ করেন উহার নির্ভুল তথ্যানুস্যূতের দিক দিয়া নহে, উহার সাধারণ জীবনসত্য ও যুগের সাধারণ লক্ষণের দিক দিয়া। অবশ্য ঔপন্যাসিকের ইতিহাস-চিত্রে একটা জীবনানুগ অন্তঃসঙ্গতি থাকা চাই ও কোনও কালানৌচিত্য-

ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

দোষ যেন ইহাতে অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া না উঠে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র-পরিবর্তন করার অধিকার তাঁহার নাই। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলাফল ঠিক রাখিতে হইবে—কিন্তু গৌণ চরিত্রকে তিনি ইচ্ছামত অঙ্কিত, ও যুদ্ধের মধ্যে কিছু কিছু নূতন ঘটনা তাঁহার উদ্দেশ্যানুযায়ী সংযোজন করিতে পারেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ হইবে ইতিহাসের প্রবল আকর্ষণে জীবনের গতিবেগ বাড়ানো ও উহার মধ্যে বীরত্বপূর্ণ, উন্নত-আদর্শ-মণ্ডিত ও আবেগ-তরঙ্গিত বিকাশসমূহ ফুটাইয়া তোলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইতিহাসের তথ্য হইতে উহার রস-নিষ্কাশন ও জীবনযাত্রায় উহার স্বচ্ছন্দ-সুন্দর লীলা-প্রদর্শনই আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে প্রত্যাশা করিতে পারি। ইতিহাসের খুঁটিনাটি লইয়া বিশেষ নাড়াচাড়া করিলে এই রসই জমাট বাঁধিবে না ও উহার উপভোগ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। আরও এইজাতীয় উপন্যাসে কার্যকারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃঢ় চরিত্রবিকাশ অপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনাসন্নিবেশই প্রধান আকর্ষণের বিষয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের **ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহে** মোটামুটি এই মূলসূত্রগুলি অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ষোড়শ শতকের

দুর্গেশনন্দিনী

শেষভাগে উড়িষ্যার অধিকার লইয়া মোগল-পাঠানে যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহারই পটভূমিকায় রচিত। এই যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে প্রেমের যে অতর্কিত উদ্ভব, দ্রুত পরিণতি ও সাফল্যের পথে নানা অভাবনীয় বাধা-বিঘ্ন ঘটিয়াছে তাহাই ইহার উপজীব্য। ইহার নায়ক মানসিংহের পুত্র যুবরাজ জগৎসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও ঠিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ নহেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী ক্ষাত্র শক্তির আদর্শ ও প্রেমপ্রবণ অথচ সন্দেহপরায়ণ তরুণরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তিলোত্তমা ও আয়েষা উভয়েই তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, কিন্তু আয়েষা আত্মদমনের দ্বারা তিলোত্তমার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। প্রতিনায়ক ওসমান ও বীরেন্দ্রসিংহ বীরত্বের সহিত ঈর্ষা, হঠকারিতা ও প্রবৃত্তির অসংযম মিশাইয়া খানিকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-পরিকল্পনার সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ ও আচরণে ইহাকে পরিস্ফুট করিবার ক্ষমতা তাঁহার তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলার রূপবর্ণনা ও উপন্যাসে উহাদের বিশিষ্ট অংশ-গ্রহণের মধ্যে চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিমলা, আসমানি ও বিদ্যা-দিগ্‌গজের চরিত্রে বাস্তব জীবনের দিকটাও দেখানো হইয়াছে। কতলু খাঁর হত্যা, তিলোত্তমার অন্তরে প্রেমের উন্মেষ, আয়েষার আত্মবিসর্জন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব—

এই দৃশ্যগুলি মানবিক আবেগবর্ণনায় বঙ্কিমের নিপুণতার পরিচয় বহন করে। 'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্স হইলেও ও ইহাতে মানবপ্রকৃতির পরিচয় অনেকটা হালকা ও স্বপ্নাবিষ্ট হইলেও ইহার মধ্যে যে বাস্তব স্পর্শের অভাব নাই, তাহা এই দৃশ্যগুলি ও তাঁহার সাধারণ জীবন-চিত্রণ প্রমাণ করে। বিমলাচরিত্র পুরনারী ও পরিচারিকার সংমিশ্রণে গঠিত ও নারীপ্রকৃতির দ্বৈতরহস্য ইহাতে কতকটা আভাসিত হইয়াছে।

মৃণালিনী

'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী। ইহাতে ইতিহাস-তথ্য অপেক্ষা ঐতিহাসিক কল্পনার অংশই বেশী। ইহার চরিত্রগুলি প্রায় সবই অনৈতিহাসিক। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কিংবদন্তীর পিছনে যে সুনিশ্চিত বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা বিদ্যমান, বঙ্কিম পশুপতি-চরিত্রে তাহাকেই রূপ দিয়াছেন। ইহার ইতিহাস-অংশ অত্যন্ত শিথিল; ঐ সুদূর অতীতের সাধারণ জীবনযাত্রাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। বাংলার স্বাধীনতালোপের পূর্ণাঙ্গ চিত্র বঙ্কিম দিতে পারেন নাই, তবে ইহার মর্মান্তিক গ্লানি ও অনুশোচনা তিনি অগ্নিস্রাবী ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আসলে রাজনৈতিক পটভূমিকায় ইহা দুইটি প্রেমের কাহিনী। হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণে কল্পিত—কেবল মৃণালিনীর অবিশ্বাসিতা সম্বন্ধে সন্দেহ ইহাকে ক্ষণেকের জন্য ঘোরাল করিয়াছে। পশুপতি-মনোরমার প্রেম আধুনিক জটিলতায় দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। পশুপতির আকর্ষণ সহজেই অনুভব করা যায়; কিন্তু মনোরমার মনোভাব—পশুপতিকে নিজ স্বামী জানিয়া তাহার প্রতি আগাইয়া যাওয়া, আবার পর-মুহূর্তেই এক নিগূঢ় বিমুখতায় পিছাইয়া আসা—প্রহেলিকার মত কৌতূহল জাগায়। মনোরমার নিজের প্রকৃতিতেও দ্বৈতভাবের সংমিশ্রণ তাহাকে একসঙ্গে আকর্ষণীয় ও দুরধিগম্য করিয়াছে। মনোরমাচরিত্র-পরিকল্পনা ও যবনপ্লাবনের দৃশ্য—এই দুইটি বিষয়েই বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক অগ্রগতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

রাজসিংহ

'রাজসিংহ'-কে (১৮৭৭) বঙ্কিম তাঁহার একমাত্র সত্যিকার ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে ইহাতে যে শুধু ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ বেশী আছে তাহা নয়, ইহাতে ইতিহাস-রসই উপন্যাসের প্রাণবস্তু। রাজসিংহ, আওরঙ্গজেব উভয়েই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং ইহারাই উপন্যাসের নায়ক ও প্রতিনায়ক। ইতিহাসের কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিসংঘর্ষই উপন্যাসের মূল উপাদান ও ইহার

পরিণতির স্তরনির্মাণের সহায়ক—ইতিহাসের কটাহে আবর্তিত হইয়াই উপন্যাসের রস ঘনীভূত হইয়াছে। ইতিহাস-বহির্ভূত অংশ—জেব-উন্নিস-মবারক-দরিয়া ও মানিকলাল-নির্মলকুমারীর কাহিনী—ইতিহাসের বৃহত্তর আলোড়নের মধ্যে ব্যক্তিক দ্বন্দ্বের ক্ষুদ্রতর ও তীব্রতর আত্মকেন্দ্রিক আবর্ত রচনা করিয়া ইতিহাসকে ব্যক্তিজীবনের রসে সমৃদ্ধ ও জীবনকে ইতিহাসের গতিবেগে চঞ্চল করিয়াছে। এখানে ইতিহাসের আকস্মিকতা যেন জীবন-নাটকের সুশৃঙ্খল পরিণতিতে বিধৃত হইয়া অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস গার্হস্থ্য জীবনের পটভূমিকারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে—এখানে ইতিহাস মুখ্য নহে, গৌণ। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'চন্দ্রশেখর'-(১৮৭৫)-এ পরিবার-জীবনের ঘরোয়া সুখ-দুঃখ-অন্তর্দ্বন্দ্বই ইতিহাসের সামান্য একটু স্পর্শে একটা ভাব-নিবিড়তা ও অসাধারণ রস-রূপ লাভ করিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'-য় ইতিহাস প্রায় নাই বলিলেই চলে। ইতিহাস-রাজ্য হইতে আগন্তুকা মতিবিব ইতিহাস হইতে যুগ-পরিচয় লইয়া আসে নাই, আসিয়াছে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তঃপুর-লালিত দুর্দম আকাঙ্ক্ষা ও দুর্জয় সংকল্প লইয়া। তাহার হঠাৎ-উন্মেষিত স্বামিপ্রেম কুলত্যাগ ও বহুচারিণীত্বের সমস্ত বাধাকে যে শক্তিতে হেলায় অস্বীকার করিয়াছে তাহার মূল উৎস বাদশাহের অন্দরমহলে সুদীর্ঘ জীবনযাপন-প্রসূত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। আবেগের যে স্পর্ধায় সেলিম মেহেরুন্নিসাকে পতিবক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, সেলিম-প্রণয়িনী মতিবিবিও সেই জোরে পূর্ব-স্বামীকে সপত্নীবক্ষ হইতে কাড়িয়া লইতে প্রস্তুত। এ শক্তি সে আর কোথা হইতে পাইত না বলিয়াই উপন্যাসে ইতিহাসের অবতারণা। 'কপালকুণ্ডলা'র সত্যিকার বিষয় হইল নায়িকার অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য-উদ্‌ঘাটন। নির্জন সমুদ্রকূলে, ধর্মীয় আবহাওয়ায়, অসামাজিক জীবনে লালিতা কিশোরী গার্হস্থ্য ধর্মের সহিত কতখানি নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে উপন্যাসের মধ্যে ইহারই পরীক্ষা চলিয়াছে। অবশ্য এই পরীক্ষার ফলে কোন সার্বভৌম জীবন-সত্যে পৌছানো যায় না। কপালকুণ্ডলার স্বভাব-নিস্পৃহ ও ধর্মমোহাভিভূত চিত্তে যে প্রেমের রং ধরে নাই ইহা যেমন তাহার আবেষ্টনের ফল, তেমনি তাহার প্রকৃতিরও পরিণাম। প্রথমদর্শনে নবকুমারের প্রতি তাহার যে দয়া ও সহানুভূতি জাগিয়াছিল, দাম্পত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা ও স্বামীর প্রণয়াতিশয্যের ফলেও তাহা প্রেমে রূপান্তরিত হইল না। শ্যামার স্বামিবশের ঔষধ-আহরণও সেই একই

কপালকুণ্ডলা

সমবেদনা-প্রসূত। ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রেম-সহযোগিতার উত্তাপ-ও-মাদকতা-শূন্য। সমুদ্রসৈকতের নির্জনতায় যাহার আবির্ভাব, জাহ্নবী-তরঙ্গের সমুদ্রাভিমুখী গতি-প্রবাহের মধ্যে তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রা ও নিশ্চিহ্ন বিলয়। যে নিগূঢ় ভাবসঙ্গতি শ্রেষ্ঠ রোমান্সের লক্ষণ, যে অনিবার্য ঘটনা-পরিণতির একমুখিতা মহৎ ট্রাজেডির প্রাণশক্তি সেই উভয়বিধ উৎকর্ষই 'কপালকুণ্ডলা'তে উদাহৃত হইয়াছে।

'চন্দ্রশেখর' অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ঘটনা-ভিত্তিতে রচিত। ইংরেজী-আমলের প্রতিষ্ঠা ও মীরকাশেমের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ—ইহাই উপন্যাসের পটভূমিকা। এখানে ইতিহাস ও গার্হস্থ্যজীবন প্রায় সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনী আর মীরকাশেম-দলনী এই দুই আখ্যান অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার একই জালে আবদ্ধ; এবং ইহাদের সহযোগিতা উপন্যাসের ট্রাজেডিকে আরও গভীর ব্যাপকতা দিয়াছে।

চন্দ্রশেখর

দরিদ্রের গৃহপ্রাঙ্গণে ও রাজার প্রাসাদে একই অপ্রতিবিধেয় দুর্দৈব নিজ অশুভ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইতিহাসের ঘূর্ণায়মান চক্রের তলে রাজমহিষী ও ব্রাহ্মণগৃহিণী একই সঙ্গে পিষ্ট হইয়াছে। দলনীর দুর্ভাগ্য মূলতঃ ইতিহাসসঞ্জাত—গুরগণ খাঁর রাজনৈতিক চক্রান্তই তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রস্থলে নিক্ষেপ করিয়াছে। শৈবলিনী নিজ অদম্য প্রবৃত্তির বেগেই পারিবারিক জীবনের সুরক্ষিত গণ্ডী হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—তবে এই গৃহ-উৎক্রমণের প্রথম প্রেরণা আসিয়াছে ইতিহাস-ঝটিকার এক ঝলক উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ হইতে। যে আগুনে চন্দ্রশেখরের গৃহ পুড়িয়াছে তাহা প্রধানতঃ শৈবলিনীর অন্তঃরুদ্ধ চিত্তপ্রদাহ হইতে উদ্ভূত; কিন্তু লরেন্স ফস্টার নামে ইতিহাস-অগ্নিকুণ্ডের একটা জ্বলন্ত শলাকা আসিয়াই ভিতরের চাপা আগুনকে বাহিরে মুক্তি দিয়াছে। শৈবলিনী-চরিত্র এই উপন্যাসে বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার সুদীর্ঘ আত্মনিরোধ, ফস্টারকে আমন্ত্রণ জানাইবার অভাবনীয় দুঃসাহসিকতা, দৃঢ় মনোবল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অনভ্যস্ত ইতিহাস-সঙ্কটের মধ্যে স্বচ্ছন্দ-নির্ভর পদক্ষেপ—এ সবই যেমন তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন, তেমনি তাহার উৎকট, নরক-বিভীষিকার উত্তপ্ত কল্পনাজাল-সমাকীর্ণ, মনোবিকারমূলক প্রায়শ্চিত্তের চিত্রও সেই একই অসাধারণত্বের দ্যোতক। তাহার মনোগহনের যে গভীর গুহায় তাহার পাপের অদৃশ্য মূল নিহিত, তাহাতেই অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া এক শ্বাসরোধকারী ধূম্রোচ্ছ্বাস বিকীর্ণ করিয়াছে। পাপ তাহাকে যে অতল গভীরে নিমজ্জিত করিয়াছে, আত্মশুদ্ধির প্রেরণা তাহাকে ঠিক সেই অনুপাতে কল্পনার

ঊর্ধ্বলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের এই ভারসাম্যের মধ্যেই শৈবলিনী-চরিত্রের স্বাভাবিকতা নিহিত। চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ শ্রেণীপ্রতিনিধি, ব্যক্তিত্বভাস্বর নহে, তবে শৈবলিনীর প্রবল আকর্ষণের সহিত তুলনায় প্রতাপের মিতভাষিতা ও সংযম তাহার ব্যক্তিত্বকে কতকটা পরিস্ফুট করিয়াছে। শৈবলিনীর রহস্যময় চরিত্র ও ইতিহাস ও পরিবার-জীবনের সুনিপুণ গ্রন্থনের মধ্য দিয়া নিদারুণ নিয়তিবাদের ব্যঞ্জনাই উপন্যাসটিকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসগুলি বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনের সংঘাত-সমস্যা-সম্বন্ধীয়। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৫), ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৬) বঙ্কিম-প্রতিভার উচ্চতম বিকাশ। এই উপন্যাসসমূহে বঙ্কিমের জীবন-চিত্রণের মধ্যে সমাজনীতির প্রাধান্য আধুনিক সমালোচক-গোষ্ঠীর বিরূপ মন্তব্যের হেতু হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে যে প্রত্যেক দেশের সমাজে কোন না কোন আদর্শের প্রভাব দেখা যায়—আদর্শহীন বাস্তব-বর্ণনা ও প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ প্রসার সেই বিশেষ সমাজের জীবনধারার সত্য পরিচয় নাও হইতে পারে। বঙ্কিমের যুগে বাঙালী-হিন্দুসমাজ নীতিশাসিত আদর্শানুসরণের মধ্যেই নিজ প্রকৃত তাৎপর্য অনুভব করিত। বাঙালীর সমস্ত জীবনযাত্রা সমাজ-কল্যাণের আদর্শকেই স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন সহজ শিষ্টাচার, ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্যাদাবোধ ও মনুষ্যত্বের সমর্থন পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বরূপলক্ষণ, তেমনি নীতি ও ধর্মের অনুশাসনে প্রবৃত্তিদমন, দশের কল্যাণার্থ একের আত্মবিসর্জন বাঙালী সমাজের স্বাভাবিক জীবনছন্দরূপে, জীবনের স্বতঃসিদ্ধ লক্ষ্যরূপে স্বীকৃত ছিল। সুতরাং নীতির খাতিরে বঙ্কিম সহজ জীবনধর্মকে অস্বীকার করিয়াছেন এই সমালোচনা অন্ততঃ বঙ্কিমযুগের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অপ্রযোজ্য। হিন্দুসমাজ পার্বত্য শহরের মত আদর্শের উচ্চশৃঙ্গে নির্মিত ছিল—উহার স্বাভাবিক চলা-ফেরা সমতলভূমির মধ্যে নহে, দুরারোহ চড়াই-এর কৃচ্ছ্রসাধনের পথই অনুসরণ করিত। বাংলা দেশে নর-নারীর স্বাধীন প্রেম, প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা সমাজ-চিত্তের বিশেষ গঠনের জন্যই, মানস সংস্কৃতির বিপরীত প্রভাবের ফলেই এমন একটা সঙ্কোচ অনুভব করিবে, যাহাতে ইহার শুধু বাহিরের সাফল্য নহে, অন্তরের আত্মপ্রসাদও ব্যাহত হইবে। কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী বালবিধবা; তাহাদের প্রেম-উপভোগ-স্পৃহা স্বাভাবিক ও সহানুভূতির যোগ্য। কিন্তু এই স্পৃহাকে বিশেষ পুরুষের সাহচর্যে চরিতার্থ করিতে গেলে প্রবলতর অধিকার ও সমাজকল্যাণ বিপর্যস্ত হয়। সুতরাং

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণ-কান্তের উইল

বাংলার সমাজ-মানসের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় এই ইচ্ছা কল্যাণ হইতে অকল্যাণই সৃষ্টি করিয়াছে বেশী। ইহাকে জয়ী করিলে দেশের বাস্তব প্রতিবেশে জীবনের যে রূপটি ইহার পরিণত ফল তাহার বিরোধিতা করা হয়। কুন্দ ও সূর্যমুখী উভয়ে সমান নির্দোষ ও পাঠকের সমান সহানুভূতির পাত্র; সুতরাং সূর্যমুখীর ন্যায্য ও ধর্ম-ও-সমাজ-সমর্থিত অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া সেখানে কুন্দকে স্থাপিত করিলে যে অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা আর্ট ও নীতি উভয়ের বিচারেই অন্যায্য। কুন্দের প্রতি আকস্মিক রূপমোহ যদি চিরকালের জন্য সূর্যমুখীর দীর্ঘ-পরীক্ষিত গুণানুরাগের উপর জয়ী হইত, তবে ইহার মধ্যে কি মহৎ জীবননীতি ফুটিয়া উঠিত? কুন্দের মনে যে অনধিকারের অপরাধবোধ ক্রিয়াশীল ছিল, তাহাই অবহেলার অজুহাতে তাহাকে আত্মহত্যায় প্রণোদিত করিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম-সংস্কার তাহার চেতনার গভীরে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে নিজ হাতে তাহার জলো কালিতে লেখা অধিকার-লিপি মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য করিয়াছে। কুন্দের মহৎ প্রকৃতি, সে যে স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা, সূর্যমুখীকেন্দ্রিক নগেন্দ্রের সংসারে তাহার যে কোন স্থির আসন নাই এই ধারণায়, আত্মাবমাননা হইতে আত্মবিনাশকেই প্রশস্ততর পন্থা বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে।

রোহিণী-চরিত্র

রোহিণী সম্বন্ধে এই মন্তব্য আরও প্রযোজ্য। গোবিন্দলাল ও রোহিণী রূপতৃষ্ণা-প্রণোদিত হইয়া একজন ক্ষুব্ধ অভিমানে, আর একজন জীবনপিপাসার অনিবার্য প্রয়োজনে পরস্পরকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সম্পর্কের মধ্যে গুণাকর্ষণের কোন স্পর্শই ছিল না। রোহিণীর সহিত তুলনায় ভ্রমরের প্রেম অনেক বেশী উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল। সুতরাং ভ্রমরের প্রেমের অপেক্ষা ইহাকে বেশী স্থায়িত্ব দিলে তাহা মানবপ্রকৃতি ও বিশ্ববিধান উভয়েরই বিরোধী হইবে। ভ্রমর অতিরিক্ত আদর্শবাদ ও অভিমান-প্রবণতার জন্য মরিল। রোহিণী মরিল তাহার মত ইতর ও লালসাময় প্রেম বাঁচিতে পারে না বলিয়া। রোহিণীর অন্য কোনও রূপ সুখী পরিণাম, উপন্যাসের চরিত্র-কল্পনা ও বিষয়-বিন্যাসের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, সম্ভব মনে হয় না। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া রোহিণীর প্রেমে তৃপ্তি লাভ করিলেন ইহা উভয়েরই চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্যহীন। গোঁয়ার হরলালই তাহার যোগ্য জীবন-সঙ্গী হইত, কিন্তু তাহার বংশমর্যাদা তাহার প্রেমানুভূতি অপেক্ষা বড় হইয়া এই সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করিয়াছে। যাঁহারা রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু ঘটাইবার জন্য বঙ্কিমকে হৃদয়হীনতার জন্য অপরাধী করিয়াছেন তাঁহারা রোহিণী-সমস্যার কোন

উৎকৃষ্টতর সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন নাই। রোহিণী বাঁচিয়া থাকিলে হীরা দাসীর পর্যায়ে নামিয়া যাইত; তাহার মৃত্যু অন্ততঃ তাহাকে এই অবনতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। রোহিণীর অপমৃত্যু তাহার কলঙ্কিত ভোগসর্বস্ব প্রেমের স্বাভাবকি ও অপরিহার্য মৃত্যু—ইহাতে নীতির কোন অনুচিত প্রভাব নাই, আছে সূক্ষ্মতর বিশ্ববিধানের সহিত সহজ সঙ্গতি।

রজনী

'রজনী'তে অনেক আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার আছে; মনে হয় যে বঙ্কিমের কল্পনা এখানে বাস্তব বন্ধন সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া বাস্তবের মুখোস-পরা এক মায়ারাজ্যে স্বচ্ছন্দ বিহার করিয়াছে। অন্ধের রূপোন্মাদ ও প্রেমোন্মেষের মধ্যে যে একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল আছে বঙ্কিম তাহার কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন, তবে ইহার মধ্যে নিষ্ঠার গভীরতা নাই, আছে অভিনবত্বের বিস্ময়বোধ। শচীন্দ্র-রজনীর প্রেমের মধ্যে সন্ন্যাসীর তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রক্ষেপই প্রমাণ করে যে ইহার মানবিক দিকের ছিদ্রকে অলৌকিকত্বের রাংঝাল দিয়া আবৃত করিতে হইয়াছে। লবঙ্গলতার নিরুদ্ধ প্রেমের কাহিনীও খানিকটা অতি-নাটকীয় মনে হয়; সে অমরনাথকে সত্য ভালবাসিলে তাহার ঘৃণার আগ্নেয় স্বাক্ষর প্রেমিকের পৃষ্ঠদেশে মুদ্রিত হইয়া থাকিত না। ইহার মধ্যে এক অমরনাথের উক্তি ও আচরণের মধ্যেই সত্যানুভূতির গভীর সুর ও জীবন-সমীক্ষার দার্শনিক সার্বভৌমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমের নিজের জীবন-জিজ্ঞাসার আর্তি, জীবনরহস্যের সন্ধান ইহার মধ্যে পরিস্ফুট। অমরনাথের এত রূপ-গুণ সত্ত্বেও, তাহার তীক্ষ্ণ মনীষা ও পরোপকার-প্রবণতা সত্ত্বেও কেন যে তাহার জীবনে দারুণ শূন্যতাবোধ, চরম ব্যর্থতা আসিয়াছে তাহারই মর্মভেদী, সমাধানহীন প্রশ্ন সমস্ত উপন্যাসে ধ্বনিত হইয়াছে। উপন্যাসটি প্রথম শ্রেণীর হউক বা না হউক, ঔপন্যাসিকের আত্মপরিচয় অমরনাথের মধ্যে যে ধ্বনিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহার আঙ্গিকের অভিনবত্বও বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন সম্বন্ধে নূতন পরীক্ষা-প্রবণতার সার্থক নিদর্শন।

গার্হস্থ্য উপন্যাসে জীবনবোধ

বঙ্কিমের গার্হস্থ্য জীবনের উপন্যাসগুলির উৎকর্ষের প্রধান নিদর্শন উহাদের মধ্যে জীবনসংঘাত, মহৎ প্রকৃতির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মহিমান্বিত প্রকাশে। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের প্রলোভনের সহিত নিষ্ফল সংগ্রাম, কুন্দ-সূর্যমুখী-ভ্রমরের দারুণ মনঃপীড়া, স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তির ভয়াবহ পরিণতি, মানুষের নিজ কৃতকর্মের ফলের সঙ্গে অদৃষ্টের অভাবনীয় সংযোগ—এই সমস্ত মিলিয়া জীবনের যে একটি গভীর-তাৎপর্যপূর্ণ,

রহস্যময় রূপ আমাদের নিকট ফুটিয়া উঠিয়াছে, জীবন-সমুদ্রে সুখ-দুঃখ-তরঙ্গোচ্ছ্বাসের যে বিপুল আলোড়ন আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ। ইহাদের নীতিবাদ বাহির হইতে কৃত্রিমভাবে আরোপিত অলঙ্কার নহে, ধর্মসংস্কার-লালিত হিন্দুজীবনের সহজ প্রাণলীলার অভিব্যক্তি, অস্থিমজ্জাগত প্রেরণারই ঐতিহ্যানুসারী স্ফুরণ। পরবর্তী-যুগে আমাদের নিজের জীবনবোধের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়াছে বলিয়াই আমরা বঙ্কিমের জীবনদর্শনের অকৃত্রিমতায় সংশয় পোষণ করি।

বঙ্কিমের **চতুর্থ শ্রেণীর** উপন্যাস-ত্রয়ীতে—'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৩) ও 'সীতারাম'-এ (১৮৮৬)—তত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনবোধকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ ধারণাই জন্মে। মনে হয় যে বঙ্কিমের

আনন্দমঠ

আদর্শকল্পনা ঠিক উপন্যাসধর্মী না হইয়া উপন্যাসের বহিরবয়বের আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশের অবসর খুঁজিয়াছে। জীবন-প্রত্যয় অপেক্ষা তত্ত্বপরীক্ষাই যেন বঙ্কিমের প্রধান অভিপ্রায়। 'আনন্দমঠ'-এ ইতিহাসের নিরূপিত তথ্যসীমায় ধ্যানকল্পনা কতদূর প্রসার লাভ করিতে পারে, কর্মসন্ন্যাসের গেরুয়া আংরাখায় আধুনিক স্বদেশপ্রেমের ইউনিফর্ম কতটা তৈয়ারি হইতে পারে, অতীতের ছায়াপটে ভবিষ্যতের অস্ফুট সম্ভাবনা কতখানি সুস্পষ্টভাবে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, বঙ্কিম উপন্যাস-রীতির মাধ্যমে তাহারই পরীক্ষা করিয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ঐতিহাসিক ঘটনা সমাজ ও রাষ্ট্রে যে ভয়াবহ শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল, বঙ্কিম তাঁহার আবেগময় কল্পনার দ্বারা সেই ফাঁক পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। এই ঘটনা ও সমাজশৃঙ্খলাচ্যুত, বিপর্যস্ত জনসংঘের মনে বাস্তব প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে নূতন জীবনযাত্রার অস্পষ্ট স্বপ্নচ্ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহাই উপন্যাসের একমাত্র বস্তুগত অবলম্বন। তাহা ছাড়া, আর সমস্তই উদাত্ত-কল্পনাদীপ্ত ভাব-রূপক। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ভক্তিসাধনের আকুল প্রশ্নের যে দৈববাণীরূপ উত্তর মিলিয়াছে তাহাই উপন্যাসের মর্মকথা। উপন্যাসের সমস্ত পাত্র-পাত্রীই এই সাধনার অঙ্গ ও উপকরণমাত্র, তাহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই। সন্তানধর্মের দীক্ষা তাহাদের পূর্বনামের ন্যায় তাহাদের ব্যক্তিসত্তাকেও গ্রাস করিয়াছে। ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি—ইহারা বিভিন্ন অবস্থা-সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু আসলে ইহারা আদর্শ-সূর্য-প্রক্ষিপ্ত ছায়ারই সমস্যাভেদে আকার-ভেদ মাত্র। এক মহেন্দ্র ও কল্যাণী সম্পূর্ণভাবে সন্তানধর্মের আওতায় আসে

নাই বলিয়া তাহাদের ব্যক্তিত্বের কিছুটা অবশিষ্ট আছে। গ্রন্থশেষে মহাপুরুষ আসিয়া সত্যানন্দকে লইয়া গিয়াছেন; ইংরেজের নিকট বহির্বিজ্ঞান-শিক্ষার সুযোগ লইবার জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রাম আপাতত মুলতুবী রহিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে উপন্যাসের সমগ্র ঘটনা অন্তর-লোকের প্রতিবিম্ব মাত্র—উপন্যাস রীতির ছদ্মবেশে কল্পিত ভাবসাধনারই বহির্বিকাশ।

দেবী চৌধুরানী

'দেবী চৌধুরানী'-তে (১৮৮৩) সমাজ, পরিবার ও তৎকালীন রাষ্ট্র-বিশৃঙ্খলার যে চিত্র আছে তাহা সম্পূর্ণ বাস্তবানুযায়ী। হরবল্লভ, ব্রজেশ্বর, ব্রহ্মঠাকুরাণী, সাগর বৌ, নয়ান বৌ সবাই আমাদের চেনাশোনা প্রতিবেশী। এই বাস্তব খোলসের মধ্যে বঙ্কিম অনুশীলন-তত্ত্বের ও নিষ্কাম ধর্মের শাঁস ঢোকাইয়াছেন। প্রফুল্ল-কে তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার-রূপে কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু সে দেবীত্বে উন্নীত হইয়াও শাশ্বত নারীত্ব হারায় নাই। প্রফুল্লকে কোন অবস্থাতেই অবাস্তব বা বাংলার সমাজ-জীবনের সহিত বেমানান মনে হয় না। দেবী চৌধুরানী-রূপে সে সাগরের বাপের বাড়ি গিয়াছে ও ব্রজেশ্বরকে ধরিবার জন্য কৌতুকরসপূর্ণ কৌশল-জাল পাতিয়াছে। শাস্ত্রবিদ ও নিষ্কামধর্মব্রতী প্রফুল্লকেও সংসারকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে চমৎকারভাবে মানাইয়াছে; এত পালিশ সত্ত্বেও বাঙালী নারীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কার তাহার মধ্যে একেবারেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া বাঙালী পরিবারের আদর্শগৃহিণীর মধ্যে গীতাতত্ত্বের যে ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রকাশ পাইয়াছে, প্রফুল্ল সেই সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ভবানী পাঠককে কোন মহাপুরুষ অজ্ঞাত রহস্যের রাজ্যে লইয়া যায় নাই; প্রফুল্ল শান্তির ন্যায় হিমালয়ে তপস্যা করিতে যায় নাই। কাজেই একজনকে ইংরেজ গবর্নমেণ্ট ফাঁসি দিয়াছে, অপরজন সংসারজীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বঙ্কিমের আকাশচারী কল্পনা এই উপন্যাসে মাধ্যাকর্ষণের টান স্বীকার করিয়া মৃত্তিকায় নামিয়া আসিয়াছে। দিবা-নিশা প্রভৃতি দুই-একটি রূপক-চরিত্রকে বাদ দিলে এই উপন্যাসে তত্ত্বের উপস্থিতি ঔপন্যাসিক রসের বিশেষ হানি করে নাই।

সীতারাম

বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-ও অতিরিক্ত তত্ত্বভারাক্রান্ত বলিয়া মনে করা যায় না। এখানে ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, পরিবার-জীবনের সমস্যা-সঙ্কট ও ব্যক্তি-চরিত্রের বেদনাময় বিপর্যয় একটি কার্যকারণ-সূত্রগ্রথিত, দৃঢ়বদ্ধ বাস্তব পরিবেশ রচনা করিয়াছে। এই সুরক্ষিত গৃহদুর্গে বিকৃত ধর্মবোধ, সন্ন্যাসের মিথ্যা আস্ফালন

বিস্ফোরক বারুদের মত ভয়াবহ ভাঙন ধরাইয়াছে। এবং যেহেতু সীতারাম শুধু গৃহস্বামী নহেন, রাজাও বটেন, সেইজন্য গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানও ভূমিসাৎ হইয়াছে। শ্রী অদৃষ্টবিড়ম্বিতা, শত্রুমর্দিনী ও অপ্রাপণীয়া—এই ত্রিবিধ কারণের সমাবেশে সাধারণ হইয়াও রোমান্সের অসাধারণত্ব-মণ্ডিতা; কিন্তু নন্দা ও রমা একেবারে খাঁটি বাঙালী স্ত্রী। সীতারামের অধঃপতনের মূলে ধর্মতত্ত্বের পরোক্ষ প্রভাব আছে; কিন্তু যে অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা তাহার সংযমকে উৎখাত করিয়াছে তাহা বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার; রমার প্রতি গঙ্গারামের মোহ ও রমার স্বামিপুত্রের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রসূত মোহান্ধতার কাহিনী আধুনিক উপন্যাসের মনোবিকার-বিশ্লেষণের কঠোরতম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইবে। পার্থক্য এই যে রমা কখনই সচেতনভাবে অবৈধ প্রেমের প্রশ্রয় দেয় নাই ও নিজের ভুল বুঝিয়া সে চরম প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। রমার প্রকাশ্য বিচারের দৃশ্য বঙ্কিমের বর্ণনাশক্তির উৎকর্ষের জ্বলন্ত নিদর্শন। সর্বনাশের শেষ মুহূর্তে সীতারামের আকস্মিক জাগরণ, তাহার সুপ্ত মহত্ত্বের অতর্কিত পুনরুদ্বোধন—সাধারণ মনস্তত্ত্ব ও হিন্দুর বিশেষ মানস সংস্কার উভয়ের দ্বারাই সমর্থিত। ধর্মতত্ত্ব-প্রতিপাদন লেখকের উদ্দেশ্য ইহা স্বীকার করিলেও যে উপায়ে এই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা উপন্যাস-রীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত।

(৫) বঙ্কিম **ছোটগল্পের** আঙ্গিক সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার 'ইন্দিরা', 'রাধারানী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' সংক্ষিপ্ত উপন্যাস, ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত নহে। উপন্যাসের আঙ্গিক স্থিরীকৃত না হইলে ছোট-গল্পের রস ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে। উপন্যাসের প্রত্যাশিত রসপরিণতি যে ক্ষুদ্রতর পরিসরে ও সুমিত উপকরণের সাঙ্কেতিক প্রয়োগে লাভ করা যায় এই অনুভূতি ও শিল্পবোধ জাগিতে সময় লাগে। যেমন মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য হইতে গীতি-কবিতা, তেমনি বড় উপন্যাস হইতে ক্ষুদ্রতর কাহিনীর ভিতর দিয়া ছোট গল্পের ক্রমাবির্ভাব। কাজেই উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ছোটগল্পের সূক্ষ্মতর কারুশিল্প ও মানবিক আবেদনের একটা আংশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার তাৎপর্য অনুভব করেন নাই। তখন দীর্ঘরচনার, মানবজীবনের বিস্তৃত পরিচয়ের যুগ; ঘরের একটা জানালা খুলিয়াই যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাহার মধ্যেই যে একটি অখণ্ড রসাবেদন নিহিত আছে তাহা সে যুগে অনুভূত হয় নাই; সেইজন্য

বঙ্কিমের অন্যান্য গল্প

যে সমস্ত খণ্ডকাহিনীতে ছোটগল্পের সম্ভাবনা ছিল তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বিস্তারিত ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও আকারে ছোট কাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু উহারা ছোটগল্প হইয়া উঠে নাই। ছোটগল্পের সার্থক আবির্ভাবের জন্য আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

৩

রমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণাতেই উপন্যাস-রচনায় হাত দিয়াছিলেন। তিনিই বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক উপন্যাস-ধারার সার্থক অনুসরণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত দীপ্ত কল্পনা তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা তাঁহার অপেক্ষাকৃত বেশী।

তাঁহার 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) ও মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) তাঁহার প্রথম স্তরের ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকার মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনচিত্রণের প্রথা অনুসরণ করিয়া তাঁহার উপর বঙ্কিম-প্রভাবের নিদর্শন দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার উপন্যাসে এই উভয়বিধ উপাদানের সংমিশ্রণ সর্বত্র সমপরিমাণেও হয় নাই, সুষ্ঠুও হয় নাই। 'বঙ্গবিজেতা' বিশেষতঃ কাঁচা হাতের রচনা। এখানে আকবর-টোডরমলের ইতিহাসের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনের সংযোগ খুব নিবিড় বা ঘনিষ্ঠ হয় নাই। এখানে ইতিহাসেরই প্রাধান্য এবং যাহা কিছু ঘটিয়াছে সবই ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে। ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসের গ্রাস হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য উদ্ধার করিতে পারে নাই। চরিত্রগুলি সবই অস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যহীন। বিমলা-চরিত্র অনেকটা আয়েষা-চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত। উপন্যাসটি কোথায়ও জীবন-অভিজ্ঞতা-বর্জিত প্রথানুসরণের উর্ধ্বে উঠে নাই।

বঙ্গবিজেতা

'মাধবীকঙ্কণ' 'বঙ্গবিজেতা'র তুলনায় অনেক উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। এখানে নরেন্দ্রনাথ নামে এক জমিদারপুত্র কর্মচারী-চক্রান্তে জমিদারি হারাইয়া ও কর্মচারী-কন্যা হেমলতার প্রণয়ে ব্যর্থ হইয়া দেশ ছাড়িয়া রাজমহলে শাহ্ সুজার দরবারে উপস্থিত হইয়াছে ও সাজাহানের রাজত্বশেষে তাহার পুত্রদের মধ্যে যে তুমুল ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দেয় তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইতিহাস-চক্রে ঘূর্ণিত

মাধবীকঙ্কণ

হইবার পর হইতেই তাহার ব্যক্তিগত জীবন প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। তথাপি তাহার নিষ্ফল বাল্যপ্রণয়ের করুণ ও ক্ষুব্ধ স্মৃতি তাহার অন্তরে অনির্বাণ চিতানলের মত প্রধূমিত হইয়াছে। আর যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফাঁকে ফাঁকে এক রহস্যময়, দুর্দম প্রেমাকাঙ্ক্ষা তাহার নিস্পৃহত্বকে বিড়ম্বিত করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। এই অবাঞ্ছিত প্রেমের অত্যাচার তাহার জীবনে অনেক দুঃখ আনিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অভাগিনী জেলেখা ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যায় সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়াছে। রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত নরেনকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই। কেননা সেখানে সে বেতন-ভোগী সৈনিকরূপে সাধারণ দুর্ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু প্রেমই তাহার জীবনে সত্যিকার জটিলতা আনিয়াছে। যে প্রেমকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও যে প্রেমের নিকট সে নিজে প্রতিহত হইয়াছে উভয়ের মিলিত প্রভাব তাহাকে ক্ষুব্ধ ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে—একটা তিক্ত নৈরাশ্যবোধে সে জীবনের সুস্থ, সহজ বিকাশ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। নরেন্দ্র-চরিত্রের এই বিকৃতি, তাহার রোষপ্রবণতা ও অস্থির হঠকারিতা ও ইহার সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে মিশ্রিত তাহার গভীর হৃদয়াবেগ ও প্রথম প্রণয়ের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা তাহার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। চরিত্রসৃষ্টিতে ইহাই রমেশচন্দ্রের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। শেষ পর্যন্ত বিবাহিতা হেমলতার সহিত তাহার দেখা হইয়াছে ও বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিনিদর্শনস্বরূপ যে মাধবীকঙ্কণ সে হেমলতার হাতে পরাইয়া আসিয়াছিল হেমলতা তাহা ফিরাইয়া দিয়া তাহাদের সমস্ত সম্পর্কের অবসান ঘোষণা করিয়াছে। এই বিদায়-দৃশ্যটি আবেগের গভীর, অথচ সংহত প্রকাশ ও বিষাদময় কারুণ্যরসের উদ্দীপনে উপন্যাস-জগতে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ইহার পর, (মহারাষ্ট্র) 'জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮) ও (রাজপুত) 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯) রমেশচন্দ্রের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুইটি উজ্জ্বল নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে 'রাজসিংহ'-কে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়াছিলেন ইহারাই সেই অর্থে একই দাবি করিতে পারে। 'জীবন-প্রভাত'-এ শিবাজীর অধিনায়কত্বে মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুত্থান, মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বাধীনতা-সংগ্রাম বর্ণনীয় বিষয়। এই উপন্যাসে রাষ্ট্রযুদ্ধই সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে—ইহার মধ্যে ব্যক্তিসংঘর্ষের একমাত্র নিদর্শন রঘুনাথজী হাবিলদারের সঙ্গে তাহার ভগ্নীপতি

মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত

চন্দ্ররাও-এর ঈর্ষামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই পারিবারিক কলহ ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের গতির মধ্যে এক-আধটু অসম ছন্দের প্রবর্তন করিলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। রঘুনাথ ও সরযূর প্রেমকাহিনীও একেবারে বিশেষত্বহীন। আমরা সমগ্র উপন্যাসে শিবাজীর মহনীয় চরিত্র, তাঁহার সংগ্রামের রোমাঞ্চকর বিবরণ ও নবোদ্ভূত সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় জাতির মধ্যে বিপুল প্রাণস্পন্দন ও কর্ম-উদ্দীপনার কাহিনীতেই মুগ্ধ হই, কোন সূক্ষ্মতর আবেদনের প্রত্যাশা করি না।

রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা

'জীবন-সন্ধ্যা'-য় ইতিহাসবিশ্রুত, কীর্তিভাস্বর রাজপুতজাতির অস্তোন্মুখ গৌরবের শেষরশ্মির করুণ, বিষাদময় দীপ্তির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়ের রাজপুতের ন্যায় কোনো ঐতিহ্য-মহিমা ছিল না। রাজপুতদের রীতি-নীতি, তাহাদের প্রভুভক্তির আদর্শ ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কলহ-বিরোধ সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাসটি ঐতিহাসিক উপকরণে বিশেষ সমৃদ্ধ ও শুধু রাষ্ট্রের কথায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র জাতির মর্মকথা ও বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। দুর্জয়সিংহ-তেজসিংহের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দেশশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম-কালে এই জ্ঞাতিবৈরের সাময়িক বিরতি, বৈর-নির্যাতন-বিষয়ে উন্নততম নৈতিক আদর্শের অনুসরণ—এই সমস্তই প্রতাপসিংহ-মানসিংহের রাজনৈতিক সংঘর্ষ অপেক্ষা উপন্যাসে প্রাধান্য পাইয়াছে ও পাঠকমনে অধিকতর আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ইহা শুধু ইতিহাস নহে, জাতির নিগূঢ় জীবনসত্যের আধার। পার্বত্য ভীল জাতির আচার ও জীবনবোধ, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহাদের মর্যাদা ও অধিকারের হীনতা, তাহাদের কতকগুলি আদিম-গোষ্ঠী-সুলভ বদ্ধমূল সংস্কারের সরস ও যথার্থ বর্ণনা উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। তেজসিংহ ও পুষ্পের প্রেমে ভীলবালিকার কিছুটা অজ্ঞতা ও কিছুটা দুষ্টামির ফলে যে ভুল বোঝার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও উপন্যাসের সরল গতিকে একটু বাঁকা পথে চালাইয়া উপভোগ্য জটিলতার হেতু হইয়াছে। সব দিক দিয়া 'জীবন-সন্ধ্যা' 'জীবন-প্রভাত' অপেক্ষা গভীর রসসৃষ্টিতে, করুণ পরিণতিতে ও তথ্য-বহুল বাস্তব-চিত্রণে শ্রেষ্ঠতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

ইহার পর রমেশচন্দ্র সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ, বীরত্বমুখরিত ইতিহাস ছাড়িয়া বাংলার শান্ত, ঘটনাবিরল সমাজ-জীবনের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেন। 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৩)—এই দুইখানি তাঁহার সামাজিক উপন্যাস।

'সংসার'-এ বর্ধমান জেলার তালপুকুর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীর ছোট সুখ-দুঃখে ভরা জীবনযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রামের সমাজপতি ধনী জমিদার—তারিণীবাবু, ঈষৎ আত্মগর্বিত, প্রভুত্ব-প্রিয়, কূটকৌশলী ব্যক্তি, তবে মানুষ হিসাবে তিনি নিতান্ত মন্দ নহেন। গ্রাম ও পরিবারের কয়েকটি মেয়ের বিবাহিত জীবনের সুখের তারতম্য উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গরীবের মেয়ে বিন্দু, ধনীর মেয়ে উমা, ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কালীতারা এই তিন বাল্যসখীর সংসার-জীবনে সৌভাগ্যের তুলনা করা হইয়াছে। এই তুলনায় রমেশচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ধন বা কুলমর্যাদা সুখের হেতু হয় না, দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক প্রীতি ও সহনশীলতাই শান্তির মূল। তাই বিন্দুর জীবনই সর্বাপেক্ষা সুখী হইয়াছে। বিন্দুদের পরিবারের কলিকাতা যাওয়া উপলক্ষ্যে গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের সুবিধা-অসুবিধার কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

সামাজিক উপন্যাস

বিন্দুর বিধবা ভগ্নী সুধার সহিত এক উচ্চশিক্ষিত যুবক শরৎচন্দ্রের প্রেমের উদ্ভব-উপলক্ষ্যেই শহর ও পল্লীজীবনে একটা তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। যদিও তিন বৎসর পূর্বে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি ইহার প্রতি প্রবল বিরোধিতা সমাজ-মনে তখনও অপ্রশমিত। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ'-এ বিধবা-বিবাহ জমিদার নগেন্দ্রনাথের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে গ্রাম্য সমাজে বিশেষ আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব শহরের রসনাকে বিদ্বেষ-বিষে জর্জর ও কুৎসা-রটনায় মুখর করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত বিবাহ হইয়াছে ও গ্রাম্য সমাজও শরৎচন্দ্রের হাকিমি পদ-প্রাপ্তির পর ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য তালপুকুরের ঠাকুরদাদা-ঠানদিদি এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া দাম্পত্য সম্পর্কের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যঙ্গমধুর জীবনদর্শন অভিব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি সমাজ-বিরোধী দম্পতিকেই আশ্রয় করে, কেননা এখানে বালবিধবার প্রেমাকাঙ্ক্ষা কোন ন্যায্যতর অধিকারকে স্থানচ্যুত করে নাই। উপন্যাসটি রমেশচন্দ্রের সরস বর্ণনা ও সরল পল্লীজীবনের সহিত অকৃত্রিম সহানুভূতির নিদর্শনরূপে আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

'সংসার'-এ বিধবা-বিবাহ-সমস্যা

'সংসার'-এর সাত বৎসর পরে লেখা 'সমাজ' (১৮৯৩) কিন্তু লেখককে উগ্র

সমাজ-সংস্কারকরূপে পরিচিত করিয়াছে। উপন্যাসে বিধবা-বিবাহকে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থনের যোগ্য করিতে হইলে শুধু উৎকট সংস্কার-মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইলে চলিবে না—পাত্র-পাত্রীকে সমস্যা-উদ্ভবের পূর্বেই জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করিতে হইবে। আমরা শরৎ-সুধার বিবাহ অনুমোদন করি শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের জন্য নহে, উহারা উহাদের সরল ও অকপট আচরণের দ্বারা আমাদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু সুশীলা ও দেবীপ্রসাদ কেহই জীবন্ত চরিত্ররূপে আমাদের ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠে নাই—সুতরাং তাহাদের বিবাহে আমরা দর্শকমাত্র, তাহাদের পক্ষাবলম্বী উৎসাহী সমর্থক নহি। এ বিবাহ আবার শুধু বিধবা-বিবাহ নয়, অসবর্ণ বিবাহও বটে। ইহা ঘটিয়াছে পাত্র-পাত্রীর পরস্পর-অনুকূল মনোভাবের মধ্য দিয়া নহে, রমাপ্রসাদ সরস্বতীর হয়ত যুক্তিযুক্ত, কিন্তু নিশ্চিত স্পর্ধিত, সমাজ-বিদ্রোহের মাধ্যমে। ইহার সহিত বৈষয়িক ষড়যন্ত্র, দীর্ঘকাল মৃত বলিয়া গৃহীত জমিদারবংশের এক সন্তানের হঠাৎ পুনরাবির্ভাব ও তাহার বৈধব্যব্রতধারিণী পত্নীর সহিত পুনর্মিলন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমা মিশিয়া গ্রাম্য সরলতার আবহাওয়া একেবারে নষ্ট হইয়াছে ও ঘটনা-বিন্যাস বিশেষ ঘোরালো রূপ ধারণ করিয়াছে। মোট কথা তাঁহার এই শেষ উপন্যাসে রমেশচন্দ্র গ্রাম্যজীবনের দরদী চিত্রকরের পরিবর্তে সর্বপ্রকার সমাজ-প্রথার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত বিদ্রোহিরূপেই হাজির হইয়াছেন। তাঁহার শিল্পোৎকর্ষের যাহা প্রধান অবলম্বন তাহাই এখানে অনুপস্থিত। রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাসগুলি আমাদের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সত্ত্বেও যে এখনও জনপ্রিয়তা হারায় নাই, তাহাই ইহাদের সাহিত্যিক স্থায়িত্বের নিদর্শন।

সমাজ

৪

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

প্রভাতকুমার যদিও অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তথাপি ছোটগল্প-রচয়িতারূপেই তাঁহার প্রধান সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৭) ও 'সিন্দুর-কৌটা' (১৯১৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে কোন জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব বা হৃদয়সমস্যা, মানবজীবনের কোন গভীর অনুভূতি নাই। লঘু, হাস্যতরল ভাব-কল্পনা, জীবনের সরল, স্বচ্ছন্দ

প্রভাতকুমারের উপন্যাস

বিকাশ, শেষ পর্যন্ত অনুকূল দৈবের দাক্ষিণ্যে সমস্ত স্বল্পস্থায়ী দুর্ভাগ্যের মধুর পরিণতি, ঘটনার আবর্তহীন একটানা প্রবাহ—এইগুলিই তাঁহার উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ। কোথাও কোথাও তাঁহার উপন্যাসে ভ্রমণকাহিনীর মত নূতন দেশ দেখার কৌতূহল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অচেনা লোকের সহিত ক্ষণিক পরিচয়ের রুচিকর স্বাদ অনুভব করা যায়। তাঁহার চরিত্রসমূহ বাংলার সাধারণ নরনারী—ইহারা ঘটনাস্রোতের সহিত ভাসিয়া চলে, ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা বা মনস্তত্ত্বের দুর্বোধ্যতা নাই। এই উপন্যাসগুলি যেন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের আধুনিক জীবনোপযোগী পরিবর্তিত সংস্করণ, বাঙালীর দৈবনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়হীন, নমনীয় মনোভাবের যথার্থ চিত্র।

নবীন সন্ন্যাসী

'নবীন সন্ন্যাসী'তে এক ধর্মভাবাপন্ন, উচ্চশিক্ষিত যুবক হঠাৎ সংসার-বিরাগী হইয়া সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে, কিন্তু দুই চারিদিন এই যাযাবরবৃত্তির অভিজ্ঞতার পর অনাহারের ক্লেশে ও পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া এক ভদ্র গৃহস্থের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় ও শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিদুষী কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফেরে। লেখক এই উপন্যাসে তাঁহার নায়কের কৃচ্ছ্রসাধন-সংকল্পের উপর স্নিগ্ধ বিদ্রূপের কটাক্ষ হানিয়া কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সিঁদুর-কৌটা

'সিঁদুর-কৌটা'য় এক বাঙালী খ্রীষ্টান যুবতী—সুশী—পল সাহেব নামে এক ইতর, অর্থলোভী, আত্মসম্মানহীন মাদ্রাজী খ্রীষ্টানের সঙ্গে বিবাহিত হয়। কিন্তু পল তাহার বিবাহিতা পত্নীর ভরণপোষণে অক্ষম হইয়া তাহাকে শহরের এক হোটেলে ফেলিয়া উধাও হয়। এই সময় বিজয় নামে এক বাঙালী উকিল—যে ছুটিতে বেড়াইতে গিয়া সেই হোটেলেই অবস্থান করিতেছিল—সুশীর অসহায় অবস্থার প্রতি সহানুভূতির বশে তাহার পলাতক স্বামীর খোঁজ করিতে থাকে ও পলের খোঁজ না পাইয়া তাহার দেখাশোনা করিতে বাধ্য হয়। এই সহানুভূতি অল্পদিনের মধ্যেই সুশীর অশ্রুজলে আর্দ্র ও তাহার সসংকোচ প্রেমনিবেদন ও আত্মসমর্পণে বিগলিত হইয়া প্রেমে রূপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে পল তাহার গা-ঢাকা অবস্থা হইতে বাহির হইয়া আত্মপ্রকাশ করে ও অম্লানবদনে কিছু টাকার বিনিময়ে স্ত্রীর উপর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করে। একটু অনুসন্ধানেই বাহির হইয়া পড়ে যে সে অন্য স্ত্রী বর্তমান থাকিতে সুশীকে প্রতারণা করিয়া বিবাহ করিয়াছে ও আইন-অনুসারে সে-বিবাহ অসিদ্ধ। এই আবিষ্কারের পর সুশীর

সহিত বিজয়ের হিন্দুমতে বিবাহের আর কোন বাধা রহিল না। বিজয়ের প্রথমা পত্নী বকুরাণী হইতে যে বাধা আসিতে পারিত তাহা বকুরাণীর ক্ষীণ ব্যক্তিত্ব, কোমল স্বভাব ও স্বামীর ইচ্ছানুবর্তিতার জন্য সহজেই অপসারিত হইল। শেষ পর্যন্ত সিঁদুরকৌটা-উপহারের সহিত সুখী হিন্দুস্ত্রীর সপত্নীর সহিত অংশীকৃত মর্যাদায় ও স্বামিস্বত্বে অধিষ্ঠিত হইল। লেখক তাঁহার মানস সন্ততিদের সুখী করিবেনই এইরূপ যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া কলম ধরিয়াছিলেন তাহা এইরূপে পূর্ণ হইল।

'রত্নদীপ' প্রভাতকুমারের একমাত্র উপন্যাস যেখানে জীবনের বেদনাময় সংঘাত ও ট্রাজেডির করুণ পরিণতি সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এখানেও একটি দৈবসংঘটনের আকস্মিক যোগাযোগ হইতে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। নদীয়ার জমিদারবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী ভবেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সমস্ত পারিবারিক সম্পর্ক ছেদ করিয়াছিল। পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সে যখন বাড়ি ফিরিতেছিল, তখন অকস্মাৎ রেলগাড়িতে এক ক্ষুদ্র স্টেশনে তাহার মৃত্যু ঘটিল। সেই স্টেশনে সহযোগী স্টেশনমাস্টার রাখাল ভট্টাচার্য—যাহার সহিত মৃত ভবেনের আশ্চর্য অবয়ব-সাদৃশ্য ছিল—সেই মৃতদেহ নামাইয়া লয় ও নির্জন স্টেশনঘরে তাহার ডায়েরি পড়িয়া তাহার জীবনকাহিনী অবগত হয়। ঐ সময় তাহার রেলের চাকরি যাইবার ফলে জাল ভবেন সাজিয়া তাহার জমিদারি হস্তগত করার মতলব তাহার মনে উদিত হয় ও সে ছদ্মবেশে ভবেনের গ্রামে গিয়া দেওয়ানজী, প্রধান প্রধান কর্মচারী ও পুরাতন চাকর-দাসী প্রভৃতিকে ও গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিকেও সে ভাল করিয়া চিনিয়া আসে। ইহার পর তাহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিয়া সে বাড়িতে পত্র দেয়। তাহার বিধবা মাতা ও পরিত্যক্তা স্ত্রী বৌরানী তাহার জন্য অধীর উৎকণ্ঠায় দিন গুনিতেছিল। রাখাল জাল ভবেন সাজিয়া আসিয়া সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল—দীর্ঘ অদর্শনের পর তাহার ছদ্মবেশ কেহ ধরিতে পারিল না। কিন্তু ব্রহ্মচারিণী-বেশধারিণী. কঠোর-ব্রত-সাধনে রতা বৌরানীকে দেখিয়া তাহার সঙ্কল্প বিচলিত হইল—সে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবার দুঃসাহসকে মনে স্থান দিতে পারিল না। সুতরাং সেও এক ব্রতের অছিলা করিয়া বৌরানীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিল ও তাহার করুণ মিনতি ও ক্ষুব্ধ অভিমান ও অনুযোগও তাহাকে স্বীয় প্রতিজ্ঞায় অটল রাখিল।

রত্নদীপ উপন্যাস

এদিকে কলিকাতার এক জুয়াচোর খগেন তাহার পূর্বপরিচিতা অভিনেত্রী

কনকলতার সহযোগিতায় বেওয়ারিশ জমিদারিটি হাত করিবার মতলব আঁটিতেছিল। স্থির হইয়াছিল যে কনকলতা সহচরীরূপে বৌরানীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে পুনর্বিবাহে রাজী করিবে ও খগেনই এই পুনর্বিবাহের পাত্ররূপে নির্বাচিত হইবে। কনকের আসার কয়েকদিন পরেই জাল ভবেনের আবির্ভাবে এই মতলব ফাঁসিয়া গেল। কিন্তু খগেন নবাগত জমিদারপুত্র যে জাল এই দৃঢ় ধারণা পোষণ করিয়া কিছু অনুসন্ধানের পর রাখালের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করিল। সে রাখালের সহিত দেখা করিয়া তাহার গোপন রহস্য ফাঁস করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট মোটা টাকা দাবি করিল, কিন্তু রাখাল এই ভীতিপ্রদর্শনে অবিচলিত থাকিয়া তাহার অসাধারণ চরিত্রগৌরব ও প্রলোভন-জয়ের পরিচয় দিল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাই প্রকাশিত হইল; কিন্তু রাখালের নির্লোভতা ও সৎসংকল্পের কথা জানিয়া জমিদারপরিবার তাহাকে সসম্মানে বিদায় দিল। এই শেষ আঘাতে বৌরানীর জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হইল—তাঁহাকে চিতাশয্যায় শায়িত করিবার সময় তাঁহার বিবাহের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বাসরে খেলার কড়িগুলি তাঁহার অঞ্চলে বাঁধা আছে দেখা গেল।

রত্নদীপের শ্রেষ্ঠত্ব

এই উপন্যাসে বৌরানীর চরিত্রে প্রভাতকুমার যে সরলতা, দৃঢ় নিষ্ঠা, অপূর্ব সংযম ও সহিষ্ণুতা, রাখালকে পতিজ্ঞানে তাহার প্রতি ভাবপ্রকাশের কুণ্ঠাজড়িত শালীনতা ও রাখাল যে তাহার স্বামী নয় এই আবিষ্কারে আপনাকে অশুচি বিবেচনায় একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার লজ্জা ও আত্মধিক্কারের সমাবেশ করিয়াছেন ও ইহার মধ্যে যে একটি সংযত গভীর কারুণ্যরসের সঞ্চার করিয়াছেন তাহা শুধু তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে নহে সমগ্র বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে দুর্লভ। তাঁহার রাখালও চরিত্র-মহিমার সহজ, অনাড়ম্বর, অ-নাটকীয় প্রকাশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে। অন্যান্য গৌণ চরিত্র—খগেন, কনক প্রভৃতিও—সুচিত্রিত। অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা, আবেগের অন্তর্ভেদী শক্তি ও জীবনের ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশমান রহস্যময়তা এই উপন্যাসে স্মরণীয়ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রভাতকুমার যে গভীর রসসৃষ্টিতে অক্ষম ছিলেন এই অভিযোগ এই উপন্যাসে সম্পূর্ণ খণ্ডিত হইয়াছে।

ছোটগল্প-রচনায় প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব সর্ববাদিসম্মত। তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল ছোটগল্পের দিকেই। এমন কি তাঁহার উপন্যাসগুলি এককেন্দ্রিক

না হইয়া একাধিক ছোট গল্প ও খণ্ড-আখ্যানের সমাবেশ বলিয়াই মনে হয়। বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রথম প্রবর্তনা রবীন্দ্রনাথের হাতে। কিন্তু তাঁহার ছোটগল্প ঠিক বাঙালীর সাধারণ জীবনের প্রতিচ্ছবি-রূপে প্রতিভাত হয় না। তাঁহার প্রায় সমস্ত ছোটগল্পের উপরেই এক কবিসুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতি, এক অসাধারণ সৌন্দর্য-কল্পনার ঘন আস্তরণ বিস্তৃত আছে। তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন এক অখণ্ড উপলব্ধির যোগসূত্রে গ্রথিতরূপে, এক মায়ামণ্ডিত কাব্য-বাতায়নের রন্ধ্রপথ দিয়া। (ইহাতে বাঙালী জীবনের স্থূল বাস্তবতা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাবরূপই বেশী প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের ছোট গল্পে বাঙালীর সহজ জীবনের প্রসন্ন কৌতুকরস, উহার খেয়ালী কল্পনার রঙীন বুদ্‌বুদ্‌-বিলাস, ছোট ছোট পারিবারিক বিরোধের ক্ষণিক আলোড়ন ও মুহূর্ত-পরের অবসান, ক্ষুদ্র অসঙ্গতির আত্মপ্রকাশ ও হাস্যকর ফলশ্রুতির মধ্যে উহার সংশোধন—এইগুলিই রূপ পাইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধপূর্ব যুগের বাঙালীর জীবনানন্দ, যখন নৈরাশ্যবাদ ও সমস্যাজর্জরতা তাহাকে গ্রাস করে নাই, সেই সময়ের জীবন-রসপুষ্ট কল্পনা-বিলাস, শিক্ষিত বাঙালীর মানস আকাশে বজ্রবিদ্যুৎশূন্য লঘু মেঘরাশির মৃদুমন্দ সঞ্চরণ, মুস্কিলের সঙ্গে মুস্কিল-আসানের সহ-অবস্থিতি ইহাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।) এমন কি, 'দেশী ও বিলাতী' গল্পসংগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলিতে বিলাত-প্রবাসী বাঙালী অনভ্যস্ত সমাজ-পরিবেশের মধ্যেও দৈবের স্নিগ্ধ প্রশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সেখানে সে ভালবাসার আশা ও যোগ্যতার অধিক প্রতিদান পাইয়াছে। বিদেশিনীর মধ্যে মাতৃস্নেহের স্পর্শ লাভ করিয়াছে, ভুলভ্রান্তি করিয়াও সহজেই নিষ্কৃতি পাইয়াছে। মনে হয় মঙ্গলকাব্যের বরাভয়প্রদা দেবী বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত দৈবের দুলাল বাঙালী সন্তানের উপর তাঁহার স্নেহহস্ত প্রসারিত করিয়াছেন।

প্রভাতকুমারের ছোটগল্প

উপন্যাসের গঠন-শিল্পে প্রভাতকুমারের যে ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখা যায়, ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। (ছোটগল্পের আঙ্গিক ও পরিমিতিবোধ, উহার ভূমিকাবর্জিত প্রারম্ভ ও অতর্কিত, অথচ তৃপ্তিকর পরিণাম, উহার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে ক্ষিপ্র ও সার্থক ঘটনা-বিন্যাস, উহার অন্তর্নিহিত রসবস্তু বা সমস্যাটিকে পূর্ণভাবে প্রকটিত করার ব্যঞ্জনা-কৌশল—এইসবের উপরই তাঁহার একটি সহজসংস্কার-জাত অধিকার ছিল। তাঁহার খুব কম গল্পেই শিল্পবোধের অভাব বা অসংলগ্নতার

ছোটগল্পে প্রভাত-কুমারের কৃতিত্ব

দোষ দেখা যায়। যেখানে লঘু উপস্থাপনার মধ্যে অনভ্যস্ত গভীর সুর শোনা যায়, সেখানেও উভয়বিধ উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে।) যেখানে তিনি প্রেমের কথা বলিয়াছেন, সেখানেও একটি স্নিগ্ধ কৌতুকবোধ, একটি সুরুচিপূর্ণ শালীনতার মাত্রা রক্ষিত হইয়াছে। (মোপাঁসার মত আদিরসপ্রধান গল্প তিনি লেখেন নাই; কিন্তু অভ্রান্ত শিল্পসুষমা ও বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া তিনি মোপাঁসার সঙ্গে তুলনীয়।)

তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্পের উদাহরণ দিলে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। তাঁহার 'বলবান জামাতা' গল্পে নামের ভুল ও জামাতার দৈহিক পরিবর্তনের জন্য যে ঘোরালো পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল, নির্দোষ হাস্যরসের প্রবাহে তাহা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে এই গল্পের জট পাকাইতে ঘটনার আকস্মিকতার সহিত জামাইএর মানস প্রতিক্রিয়াও সহযোগিতা করিয়াছে। সে নাম ভুল করিয়া পরের শ্বশুরবাড়িতে উঠিয়াছে; তাহার তারও দেরিতে পৌঁছিয়াছে। ইহা দৈবের পরিহাস। কিন্তু সে যখন নিজের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছিয়াছে, তখনও যে তাহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই ইহার মূলে আছে তাহার স্বকৃত অপরাধ। শ্যালিকার বিদ্রূপবাণে জর্জরিত হইয়া সে নিজ নলিনী নামের সম্পূর্ণ বিপরীত এক পালোয়ানী দেহ গড়িয়া তুলিয়াছে এবং চেহারাকে পরুষদর্শন করিতে মুখের সামনে দাড়ির যবনিকা ঝুলাইয়াছে—ইহাতেই নিজ শ্বশুরালয়ে পর্যন্ত তাহার পরিচয়-স্থাপনের পক্ষে বাধা ঘটিয়াছে। তারপর ভুল ভাঙিলে সে ইহা লইয়া একদিনও গায়ের ঝাল মিটায় নাই—ইহাও তাহার চরিত্রে সংযম ও ক্ষমাশীলতার নিদর্শন। সুতরাং এই গল্পে যে রসসৃষ্টি হইয়াছে তাহা একদিকে যেমন ঘটনার আকস্মিকতা-প্রসূত, অপরদিকে তেমনি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেরও অভিব্যক্তি।

বলবান জামাতা—গল্প

'ভুল শিক্ষার বিপদ' গল্পে করুণ রসের উৎসার এক বৃদ্ধের উৎকেন্দ্রিক, অশিষ্ট আচরণের আধারে বিধৃত হইয়াছে। ট্রেনে এক সহযাত্রী যুবক বৃদ্ধকে তাহার খাবারের যে অংশ দেয়, সেই খাদ্যতালিকার মধ্যে মার্মালেড বা কমলালেবুর মোরব্বা ছিল। এই তথ্যটুকু জানিয়া বৃদ্ধ সমস্ত সংযম হারাইয়া যুবককে কটূক্তি করিয়া উঠিল। যুবক যখন তাহার অশিষ্ট আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল, তখনই বৃদ্ধের এই অদ্ভুত আচরণের রহস্য প্রকাশ পাইল। মেয়ের বিবাহের জিনিসপত্র কিনিতে গিয়া মেসের এক রুগ্ন

ভুলশিক্ষার বিপদ—গল্প

যুবকের হাতের কাছে অনবধানতা-প্রযুক্ত সে একঝুড়ি কমলালেবু রাখিয়া দেয়। যুবকটি সমস্ত ঝুড়ি কমলালেবু নিঃশেষ করিয়া জরবিকারগ্রস্ত হয়। বৃদ্ধ মেয়ের বিবাহের টাকা ভাঙিয়া তাহার প্রাণপণ চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। সে নিজেকে তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করিয়া সেই হইতে কমলালেবু বর্জন করিয়াছে। বৃদ্ধের নিজের গ্রাম সম্বন্ধে গৌরববোধ নয়ানজোড়ের ঠাকুরদাদার কথা মনে পড়াইয়া দেয়—তবে ঠাকুরদাদার ছিল নিজ আভিজাত্যে গর্ব, আর এই গল্পের বৃদ্ধের গর্ব সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। তাহার উৎকেন্দ্রিকতার নীচে এই রুদ্ধ আবেগ তাহার প্রকৃতির মহত্ত্বকে আরও প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে।

কাশীবাসিনী-গল্প

'কাশীবাসিনী গল্পে এক পদস্খলিতা নারীর করুণ অপত্যস্নেহের কাহিনী গল্পটির মধ্যে এক গভীরতর সুর সঞ্চার করিয়াছে। তাড়িঘাটের স্টেশনমাস্টার গিরীন তাহার স্ত্রী মালতীর সঙ্গে রেলের বাসায় থাকে। হঠাৎ একদিন এক অপরিচিতা প্রৌঢ়া ট্রেন ফেল করার অজুহাতে তাহার বাসায় আশ্রয় লয় ও মালতীর নিঃসঙ্গ জীবনকে স্নেহমমতায় কিছুটা পূর্ণ করে। মাতাল স্বামীর ব্যবহারে অব্যবস্থিতচিত্ততা—কখনও সোহাগ, কখনও তর্জন—মালতীর জীবনে এক অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার মনোভাবকে স্থায়ী করিয়াছিল। ইহার সহিত তুলনায় অপরিচিতা মাতৃস্থানীয়া নারীর আদরযত্ন তাহার নিকট আরও নির্ভরযোগ্য স্নেহাশ্রয় বলিয়া মনে হইল। সুতরাং সে এই নবাগতাকে আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিল। ইতিমধ্যে কাশীবাসিনী চলিয়া যাওয়ার কয়েকদিন পর মালতীর একখানা গহনা হারাইয়া যাওয়ায় কাশীবাসিনীকে সন্দেহ করিয়া গিরীন পুলিসে খবর দেয়। পুলিসের জুলুম হইতে কষ্টে অব্যাহতি পাইয়া সেই নারী বিষণ্ন গম্ভীর মুখে আবার মালতীর বাড়ি আসে ও সে যে তাহার ভ্রষ্টচরিত্রা মাতা এই পরিচয় উদ্ঘাটিত করে। এই পরিচয়ের ফলে তাহার সমস্ত পূর্ব আচরণ এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—মালতীর সাহচর্যে তাহার যে অতৃপ্ত ও অস্বীকৃত সন্তানস্নেহ গোপন পথে চরিতার্থতা খুঁজিতেছিল তাহাই সুস্পষ্ট হয়। মালতীর প্রতিক্রিয়াও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয়—এই সত্য জানার পর তাহার যে প্রথম তীব্র বিরাগ তাহাই একটু পরে অশ্রুভরা স্বীকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। 'হউক অসতী, তবুও ত মা' এই বিপরীতমুখী উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহার মনের দ্বৈত ক্রিয়া সুন্দরভাবে বিধৃত হইয়াছে। প্রভাত-কুমার কত সহজে ও অকৃত্রিম সরলতার সঙ্গে, মনস্তত্ত্বের কোন গোলকধাঁধার

মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, কিরূপ সুরুচি ও সংযমের আবেষ্টনে পতিতা নারীর অন্তর-রহস্য পরিস্ফুট করিয়াছেন।

এই উদাহরণগুলি হইতে প্রভাতকুমারের ছোট গল্পের বিশিষ্ট রীতি ও রূপ পরিষ্কার হইবে। তাঁহার বিষয় যে সামান্য ও আলোচনা যে অগভীর ছিল, একথা বলিলে তাঁহার কৃতিত্বকে খর্ব করা হইবে। তিনি এক দিকে কবির উর্ধ্বচারী কল্পনা ও অন্যদিকে বিকৃত মনস্তত্ত্বের অতি-প্রাধান্য—উভয় প্রকার অতিরেককে বর্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদের আদর্শে স্থির ও জীবননিষ্ঠায় সুস্থ বাঙালী জীবনের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা যদি অগভীর হয়, তবে সে যুগের বাঙালী জীবনধারাই অগভীর ও আবর্তহীন স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয়।

প্রভাতকুমারের ছোট গল্পের রীতি

৫

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮)

শরৎচন্দ্র আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী ও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় উপন্যাসের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবপ্রেরণা ও উপস্থাপনা-রীতির পথিকৃৎ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি রচনায় এক নূতন সমাজচেতনা, রীতির অভিনবত্ব ও মানবিক সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কবি-কল্পনা ও অসাধারণত্বের প্রতি আকর্ষণ তাঁহাকে শীঘ্রই উপন্যাসের প্রধান ধারা হইতে অপসারিত করিয়া এক অননুকরণীয় স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কেহ উপন্যাস লিখিতে সাহসী হন নাই, কেননা রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতি ও তত্ত্বচেতনা না থাকিলে লাবণ্য, কুমুদিনী, এমন কি এলা, বিমলার মত চরিত্রগুলিকে প্রাণময় করা অসম্ভব। তাঁহার বাচনভঙ্গীর ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা পরবর্তী কেহ কেহ অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু যে প্রতিবেশ ও চরিত্র-পরিকল্পনার সহিত উহা সামঞ্জস্যশীল তাহার অনুপস্থিতিতে এই অনুকরণ অনেক সময় প্রাণহীন বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিকত্ব তাঁহার গৌণ পরিচয়—তাঁহার প্রতিভার বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের ইহা অন্যতম শাখা মাত্র। উপন্যাসের প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠ আনুগত্য ছিল না। শুধু তথ্যপর্যবেক্ষণের তন্ময়তা ও জীবনবিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-ধর্ম

মনোভাব তাঁহাকে চালিত করে নাই। উপন্যাসের রীতির অনুসরণ করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় তিনি কাব্যানুভূতির বস্তুনিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টির হাতে ঔপন্যাসিক ঘটনার নিয়ন্ত্রণ-রশ্মি ছাড়িয়া দিয়া উর্ধ্বচারী দেবতার মত মর্ত্যলোকের বিক্ষুব্ধ জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে জীবনের কাহিনীকার কখন যে কবি ও তত্ত্বদর্শী মনীষীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা কঠিন। এই প্রবণতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, ঐতিহ্যধারার অনুবর্তী গোষ্ঠী-ক্রমের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার আমূল পার্থক্য সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রকেই বঙ্কিমের উত্তরাধিকারিত্বের মর্যাদা দিতে হয়। বঙ্কিমের রোমান্স ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছিলেন—পুঞ্জীভূত সমস্যার চাপে ক্লিষ্ট যুগচেতনা অতীতের বীরত্ব-কাহিনী ও প্রেমের অতিনাটকীয় উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোন প্রেরণা অনুভব করিল না। কিন্তু বঙ্কিমের দুইখানি গার্হস্থ্য উপন্যাসে—বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এ ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতি রোমান্সে সমাজ-মনের যে বেদনা, অতৃপ্ত প্রণয়াবেগের যে মর্মজ্বালা অর্ধোচ্চারিত হইয়াছে শরৎচন্দ্র তাহাকেই আরও গভীরভাবে উপলব্ধি ও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। বঙ্কিম-যুগের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীতে বাঙালীর সমাজ-চেতনার গভীর রূপান্তর ঘটিয়াছে। বঙ্কিমের সময় সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ও ক্ষোভের অঙ্কুর সাধারণ মনোভাবের বিরল ব্যতিক্রমরূপে দেখা দিয়াছিল, শরৎচন্দ্রের কালে আসিয়া তাহাই প্রায় সার্বভৌম বিস্তৃতি ও ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ ধারণ করিল। বঙ্কিম মানবমনকে সামাজিক আদর্শের অনুবর্তী করিতে চাহিয়াছিলেন, কেননা এই আদর্শের প্রাণশক্তি ও কল্যাণময় প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস ছিল। অবৈধ প্রবৃত্তির দমন ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত সুখের বিসর্জন—হিন্দুধর্মের এই যে শ্রেষ্ঠ সাধনা তাহাকেই তিনি ব্যক্তিমনের সমস্ত চঞ্চল আত্মতৃপ্তির উপর জয়ী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বঙ্কিমের উপন্যাসে সমাজের সঙ্কীর্ণ অত্যাচারী রূপ কোথাও দেখি নাই। সমাজ নিজ ক্রুর, নিষ্ঠুর আচরণ বা হীন চক্রান্ত দ্বারা কাহারও অসংযত লালসাকে পিষিয়া মারিতে চাহে নাই কিন্তু সামাজিক বিবেকবুদ্ধি বা আদর্শ-চেতনাই এই সমস্ত অসামাজিক

বঙ্কিমচন্দ্রে সামাজিক আদর্শের স্বরূপ

প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যেই এক গোপন অস্বস্তি ও আত্মনিগ্রহের বীজ বপন করিয়াছে। বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে সমাজ-বিরোধী ইচ্ছা ও কাজের মধ্যেই একটি আত্মধ্বংসী পরিণতি আছে—বিশ্ববিধানের মত সমাজবিধানেরও এমন একটি নৈর্ব্যক্তিক, অথচ অনিবার্য শক্তি বর্তমান যাহা অপরাধীকে অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার বিধিলঙ্ঘনের শাস্তি দেয়। বঙ্কিম বেণী ঘোষাল বা গোলোক চাটুজ্যের ন্যায় কোন দাম্ভিক, স্বার্থপর, অত্যাচারী সমাজপতির কল্পনা করেন নাই—তাঁহার শৈবলিনী, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল প্রভৃতি উন্মার্গগামী নর-নারীর শাস্তি কোন বাহ্য অভিভব হইতে আসে নাই। রোহিণীর শাস্তি আসিয়াছে সমাজের উদ্যত দণ্ড হইতে নহে, সমাজ-চেতনার দ্বারা পরোক্ষভাবে ও আত্মানুশোচনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ব্যর্থ প্রেমিকের অকস্মাৎ-উদ্গীরিত রোষানল হইতে। বঙ্কিম সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা ও অধঃপতন এবং সমাজ-বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা—এই উভয় দিককার হিসাবেই ভুল করিয়াছিলেন। যে যৌবনজলতরঙ্গ সমস্ত বিধি-নিষেধের বাঁধ ছাপাইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে তিনি প্রাচীন আদর্শের প্রশস্তিগানের দ্বারা রোধ করিবেন এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। তিনি 'বিষবৃক্ষ' লিখিয়া ইহা যে ঘরে ঘরে অমৃতফল প্রসব করিবে এইরূপ আত্মভোলানো স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তিনি এই বিষবৃক্ষের ফলের স্বাদুতার কথাই প্রচার করিয়াছিলেন। যে বিরাট উদ্বৃত্ত শক্তি নগেন্দ্রনাথের মনের স্রোতকে ফিরাইয়া উহাকে সূর্যমুখীর অভিমুখী করিয়াছিল তাহার রহস্য কয়জন বুঝিল? যে দুঃসহ ভ্রমর-চিন্তা গোবিন্দলালের হীন রূপাসক্তির কণ্টকতরুকে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়িতমূল করিয়া একদিনকার হঠাৎ-ওঠা ঝড়ে তাহাকে ভূপাতিত করিল তাহার ঊর্ধ্বগামী প্রেরণা কয়জন অনুভব করিল? কিন্তু এই উপন্যাস লেখার ফলে কুন্দনন্দিনীর প্রতি সহানুভূতি এবং রোহিণীর প্রখর রূপশিখার দাহকারী আকর্ষণ ও তাহার বঞ্চিত হৃদয়ের নির্লজ্জ লালসার সমর্থন সমাজ-চেতনায় সর্বব্যাপী হইয়া উঠিল।

শরৎচন্দ্রে সামাজিক আদর্শের নূতনত্ব

এই হিসাবভুলের সংশোধনের ভার শরৎচন্দ্রের উপর পড়িল। সমাজ ও ব্যক্তি-মনের সংঘর্ষে তিনি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সমাজ-নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা উভয়ের তুলনা-মূলক বিচারে তিনি নিঃসংশয় হইলেন যে শেষোক্তটির ভবিষ্যৎ মূল্য-সম্ভাবনা অনেক বেশী। সমাজের উন্নত আদর্শের দোহাই পাড়া নিছক ভাববিলাসমূলক ও অবাস্তব; উহা এখন অন্ধ প্রথানুগত্য ও নিছক স্বার্থবুদ্ধিতে

পরিণত হইয়া ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণের নৈতিক অধিকার হারাইয়াছে। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত-বর্ণনা হিন্দুধর্মাদর্শের অন্তিম দীপ্তি—উহাতে "স্তূপপাদমূলে জ্বলিয়া নিবিল শেষ আরতির শিখা"। হিন্দুসমাজনেতার মধ্যে রামানন্দ স্বামীর ন্যায় ক্রান্তদর্শী, মানবচিত্তরহস্যের সন্ধানদক্ষ, পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে ভারসাম্য-বিধায়ক, পাষাণ গলাইতে সক্ষম বিধানদাতা কোথায়? মানবমন এখন দীর্ঘ আত্মনিরোধের বেদনায়, নিষ্ফল ত্যাগ-বৈরাগ্যের তিক্ততায় পূর্ব-আদর্শের প্রতি আস্থা হারাইয়াছে। সে আর কেন্দ্রীয় শাসন মানিবে না, নিজের অনুভূতির আলোকে ভুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়া নিজ পথের সন্ধান করিবে। সমাজের আসল কাজ হইল ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ গুণের সংরক্ষণ ও সংবর্ধন; ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলধন নষ্ট করিয়া সমাজের ঐশ্বর্যের খাতায় অভাবাত্মক ঋণের অঙ্কই বাড়িয়া যাইবে। মানুষের একটা আদর্শ নিশ্চয়ই থাকিবে; কিন্তু সে আদর্শ বাহির হইতে আরোপিত হইবে না, আত্মচিন্তা ও আত্মবিচারের ফলে, মানবিকতার সুস্থ বিকাশ ও পূর্ণমূল্যের স্বীকৃতির দ্বারাই তাহা উদ্ভূত হইবে। সমাজের নির্বিচার বর্জন-নীতি আত্মঘাতী—পাপীকেও দরদ দিয়া বিচার করিতে হইবে, তাহার মধ্যেও যে-সমস্ত সদ্‌গুণ আছে তাহাদিগকে বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে, অবস্থাচক্রে যে অসতী তাহারও চরিত্রগৌরব ও সতীত্ব-মর্যাদাকে স্বীকার করিতে হইবে। সমাজ এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণের আধাররূপে ব্যক্তিজীবনে পরোক্ষ প্রেরণা যোগাইবে। ইহাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অনুসৃত নূতন সমাজনীতি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল আমাদের পরিবার-জীবনের সাধারণ আবেগ ও বৃত্তিসমূহের সম্বন্ধে এক আশ্চর্য সূক্ষ্ম সত্যানুভূতি। আমরা যাহাদিগকে প্রথারূপে গ্রহণ করি, তিনি তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রের বিশিষ্ট অনুভূতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করি যে মা ছেলেকে বা স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শের রেখাচিত্রের অনুসরণে, এবং সেই ভাব-বর্ণনায় আমরা এই সাধারণ আদর্শের উপর এতটা জোর দিই যে বিশেষ ক্ষেত্রের ব্যক্তিগত পার্থক্যটুকু চাপা পড়িয়া যায়। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে মা যেমন নিজের ছেলেকে ভালবাসেন, তেমনি সময় সময় পরের ছেলেকেও সমান ভালবাসেন এবং এই ভালবাসা সবসময় রক্তের নৈকট্য-বন্ধনের অনুসারী নহে। দাম্পত্যপ্রেমও তেমনি সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্টান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

শরৎসাহিত্যে সূক্ষ্ম আবেগের বৈচিত্র্য

মান-অভিমান, তীব্র মতভেদ ও সময় সময় ঘৃণা-অবজ্ঞা-বিমুখতার ছদ্ম আবরণও ইহার স্বরূপকে দুর্নিরীক্ষ্য করিয়া তোলে। স্নেহ-প্রেমের এই তির্যক গতি পরিবার-জীবনের ভারসাম্য কিরূপ দারুণভাবে বিচলিত করে শরৎচন্দ্র অতি সূক্ষ্ম তুলিকায় তাহা আঁকিয়াছেন। মানবিক বৃত্তিসমূহ যে সর্বদা কর্তব্য-প্রথার ছক-কাটা পথে চলে না, উহারা যে আপন খেয়ালখুশিমত চলিয়া সংসারে মৃদু-রকমের অভাবনীয়তার চমক জাগায় শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

(ক)

পারিবারিক স্নেহ-মমতার তির্যক গতি

মেজদিদি হেমাঙ্গিনী বড় জায়ের বৈমাত্র ভাই কেষ্টাকে ভালবাসিয়া সংসারে একটি ক্ষুদ্র ঝড় বহাইলেন। কেষ্টাও তাহার সরল, স্থূলবুদ্ধি প্রকৃতির এক ধরনের হাস্যকর অথচ করুণ ভালবাসার পরিচয় দিয়া মেজদিদির অন্তরে নিজ আসন সুদৃঢ় করিয়া লইল। এই দুই অসম ভালবাসার মিলিত শক্তির নিকট পরিবারের সমস্ত বিরোধিতা, ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের সমস্ত বিষোদ্গার পরাজিত হইয়া ইহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। বিন্দু তাহার একরোখা, আত্মাভিমানী প্রকৃতির অজস্র, সংসারের অন্যান্য দাবি-দাওয়ার মর্যাদালঙ্ঘী সবটুকু স্নেহ দিয়া তাহার বড় জায়ের ছেলে অমূল্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। এই একপেশে ভালবাসার প্রবল স্রোতে সংসারে ভাঙন ধরিয়াছে; ইহারই জোরে সে ছেলের নিজের মায়ের প্রশ্রয়ের অধিকারকেও অস্বীকার করিয়াছে; রাগে কটুকথা বলিয়া অন্যায় দিব্য দিয়াছে। তাহার ভাশুর ও জা যদি সাধারণ মনুষের মত জিদের বশবর্তী হইতেন, উচ্চারিত অপমান-বাক্যের পিছনে বিপুল, আত্মবিস্মৃত স্নেহের আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিতে না পাইতেন তবে এই অতিরিক্ত টানাটানিতে সংসার-তরণীর ভরাডুবি ঘটিত। শেষ পর্যন্ত ইঁহাদের শুভবুদ্ধিই শুভ পরিণামের সূচনা করিয়াছে। নারায়ণী তাহার মাতৃহীন দেবর রামের সমস্ত দুরন্তপনা শুধু যে নিজে সহ্য করিয়াছে তাহাই নয়—তাহার মাতা ও স্বামীর সমস্ত হিতপরামর্শকে অগ্রাহ্য করিয়া স্নেহের দাবিকেই অগ্রগণ্য করিয়াছে। রামকে পৃথক করিয়া দিলেও সে আশা করে যে তাহার বৌদিদি তাহার ভাগেই পড়িবে। এই অবস্থাসঙ্কটের সমাধান বেশ সন্তোষজনক হয় নাই—দিগম্বরী ও শ্যামলালের

বিচিত্র হৃদয়াবেগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

ফোঁসকোঁসানি শান্ত হয় নাই। রামলালের সুবুদ্ধিসঞ্চারেই এই ভাঙন প্রতিরুদ্ধ হইবে এইরূপ আশার ইঙ্গিতেই ছোট গল্পটির সমাপ্তি ঘটিয়াছে।

'একাদশী বৈরাগী' (১৯১৮), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), 'মামলার ফল' (১৯২০) 'হরিলক্ষ্মী', 'অভাগীর স্বর্গ' 'মহেশ' (১৯২৬) ও 'পরেশ' (১৯৩৪) পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নানা বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক বিরোধের চিত্র। 'একাদশী বৈরাগী'-তে কৃপণের মনস্তত্ত্বঘটিত অসঙ্গতি লেখকের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছে—তাহার অর্থসম্বন্ধীয় নীচতা ও ন্যায়নিষ্ঠা একসূত্রে গ্রথিত হইয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। 'নিষ্কৃতি'-তে একান্নবর্তী, বহুভ্রাতাসমন্বিত পরিবারে ইচ্ছা ও চরিত্রের সংঘাত কেমন করিয়া প্রবল হইয়া উঠে লেখক তাহাই দেখাইয়াছেন। শৈলর দৃঢ়তা ও নয়ানতারার কুটিলতা যদিও সংঘর্ষের প্রথম উপলক্ষ্য ঘটাইয়াছে, তথাপি কর্তা হরিশের আত্মভোলা প্রকৃতি ও বড়গিন্নী সিদ্ধেশ্বরীর তোষামোদি-প্রিয়তা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা এই ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে জটিলতা সঞ্চার করিয়াছে। 'মামলার ফল'-এ পরিবারজীবনের স্নেহের তির্যক গতি প্রত্যাশিত ভ্রাতৃবিচ্ছেদকে প্রতিরুদ্ধ করার হেতু হইয়াছে। 'হরিলক্ষ্মী' গল্পে ভ্রাতৃবিরোধ বড় ভাইকে ছোট ভাইএর স্ত্রীর প্রতি নীচ ও হীন অত্যাচারে উদ্রিক্ত করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড়বৌ হরিলক্ষ্মীর সমবেদনার ফলে ছোট বৌএর লাঞ্ছনার অবসান ঘটিয়াছে। এই গল্পে বড় বৌ ধনগর্বিতা ও ঈর্ষাপরায়ণা হইলেও তাহার মধ্যে মানবিক মমতার স্ফুরণ যে সম্ভব তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'অভাগীর স্বর্গ'-এ এক বাউড়ী বিধবার মনে ধনীগৃহিনীর দৃষ্টান্তে শাস্ত্রবিধিসম্মত সৎকারের আকূতি কেমন করিয়া উচ্চবর্ণের অসহযোগে ও দারিদ্র্যের চাপে অপূর্ণ থাকিয়া গেল তাহারই করুণরসস্পৃষ্ট বর্ণনা। 'মহেশ'-এ গরুর প্রতি আচরণে ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের মধ্যে কল্পিত পার্থক্যের অসারতা অপূর্ব করুণরসস্ফুরণের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। এই গল্পটি সাম্প্রদায়িক বিচারে লেখকের অপক্ষপাত ন্যায়নিষ্ঠার প্রমাণ। 'পরেশ' গল্পে জ্যাঠা গুরুচরণের সঙ্গে ভাইপো পরেশের একটু উদ্ভট সম্পর্ক চিত্রিত হইয়াছে—এই উদ্ভট আচরণে কাহারও চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। এই গল্পটি শরৎচন্দ্রের আপেক্ষিক ব্যর্থতার নিদর্শন। 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬) বিমাতা ও উচ্চশিক্ষিত বৈমাত্র ভ্রাতার সহিত অশিক্ষিত, বাহিরে কর্কশ কিন্তু অন্তরে স্নেহশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গোকুলের খেয়ালী আচরণের কাহিনী। গোকুলের চরিত্রের স্থূল, অমার্জিত ইতরতার সঙ্গে তাহার ভ্রাতৃস্নেহ ও পারিবারিক জীবনের নিঃস্বার্থতা সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

ইহার সঙ্গে তাহার খেয়ালীপনা ও উদ্ভট আচরণ-অসঙ্গতি মিলিয়া তাহাকে একটি অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

(খ)

প্রেমরহস্য উদ্‌ঘাটন—ছোটগল্প

প্রেমের রহস্য-উদ্‌ঘাটন ও স্বরূপ-নির্ণয়ে শরৎচন্দ্র যে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বাঙালীর সংকীর্ণ, প্রথাশাসিত জীবনযাত্রায় প্রেমস্ফুরণের যে বিরল অবসর ছিল, তাহারই তিনি যে আশ্চর্য সুযোগ লইয়াছেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর। অতি-আধুনিক যুগে ভদ্রসমাজের নর-নারীর খানিকটা অবাধ মেলামেশার ফলেই এই শাস্ত্রনির্দেশ-নিরপেক্ষ, গুরুজনের অনুমোদন-বহির্ভূত, স্বতঃস্ফূর্ত প্রণয়-উন্মেষের অবকাশ ঘটিয়াছে। শরৎচন্দ্রের প্রেমকাহিনীমূলক উপন্যাসগুলিতে যে প্রেমের বর্ণনা পাই, তাহার মধ্যে কোথাও কোথাও অস্বাভাবিকতা ও কষ্টকল্পনা দেখা গেলেও মোটের উপর উহার ছন্দ, প্রকাশভঙ্গী ও ঘটনাপরিবেশ বাঙালী সমাজবিন্যাসেরই যথার্থ পরিণতি বলিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মে। উহার মধ্যে বাঙালীর সমাজচেতনা ও মনোভঙ্গীর লক্ষণ সুপরিস্ফুট।

প্রেমসম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি

শরৎচন্দ্রের প্রেম সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণাটি পরিস্ফুট হইবার পূর্বে তিনি 'মন্দির' 'বোঝা' (১৯১৭), 'অনুপমার প্রেম' (১৯১৭), 'আলো ও ছায়া' (১৯১৭) প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে প্রেমবিষয়ক চলতি দৃষ্টিভঙ্গীরই অনুবর্তন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব জীবনদর্শন যেন আত্মানুসন্ধানে রত আছে বলিয়া মনে হয়। 'মন্দির'-এর ব্যর্থ প্রণয়কাহিনী ও অকালবিধবা নায়িকার দেবপূজার প্রতি নিষ্ঠার আতিশয্য নিরুপমা ও অনুরূপাদেবীর উপন্যাসের অনুরূপ আবহাওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রতিবেশ-রচনায় ও সম্পর্ক-নির্ণয়ে শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম দৃষ্টির কিছুটা আভাস এখানে মিলে। 'বোঝা' এক ভাবপ্রবণ খেয়ালী স্বামীর দ্বারা পত্নীর প্রতি অকারণ উপেক্ষা ও অবহেলার করুণ কাহিনী। ইহা বঙ্কিমী ঢংএ লেখা ও শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টির বিশেষত্ব-বর্জিত। অবিমিশ্র করুণরসে মনস্তাত্ত্বিক সঙ্গতি সম্পূর্ণভাবে ভাসিয়া

প্রথম পর্যায়ের প্রেমের গল্পে অপরিস্ফুট প্রেমচেতনা

গিয়াছে। 'অনুপমার প্রেম'ও বাস্তবের আঘাতে চূর্ণ কৈশোরপ্রণয়স্বপ্নের ব্যঙ্গাতিরঞ্জিত চিত্র। লেখক অনুপমাকে নানা লাঞ্ছনা-দুর্গতির নোনা জলে হাবুডুবু খাওয়াইয়া শেষ পর্যন্ত এক ভূতপূর্ব ব্যর্থ প্রেমিকের নিরাপদ আশ্রয়ের তীরে তুলিয়াছেন। ইহাতে আকস্মিকতার প্রবল প্রাদুর্ভাব সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক সত্য ও প্রণয়-পরিচয়ের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। 'আলো ও ছায়া'র অবাস্তব জীবন-পরিবেশে ও অসম্ভব ঘটনাবিন্যাসে বাস্তববিড়ম্বিত দুই নীড়ান্বেষী মানবাত্মার অস্পষ্ট রূপকাভাস প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই ছেলেমানুষি, রূপকথাজাতীয় গল্পের মধ্যে স্থানে স্থানে পরিণত জীবন-মননের নিদর্শন আমাদিগকে বিস্মিত করে। ইহাদের মধ্যে শরৎ-প্রতিভা অনুকরণ ও কল্পনাবিলাসের মধ্য দিয়া অর্ধবিভ্রান্তভাবে নিজ পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে এইরূপ ধারণাই আমাদের মনে জাগে।

শুভদার পরিণত রচনার পূর্বাভাস

শরৎচন্দ্রের বড় উপন্যাসের মধ্যে 'শুভদা' (১৮৯৮ খ্রীঃ অঃ লেখা ও মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত) লেখকের প্রথম রচনার মর্যাদা দাবি করিতে পারে। পরবর্তী কালে ইহা সংশোধিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার পরিণত রচনার যে পূর্বাভাসগুলি মিলে —স্নেহপ্রেমভালবাসার কুটিল, তির্যক গতি, গণিকাজীবনের সহানুভূতিমূলক চিত্র ও মাঝে মাঝে প্রজ্ঞাপূর্ণ জীবনমন্তব্য—তাহা প্রথম রচনা-কালীন বৈশিষ্ট্য না পরবর্তী সংশোধনের ফল—সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে কাঁচা হাতের চিহ্ন ইহাতে সুপরিস্ফুট। ঘটনার শিথিল গ্রন্থন ও চরিত্র-পরিকল্পনায় অগভীরতা তাহারই নিদর্শন। কেবল এক শুভদা চরিত্রের মূক সহিষ্ণুতা ও অনিঃশেষিত ধৈর্য উহাকে যেন জড়পদার্থের পর্যায়ভুক্ত করিয়া উহাতে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছে।

প্রথম দিককার প্রেমমূলক উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের প্রথম দিককার রচনা 'বড়দিদি'তে (১৯১৩) সুরেনের বড়দিদির উপর ছেলেমানুষি নির্ভরশীলতা ও মাধবীর স্নেহপরিচর্যা হঠাৎ যে কেমন করিয়া ভালবাসায় রূপান্তরিত হইল তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। এই অর্ধস্ফুট মানসলীলার বাস্তব পরিচয় দিতে গিয়া লেখককে ঘটনা-বিন্যাসকে অনেকটা কৃত্রিম আদর্শের ছাঁচে ঢালিতে হইয়াছে। তথাপি প্রেমের অভাবিত জন্ম-রহস্যের আদিকাহিনীরূপে ইহার একটা মূল্য আছে। 'পণ্ডিতমশাই'-এ (১৯১৪) বৃন্দাবন ও কুসুমের অনিশ্চিত সম্পর্কটি চরণকে আশ্রয় করিয়া খানিকটা স্পষ্টতার দিকে অগ্রসর

হইয়াছে, কিন্তু কুসুমের কুণ্ঠা-সংকোচ ও চলচ্চিত্ততা অনেকটা উচ্চবর্ণের আদর্শের অনুসৃতি বলিয়া কৃত্রিমতা-দুষ্ট বোধ হয়। 'পরিণীতা'-য় (১৯১৪) শেখর-ললিতার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা দুই নিঃসম্পর্ক প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। শেখরের মনোভাবের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা অপেক্ষা অধিকারবোধের স্থূল অভিমানই প্রবলতর। এক পক্ষের এই সুস্পষ্ট অবহেলা ও বিমুখতা সত্ত্বেও ললিতার মনে যে দাগ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে; এবং শেষ পর্যন্ত তাহার এই স্থির প্রত্যয়ই অপর পক্ষকে তাহার দাবি স্বীকার করাইয়াছে। এই প্রাথমিক পর্বের ছোটগল্পগুলিতে শরৎচন্দ্র প্রেমের সামাজিক আধার খুঁজিতে যে খানিকটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা সহজেই বোঝা যায়—প্রণয়ের মুক্তার উপযোগী শুক্তি-আহরণে তিনি স্থানে স্থানে স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন।

'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) হইতে শরৎচন্দ্রের প্রেম-চিত্রণে খানিকটা নিশ্চিতিবোধ আসিয়াছে। এখানে পল্লীজীবনের স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বৈষয়িক বিরোধের ছদ্মবেশে এক গোপনচারী, সমাজবিধি ও নিজ অন্তর-আদর্শ উভয় দিক দিয়াই আত্মকুণ্ঠিত প্রেমের অস্তিত্ব প্রকটিত হইয়াছে। সমাজের ভয়, বৈধব্যের সংস্কার ও আচরণের হীনম্মন্যতার জন্য এই প্রেম কোনও দিনই তাহার প্রকাশ-ভীরুত্ব অতিক্রম করিতে পারে নাই। রমেশের প্রতি আচরিত প্রতিটি অন্যায়ের বেদনাময় প্রতিক্রিয়া, ভাই যতীনকে রমেশের আদর্শে মানুষ করিবার কুণ্ঠিত কামনা ও নিজ জ্বালাময় অন্তর্দাহ—ইহাই এই প্রেমের অন্তর্গূঢ় অস্বস্তির যৎকিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ। জ্যাঠাইমা রমার মনের কথা বাহিরে না আনিলে এই ব্যথাদীর্ণ অনুভূতি চিরদিন অপ্রকাশিতই থাকিত। পল্লীসমাজের হীন পরিবেশে এই প্রেমের কুণ্ঠিত আবির্ভাব, চারিদিকের কুয়াশার মধ্যে ইহার ক্ষীণ রশ্মির ম্লান আলোক ইহার অকৃত্রিমতার নিদর্শন। মরুভূমিতে ফোটা ফুলের মতনই ইহার স্বল্পায়ু, বর্ণহীন জীবন। কিন্তু গ্রাম্যজীবনের পঙ্ককুণ্ডে এই সুদূর নক্ষত্রদীপ্তি এক মহনীয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে।

পল্লীসমাজে প্রেমের চিত্র

'বিরাজ বৌ'-এ (১৯১৪) দাম্পত্যপ্রেম কেমন করিয়া অভিমানের এক অদম্য উচ্ছ্বাসে আপনাকে অস্বীকার করিয়া বসিল ও কেমন করিয়া সমস্ত জীবনব্যাপী অনুতাপে এক মুহূর্তের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিল তাহারই করুণ কাহিনী। ইহার আঘাত-সংঘাতের মধ্যে গ্রাম্য পরিবেশের যথার্থ ও পরিবার-জীবনের সত্যকার সমস্যা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

বিরাজ বৌ

'চন্দ্রনাথ'-এ (১৯১৬) মৃদু সামাজিক প্রতিকূলতার পরিবেশে একটি অসম দাম্পত্য সম্পর্কের সাময়িক বিচ্ছেদ ও মিলনান্তিক পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সমাজের অংশ গৌণ; উহার অসমর্থন শীঘ্রই আনুকূল্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইল চন্দ্রনাথ ও সরযূর ভালবাসার দুর্বলতা—চন্দ্রনাথের অনুগ্রহপরুষ ও সরযূর কুণ্ঠাশিথিল প্রেম কোন দিনই নিবিড়তা লাভ করে নাই। আর কৈলাস খুড়ার চরিত্রের তেজস্বিতা ও বিশুর প্রতি তাহার সর্বগ্রাসী মমতা সাধারণ কাহিনীর মধ্যে অসাধারণত্বের স্পর্শ আনিয়াছে।

চন্দ্রনাথ

'স্বামী' (১৯১৮) গল্পটিতে প্রাচীন-আদর্শানুসারী স্বামীর চিত্তের উদার ক্ষমাশীলতার প্রভাবে অন্যাসক্তা স্ত্রীর হৃদয় কিরূপে পাতিব্রত্যধর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অনুতপ্তা স্ত্রীর মুখ দিয়া তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এখানে মনস্তত্ত্ব অপেক্ষা হৃদয়াবেগই প্রধান; গল্পটি কতকটা রবীন্দ্রধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী

'কাশীনাথ' (১৯১৭), 'দর্পচূর্ণ' (১৯১৫) 'নববিধান' ও 'সতী' গল্পগুলিতে দাম্পত্য বিরোধের নানা স্তর উদ্ঘাটিত হইয়াছে। একই বিষয়ে প্রতিবেশ ও চরিত্রের বিভিন্নতায় সংঘাতের বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তোলাতেই লেখকের কৃতিত্ব ও উদ্ভাবন-কুশলতা পরিস্ফুট। 'কাশীনাথ'-এ ধনবতী জমিদারকন্যা স্ত্রী ও স্বভাবনিঃস্পৃহ আত্মভোলা ঘরজামাই স্বামীর মধ্যে বিরোধ কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়াছে তাহাই উপজীব্য বিষয়। এখানে নানা বহির্ঘটনার প্রক্ষেপ এবং স্বামী ও স্ত্রীর আচরণে অসঙ্গতি ও মাত্রাহীনতা সংঘাতের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। 'দর্পচূর্ণ'-এ দাম্পত্য মনোমালিন্যের সরলতম রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। বড় লোকের ঘরের মেয়ে ইন্দু তাহার উপার্জনে অক্ষম ও সাদা চাল-চলনে অভ্যস্ত স্বামীকে বারবার মর্মান্তিক অপমানে বিদ্ধ করিয়া তাহার সুপ্ত আত্মসম্মানবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে ও স্ত্রীর সাহায্য লওয়া অপেক্ষা সে কারাবরণকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছে। স্ত্রীর চৈতন্য হইয়াছে অতি বিলম্বে কিন্তু তাহার সহিত স্বামীর পুনর্মিলনের দৃশ্যটি লেখক গল্পের বহির্ভূত রাখিয়াছেন। এখানে সম্পূর্ণ এক-মুখী দ্বন্দ্ব জটিলতাহীন হইয়াও কেবল আঘাতের পৌনঃপুনিক তীব্রতার জন্য উপভোগ্য হইয়াছে।

দাম্পত্য-বিরোধের চিত্র : কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ

'নববিধান' ছোট-উপন্যাস-জাতীয়। ইহাতে ধর্ম ও আচারগত পার্থক্য

দাম্পত্য অসামঞ্জস্যের হেতু হইয়াছে। বিজাতীয় রুচি ও আচারে অভ্যস্ত শৈলেশ উষার হিন্দুয়ানী সংস্কার অনেকটা অর্থনৈতিক কারণে অনিচ্ছাসহকারে মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু ভগ্নী বিভার প্ররোচনায় বাবুর্চির ব্যবস্থাই পুনঃপ্রচলিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে উষা সপত্নীপুত্র সোমেশকে স্নেহ দিয়া বশ করিয়াছে। অব্যবস্থিতচিত্ত শৈলেশ এক চরম সীমা হইতে বিপরীত চরম সীমায় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—সে সাহেবিয়ানার স্বৈরাচার ছাড়িয়া একেবারে বৈষ্ণবীয় নিরামিষ

নববিধান

আহার ও কঠোর আচারনিষ্ঠা গ্রহণ করিয়াছে। উষা আবার ফিরিয়া এই বিচলিত ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সমগ্র উপন্যাসটি বাহিরের নিয়ম ও আচার লইয়া বিব্রত ; অন্তর্জীবনের কোন সার্থক ইঙ্গিত এখানে মিলে না।

'সতী' গল্পটি পরিকল্পনায় ও ঘটনাবিন্যাসে সম্পূর্ণ মৌলিক। সাধারণতঃ শরৎচন্দ্র অসতীর চরিত্রগৌরব ও প্রণয়নিষ্ঠা উদ্ঘাটন-কার্যে নিজ শক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার বিপরীত দিক অর্থাৎ সতীর স্ত্রীর স্বামীর উপর অসপত্ন অধিকার লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান নাই। এই গল্পটি সতীর স্বামী-

সতী

হিতৈষণা কিরূপ সাংঘাতিক ও শ্বাসরোধী রূপ লইতে পারে তাহারই একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। সতীর সদাসন্দিগ্ধ, নিশ্ছিদ্র অভিভাবকত্ব বিশ্বাসী স্বামীকেও যে অবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে পারে তাহাও ইহাতে সার্থকভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

'পথনির্দেশ' (১৯১৪) ধর্মমতের পার্থক্য ও অভিভাবিকা মাতার গোঁড়ামির জন্য দুই তরুণ প্রণয়োন্মুখ হৃদয় যে দুঃসহ মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছে তাহারই কাহিনী। ব্রাহ্মযুবক গুণী ও হিন্দুর মেয়ে হেমনলিনী পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়াও কেবল মাতা সুলোচনার ধর্মসংস্কারের বাধায় মিলিতে পারিল না। ইহার ফল উভয় পক্ষেই বিষময় হইয়াছে। গুণী আত্মদমনের আতিশয্যে মরণ-পথযাত্রী হইয়াছে, আর হেমনলিনী এই আত্মদ্বন্দ্বের দমকা হাওয়ায় মুহুর্মুহু

পথনির্দেশ

স্ববিরোধী আচরণের অনিশ্চয়তায় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। লেখকের দ্বন্দ্বের তীব্রতা-প্রদর্শন ও করুণ-রস-উদ্দীপন সত্যই প্রশংসনীয়। তথাপি মনে হয় যে ইহার মধ্যে কিছুটা উপায়ের কৃত্রিমতা ও প্রয়াসের সচেষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

'পাণ্ডত মহাশয়'-এ (১৯১৪) প্রেমের সহিত দেশসেবার আদর্শ মিশিয়া প্রেমকে অপেক্ষাকৃত গৌণ পর্যায়ে স্থান দিয়াছে। আর এই প্রেম বৈরাগী

সমাজভুক্ত বৃন্দাবন ও তাহার পূর্ববিবাহিতা, পশ্চাৎ-পরিত্যক্তা স্ত্রী কুসুমের মধ্যে এক নবজাত আকর্ষণরূপে অঙ্কুরিত হইয়াছে। কুসুমের উচ্চবর্ণসুলভ তীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধ ও পুনর্বিবাহ-বিষয়ে কুণ্ঠিত সংস্কার এই প্রেমের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার সঙ্গে বৃন্দাবনের পারিবারিক দুর্ঘটনা ও তাহার পল্লীজীবনের নানা-বাধা-বিড়ম্বিত সংস্কার-প্রয়াস উপন্যাসের ঘটনাকে জটিল ও প্রেমকেন্দ্রচ্যুত করিয়াছে। এই উপন্যাসে প্রেমের বাস্তব, সমাজ- জীবনসম্ভব রূপটি আদর্শানুরঞ্জনের আতিশয্যে বহু পরিমাণে চাপা পড়িয়াছে। আঁধারে আলো, 'ছবি' (১৯২০) ও 'বিলাসী' (১৯২০) শরৎচন্দ্রের প্রেমের বিচিত্র পটভূমিকা-সৃষ্টিনৈপুণ্য ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উহার স্বরূপ-প্রকটনে অসাধারণ দক্ষতার নিদর্শন।

পণ্ডিতমশাই ও অন্যান্য গল্প

'দেবদাস' (১৯১৭) ও 'চরিত্রহীন'-এ (১৯১৭) লেখক গণিকা-জীবনে সত্যকার প্রেমের উদ্ভব-রহস্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাদের কলঙ্কিত জীবনের আরম্ভই হয় ভালবাসার অতৃপ্ত আবেগে ও উহার পাত্রের পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানে। কুলবধূর একনিষ্ঠ প্রেম প্রেম অপেক্ষা নিষ্ঠাকেই বেশী মূল্য দেয়; সুতরাং প্রেমের রহস্য হয় ইহাদের সহজ সংস্কার-জাত, না হয় একেবারেই অনাস্বাদিত। কিন্তু যাহারা প্রেমের জন্য অজ্ঞাত পথে পদক্ষেপের দুঃসাহস দেখাইয়াছে ও সামাজিক মান-মর্যাদা বিসর্জন দিয়াছে, তাহাদের ভালবাসা যদি একেবারে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত না হয়, তবে তাহাদের মধ্যেই ইহার সত্য পরিচয় সম্ভব ও প্রত্যাশিত। বহু পরীক্ষার পর প্রকৃত প্রেমিকের সন্ধান পাইয়া ইহাদের ভালবাসার অস্থির আকৃতি উহার বিশুদ্ধতম রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। শরৎচন্দ্রের এইজাতীয় উপন্যাস এইরূপ যুক্তিবাদ ও জীবন-অভিজ্ঞতার উপরই প্রতিষ্ঠিত মনে হয়। দেবদাসের হতাশ প্রণয়ের জ্বালাময়, ছন্নছাড়া জীবন এই নিগূঢ় নিয়মেই চন্দ্রমুখীর স্নেহ-পরিচর্যার মধ্যে আশ্রয় ও শান্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখানে সত্যকার প্রণয়োন্মেষ হইয়াছে কি না সন্দেহ। দেবদাসের দিকে প্রেম একেবারেই নাই, আছে কৃতজ্ঞতা; আর চন্দ্রমুখীর দিকে হয়ত আছে নিবিড় সহানুভূতি ও মাতৃসুলভ সেবা-যত্ন। বৈধের ন্যায় অবৈধ মিলনেও কতকগুলি কোমল বৃত্তির সমবায়কে প্রেম বলিয়া ভুল হইতে পারে। কেহ কেহ হয়ত পঙ্কিল জলে মিষ্ট স্বাদ পাইতে পারেন, কিন্তু স্বাদের মিষ্টতা কোথা হইতে আসিল তাহার রহস্য অনাবিষ্কৃতই থাকে।

দেবদাস

তাই দেবদাস সরস তথ্যবিবৃতি, হৃদয়ের গভীরে অবগাহন নহে; নাটকের ভূমিকা, নাটক নহে। পার্বতীর দেবদাসের প্রতি ভালবাসা কর্তব্যবোধে সংশোধিত, 'রজনী'তে অমরনাথের প্রতি লবঙ্গলতার মনোভাবের অনুরূপ।

নাটকীয়তার সংঘাতময় ও সমারোহপূর্ণ আয়োজন হইয়াছে 'চরিত্রহীন'-এ (১৯১৭)। এই উপন্যাসে লেখকের অভিনব জীবন-অভিজ্ঞতার একটা অংশের সার-নির্যাস পরিবেশিত হইয়াছে। কিরণময়ীর মনস্বী বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া প্রেমের স্বরূপ-রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রেমের আত্মগোপনশীলতা কি অসাধারণ, কতরূপ ছদ্মবেশে ইহা মানব-সংসারে বিচরণ করে, বাঙালী পাঠকের নিকট সেই আশ্চর্য কাহিনী লেখক বিবৃত করিয়াছেন। হারানের প্রতি মনোভাবে একবিন্দু কোমলতাহীন কর্তব্যনিষ্ঠা, অনঙ্গ ডাক্তারের প্রতি আচরণে একান্ত নিরুপায়ের ছলনাভিনয়, দিবাকরকে আকৃষ্ট করার মধ্যে নৈরাশ্যের আঘাতপ্রাপ্ত প্রেমের মর্মান্তিক প্রতিঘাত—উপেন্দ্রের মর্মরশুভ্র ও মর্মর-কঠিন ব্যক্তিত্বের মধ্যে সুরবালার চক্ষু লইয়া অতর্কিতভাবে এই বহু-অন্বেষিত প্রেমের আবিষ্কার—প্রেম লইয়া কি বিচিত্র পরীক্ষাই না উপন্যাসটিতে চলিয়াছে! প্রখর বুদ্ধির অভিমানে, প্রেমে সার্থক হইবার যে প্রধান অবলম্বন—আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে আত্মসমর্পণ—তাহাই কিরণময়ীর ছিল না। হৃদয়াবেগের এই সূক্ষ্ম স্প্রিং-এ ঠিকমত দম দিতে না জানিয়া সে সমস্ত যন্ত্রটিই বিকল করিয়া ফেলিয়াছে। প্রেম-রহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রোহিণী গুলি খাইয়া মরিয়াছে। আর অতি-অভিজ্ঞ কিরণময়ী উন্মাদের পথে আত্মহত্যা বরণ করিয়াছে।

চরিত্রহীনের কিরণময়ী

সাবিত্রীর ভালবাসা কিরণময়ীর বিপরীতধর্মী। তাহার পূর্বজীবনের গোলমেলে ইতিহাস তাহার প্রেমাদর্শের উপর আলোকপাত করে না। সত্যকার প্রেম যখন আসে তখন সে নিজের অন্তরের আলোকে তাহার গন্তব্য পথকে সুনিরূপিত করে। সতীশের সম্বন্ধে সাবিত্রীর মনোভাবেরও যেমন কোন অনিশ্চয়তা ছিল না, তেমনি তাহার কি কর্তব্য সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। প্রেমের যে শাশ্বত আদর্শ ও বিশ্বজয়ী শক্তি জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রশস্তি লাভ করিয়া আসিতেছে, এক অশিক্ষিতা, কুৎসিত আবেষ্টনে অবস্থিতা মেসের ঝি তাহারই প্রসাদলাভে ধন্য হইয়াছে। উপন্যাসের ঘটনার সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতে, লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা ও নির্মম প্রত্যাখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে প্রেমের এই লীলারহস্য স্তরে স্তরে উন্মোচিত হইয়াছে। সাবিত্রীকে যে মুহূর্ত হইতে আমরা দেখি, সেই মুহূর্ত হইতে তাহার চরিত্রে ও

চরিত্রহীনের সাবিত্রী

আচরণে কোন অসঙ্গতি নাই, তাহার অবস্থার অনুপযোগী কোন আদর্শবাদ ও ভাবোচ্ছ্বাসের আতিশয্য ইহার মধ্যে কোন ছন্দপতন ঘটায় নাই। সরোজিনীর ভালবাসায় কোন জটিল স্ববিরোধ নাই; ইহা প্রেমাস্পদের চরম দোষ জানিয়াও তাহার প্রতি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

'দেনাপাওনা' (১৯২৩) ও 'দত্তা'য় (১৯২৪) প্রেমই হইল মূলকথা; তবে এই দুই উপন্যাসে যে বিশেষ পরিবেশে এই প্রেমের বিকাশ হইয়াছে তাহারও মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। জীবানন্দ ও ষোড়শীর ভালবাসা লাঞ্ছিত প্রেমের গৌরবময় পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাহিনী। একদিন বিবাহের অভিনয়ের পর জীবানন্দের স্ত্রী-ত্যাগ, তাহার ঘৃণিত চরিত্র, ষোড়শীর প্রতি তাহার রূঢ় আচরণ ও চণ্ডীগড়ের সম্পত্তি লইয়া বৈষয়িক বিরোধ; অপরদিকে ষোড়শীর ভৈরবী-জীবন ও স্বামী-সম্বন্ধে নিদারুণ ঘৃণা—দুইদিকের প্রবল বাধা সত্ত্বেও জীবানন্দের মত পাপিষ্ঠও ভালবাসার স্বাদ নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছে ও ষোড়শীর পূর্বসংস্কার ও জীবানন্দের প্রতি মমতা তাহার মনেও কিছুটা সাড়া জাগাইয়াছে। জীবানন্দের যে বে-পরোয়া দুঃসাহস তাহার পাপাসক্তিকে ইন্ধন যোগাইয়াছে তাহাই তাহার পরিশুদ্ধ প্রণয়-কামনার পিছনে অদম্য শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। আত্মাকে কলুষিত করায় ও আত্ম-সংশোধনে তাহার সমান জিদ। প্রৌঢ়া ষোড়শী তাহার সমস্ত দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মপ্রত্যয় লইয়াও এই নব আবির্ভাবকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। উহাদের মিলনে আমরা আবেশহীন প্রৌঢ় প্রেমের এক শক্তিমান পরিণত রূপ প্রত্যক্ষ করিলাম।

দেনাপাওনা

'দত্তা'-য় বিজয়ার সহিত নরেনের বৈষয়িক ও খানিকটা সংঘর্ষমূলক পরিচয় অনেক ভুল বোঝাবুঝি, ঈর্ষা-বিদ্বেষজনিত বাধা ও আত্মনিগ্রহের নিরুপায় নৈরাশ্য অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত সার্থক প্রেমে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু প্রেমই ইহার প্রধান কথা নহে। বিজয়ার চরিত্রের দৃঢ়তা পিতা কর্তৃক তথাকথিত বাগ্‌দানের মর্যাদারক্ষারূপ কর্তব্যের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া ও অবশেষে বাগ্‌দানের কথাটা যে মিথ্যা ইহা জানিয়া অন্য সমস্ত বাধার উপর জয়ী হইয়াছে। যাহারা প্রেমের সার্থক পরিণতির পথে বাধা দিয়াছে, সেই রাসবিহারী ও বিজয়ার বাগ্‌দত্ত বর বিলাসবিহারী—একজন তাহার কৌশলময়তা ও ধর্মনিষ্ঠার অপূর্ব অভিনয়ে ও অপরজন তাহার অনমনীয় এক-গুঁয়েমির জন্য—চরিত্রবৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। প্রেমিক হিসাবে নরেন নিতান্তই অসহায় ও দুর্বলচেতা। সুতরাং উপন্যাসটি শুধু প্রেম-কাহিনী নহে; ইহার

দত্তা

পটভূমিকায় যে অন্যান্য প্রধান চরিত্র স্থান পাইয়াছে তাহাদের তীব্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্যও ইহা প্রশংসনীয়।

শ্রীকান্ত (চারি পর্ব) শরৎচন্দ্রের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস। অনেকে ইহা আত্মজীবনমূলক মনে করেন। ইহার অনেক আখ্যান ও জীবন-অভিজ্ঞতার বহু অংশ যে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবন-সঞ্জাত এরূপ ধারণা অসঙ্গত

শ্রীকান্ত

নহে। এখানে শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর বাল্যপ্রণয় দীর্ঘ-বিস্মৃতির পর অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকান্তের প্রণয়লীলা নানা সূক্ষ্ম পরিবর্তনের স্তর বাহিয়া অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীকান্তের দিকে আত্মসম্ভ্রমবোধ ও দার্শনিকোচিত ঔদাসীন্য, একটা প্রকৃতিগত নিস্পৃহতা; রাজলক্ষ্মীর দিকে গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা, আচারগত শুচিতা ও ধর্মানুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি, কখনও কখনও শ্রীকান্তের নির্লিপ্ততার প্রতি অভিমান—এই প্রেমকে নিশ্চিন্ত আরাম ও নিশ্চল পূর্বানুস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়া ইহাকে মুহূর্তে মুহূর্তে এক নূতন সঙ্কটের সম্মুখীন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ঈর্ষ্যা, অধিকার হারাইবার ভয়ই রাজলক্ষ্মীর ধর্মের নেশা টুটাইয়া তাহাকে শ্রীকান্তের প্রতি নূতন করিয়া আগ্রহান্বিত করিয়াছে। সামগ্রিক আলোচনার পর মনে হয় যে এই প্রণয়ের ইতিহাসকে অযথা দীর্ঘায়িত করা হইয়াছে, ইহার সমস্যায় নূতন জালের সংযোজনা ইহাকে কোন সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া যায় নাই। লেখক হিসাবের চলতি খাতাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যই খোলা রাখিয়াছেন, 'নিজের হাতে গড়ি বিপদজাল নিজেই কাটিয়া তাহা' একপ্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীকান্তের প্রধান পরিচয় প্রেমিকরূপে নহে, জীবনের বিচিত্র রসের আস্বাদনকারী দার্শনিকরূপে। সে দরদী রসিকের দৃষ্টি ও প্রজ্ঞাশীল দর্শকের

শ্রীকান্তে শরৎ-চন্দ্রের জীবনভাষ্য

বিচারবুদ্ধি লইয়া জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়াছে। তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা সমাজের সুদূরতম প্রত্যন্ত-প্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। যাহাদের উপর সমাজ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল, যাহারা ভবঘুরে, নিষ্কর্মা জীবনকে খেয়ালখুশিমত কাটায় তাহাদিগকেই সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছে ও তাহাদের নিকট হইতেই জীবন সম্বন্ধে নানা আশ্চর্য তত্ত্ব আহরণ করিয়াছে। ইন্দ্রনাথের মত ডাংপিটে ছেলে, অন্নদাদিদির মত সমাজচ্যুতা নারী, বজ্রানন্দের মত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সুনন্দার মত কুলাচারে আস্থাহীন, কিন্তু অন্তরের প্রত্যয়ে অটল গৃহস্থবধূ, গহরের মত আত্মভোলা স্বভাব-কবি, কমললতার মত নিরাসক্ত সেবা-মাধুর্যের প্রতীক বৈষ্ণব-কন্যা—ইহারা

সকলেই শ্রীকান্তের অনুভূতি-ভাণ্ডারে নূতন ঐশ্বর্যের উপহার আনিয়াছে। তাহার শ্মশানের উপান্তে আত্মগত চিন্তা, আঁধারের রূপবর্ণনা, সুদূর ব্রহ্মদেশে বাংলার আচার-সংস্কারহীন মানবিক সম্পর্কের স্বাধীন বিকাশ, সন্ন্যাসীর তাঁবুতে ও বৈরাগীর আখড়ায় জীবনের ভারবর্জিত স্বচ্ছন্দগতি, তাহার নিজ মনের সমস্যা লইয়া আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণ—এই সমস্তের ভিতর দিয়া মানবজীবনরহস্যের কি গভীর ও বহুমুখী উপলব্ধি আমাদের অন্তরকে কানায় কানায় পূর্ণ করে! শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-পাঠের পর আমরা যেন নূতন চক্ষু দিয়া জীবনকে দেখিতে শিখি, আমাদের মনে অনুভূতির এক নূতন দ্বার খুলিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক ঐক্য নাই, ইহা যেন অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও উপলব্ধির শিথিল-গ্রথিত সমষ্টি; এক শ্রীকান্তের চরিত্রের মধ্য দিয়াই ইহারা ঐক্যবন্ধনে সংহত হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত'-ই শরৎচন্দ্রের জীবনভাষ্য।

গৃহদাহ

'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসই শরৎচন্দ্রের জীবন-সমস্যায় তীক্ষ্ণতম রূপায়ণ। ইহাতে আধুনিক মনের দোটানার মধ্যে পড়িয়া সিদ্ধান্তসংকট, দুই বিরোধী আকর্ষণের মধ্যে ইহার অসহায় দোলা মর্মান্তিকভাবে উদাহৃত হইয়াছে। অচলার নারী-হৃদয়ের উপর এই মন্থনদণ্ডের তীব্রতম ঘর্ষণ কাজ করিয়াছে। সে একবার মহিম, একবার সুরেশ এই উভয় বন্ধুর দিকে পর্যায়ক্রমে আকৃষ্ট হইয়াছে ও শেষ পর্যন্ত কে যে তাহার কাঙ্ক্ষিত সে সম্বন্ধে মন স্থির করিতে পারে নাই। মহিমের প্রতি তাহার মনোভাব ভালাবাসা না একনিষ্ঠতার অহমিকা, সুরেশের প্রতি তাহার আকর্ষণ পরাজিতের প্রতি সমবেদনা না দুরন্ত আবেগের নিকট আত্মসমর্পণ তাহা শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত থাকে। সুরেশের উন্মত্ত হঠকারিতা বাহিরের দিক হইতে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটাইয়াছে, কিন্তু অন্তরের বিমুখতাকে শান্ত করিতে পারে নাই। এই দ্বিধা-বিভক্ত মন লইয়া অচলা নিজেও সুখী হয় নাই, প্রতিযোগী প্রেমিকদের মধ্যেও কাহাকেও সুখী করিতে পারে নাই। তাহার মত শিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা সুরেশের অত্যাচারকে কেন নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিল, কেনই বা চিঠি লিখিয়া তাহার বাবাকে পর্যন্ত এই দুর্ঘটনার খবর দিতে পারিল না, সুরেশের ভ্রান্ত স্বামিপরিচয়কে নীরবতার দ্বারাই সমর্থন করিল ইহার রহস্যভেদ দুরূহ। এই দুর্বল ছলনার মধ্যে মিথ্যা সম্ভ্রমের মোহ ছাড়াও হয়ত সুরেশের দাবির মৌন স্বীকৃতি, তাহার অসংযমের জন্য নিজ দায়িত্ব-চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল; অচলার চিত্তদাহের এই ধিকিধিকি আগুনে মহিমের সংসারজীবন ভস্মসাৎ হইয়াছে,

ইহার বিস্ফোরক শক্তি সুরেশকেও নিশ্চিত মৃত্যুর আত্মাহুতিতে ঠেলিয়া দিয়াছে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র—মৃণাল, রামবাবু প্রভৃতি—পূর্ণভাবে জীবন্ত নহে—ইহারা অচলার বিপরীত আদর্শের প্রতীক। মৃণালের স্বামিপ্রেম একটা অবাস্তব আদর্শের আড়ম্বর, ইহা তাহার জীবনে পরীক্ষিত সত্য নয়। তাহার সেবাধর্মই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ। রামবাবুর অন্ধ সংস্কার অচলার সংস্কারহীনতার স্থূল প্রত্যুত্তর—ইহার প্রাণশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, কেবল আঘাতের অস্ত্র মাত্র। মহিম ও সুরেশ দুই তীরের ন্যায় অচলার দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ জীবনপ্রবাহকে ধরিয়া রাখিয়াছে। অচলা-চিত্তের স্ববিরোধই আধুনিক জীবনের একটা মর্মান্তিক, অনিবার্য প্রবণতারূপে সার্বভৌম সত্যের মর্যাদায় আসীন। সমাজ-নির্যাতনের কাহিনী ও হৃদয়াবেগের উপর উহার নিরোধমূলক প্রতিক্রিয়া (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' ও 'পল্লীসমাজ'-এ (১৯১৬) ও 'বামুনের মেয়ে'-তে (১৯২০), গভীর সহানুভূতি ও বেদনাবোধের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

'পথের দাবি'তে (১৯২৬) পরাধীন জাতির মর্মবেদনা ও বিপ্লববাদের মূলতত্ত্ব প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এ যেমন, 'পথের দাবি'তেও তেমনি সমাজ-জীবনের সহিত রাজনৈতিক আন্দোলনের নিগূঢ় যোগসূত্রটি দেখানো হয় নাই—সব্যসাচী, সুমিত্রা প্রভৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহাদের চরিত্র-রহস্য কেমন করিয়া রূপ পাইল তাহা আমাদের অজ্ঞাত থাকে। সন্ত্রাসবাদের এই রহস্যময় ও বিপদসংকুল আবহাওয়ায় অপূর্ব ও ভারতীর মধ্যে প্রেম-সম্পর্কটিই ঝোড়ো বাতাসে বিক্ষুব্ধ তরুণ চারার মতই সংকুচিত, অথচ অদম্য প্রাণশক্তিতে নিজ ডালপালা মেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদকে কখনই সুনজরে দেখেন নাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তাঁহার গভীর স্বদেশ প্রেম ও নিপীড়িত জাতির আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গোপন ষড়যন্ত্রের অপরিহার্যতা পরিস্ফুট হইয়াছে।

পথের দাবি

'শেষপ্রশ্ন'-এ (১৯৩১) লেখক এক নূতন জীবনদর্শনকে যাচাই করিতে চাহিয়াছেন। অতীতের প্রচলিত সংস্কার ও আদর্শনিষ্ঠা, নীতির দিক দিয়া ভাল হইলেও, আধুনিক যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাহারা যে অকেজো হইয়া পড়িয়াছে ও জীবনের সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী, প্রেমে যে ক্ষণিক আবেগ-তৃপ্তির অতিরিক্ত স্থায়িত্ব ও মূল্য নাই, স্বাদুতাই যে জীবনরসের উৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড—এই জাতীয় বৈপ্লবিক মতবাদ লেখক কমলের মুখ দিয়া প্রচার করিয়াছেন। বইখানিতে তাঁহার যুক্তির চমকপ্রদ

শেষপ্রশ্ন

মৌলিকতা, নূতন অনুভূতির চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-ছটা প্রকটিত হইলেও উপন্যাস হিসাবে ইহাকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া যায় না।

'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) পারিবারিক আচারনিষ্ঠার সহিত প্রেমের অকস্মাৎ-উচ্ছ্বসিত বিরোধের কাহিনী। ইহাতে কিন্তু পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা বিষয়ের সরলতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে ও প্রেমের অস্থিরমতিত্ব চরিত্রসঙ্গতিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। মুখুজ্যে-পরিবারের আভিজাত্য ও আদর্শনিষ্ঠার প্রতীক—বিপ্রদাস ও দয়াময়ী—সূক্ষ্মতর ব্যক্তিপরিচয়হীন। বন্দনার খালখেয়ালী আচরণ ও মুহুর্মুহু প্রেমিক-পরিবর্তন তাহার সুস্থতা সম্বন্ধেই সংশয় জানায়। বিশেষতঃ বন্দনার প্রেম ও মুখুজ্যে পরিবারের আদর্শ উভয়ই যেন অনেকটা অবাস্তব ও অসার। উহাদের মধ্যে সংঘর্ষ যেই দুই ছায়ামূর্তির লড়াই। উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে দ্বিজদাস সাধারণ দুর্বল মানুষ ও পারিবারিক আদর্শের নিকট সর্বদাই নিজ স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জন দিতে অভ্যস্ত। তাহার ব্যক্তিত্ব সর্বদাই পারিপার্শ্বিকের চাপে সঙ্কুচিত। সে বন্দনার প্রেমে সাড়া দিবে কি না তাহাও ঠিকমত জানে না। তথাপি সেই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র। বন্দনা চরিত্রের অতিরিক্ত খেয়ালিপনা বাদ দিলে তাহার মধ্যেও কিছু সূক্ষ্ম বৃত্তি ও প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। মোট কথা উপন্যাসটি সুলিখিত হইলেও পূর্বচর্বিত খাদ্যের ন্যায় অনেকটা নীরস মনে হয়।

বিপ্রদাস

'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯) শরৎচন্দ্রের শেষ অসম্পূর্ণ উপন্যাস—শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবীর দ্বারা ইহার বাকী অংশটুকু সংযোজিত। পূর্ব-পরিকল্পনার সহিত এই সংযোজনার ত্রুটিহীন সামঞ্জস্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ইহার নায়িকা, সবিতা স্বামীর আশ্রয়ত্যাগিনী, ও পুরুষান্তরাশ্রয়িণী হইয়াও তাঁহার চরিত্রের মর্যাদা ও সুকোমল বৃত্তিগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যে রমণীবাবুর মোহে তিনি কলঙ্কিনী হইয়াছেন তাহার আকর্ষণীয় কোন গুণ চোখে পড়ে না। পতনের পূর্বে সবিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চিত্তবিভ্রমেরও কোন পরিচয় নাই। ধর্মভ্রষ্ট হইবার পরে তাঁহার মনে যে অনুতাপের তুষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, স্বামী ও কন্যার প্রতি তাঁহার যে নিরুপায় স্নেহ ও কর্তব্যবোধ তাঁহাকে অহরহ পীড়িত করিয়াছে তাহাই তাঁহার অন্তরের পরিচয় দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বিমলবাবু নামে একজন বিপত্নীক ভদ্রলোকের নিরুত্তাপ হিতৈষণা ও সহজ ভদ্রতার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সবিতা তাহার সঙ্গে একটা মৃদু হৃদয়াবেগের সম্পর্ক গড়িয়া তোলার বাসনা পোষণ করিয়াছেন। এই প্রেম ছদ্মবেশী বন্ধুত্ব ছাড়া

শেষের পরিচয়

আর কিছু নহে। এই তৃতীয়-সম্পর্ক-গঠন-বাসনাতেই সবিতার শেষ পরিচয় ও উপন্যাসের নামকরণরহস্য।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রাখাল ও তারকের বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত ঈর্ষ্যাবিকৃত হইয়া মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। সারদা শরৎচন্দ্রের বহুধা-পুনরাবৃত্ত প্রেম-মহিমামণ্ডিতা অসতী রমণী। ব্রজবাবু সরল, আত্মভোলা ও গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠ মানুষ—তিনি কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে ক্ষমা করিয়াছেন। কন্যার মৃত্যুর পর সেবার অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে পুনর্গ্রহণ করেন নাই। কন্যা রেণু অভিমানে ও অবিচারের বেদনায় তাহার মাতার দিক হইতে আপনার মনকে সম্পূর্ণভাবে ফিরাইয়া লইয়াছে—তাহার নির্মম নীতিবোধ ক্ষমার পথকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করিয়াছে। মোটের উপর, উপন্যাসটি পুরাতন সুরের পুনরাবৃত্তি হইলেও এবং প্রধান সমস্যাকে এড়াইয়া পার্শ্ব-সমস্যার প্রতি মনোযোগী হইলেও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার অন্তিম সুরের অযোগ্য প্রতিনিধি নহে।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প সংখ্যায় অপ্রচুর ও দুই-একটি ছাড়া উহা সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। তাঁহার উপন্যাস আমাদের মানস মুক্তি সম্পাদন করিয়া, আমাদের সমাজ চেতনা ও ন্যায়-অন্যায়-বোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া, আমাদের মনোজগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, প্রখরব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মসচেতন নর-নারীর সৃষ্টি করিয়া, বর্তমান যুগের জীবন-যাত্রার সমস্যা-জর্জরিত, বেদনাময় রূপটি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে একেবারে সমগ্রজগদ্ব্যাপী আধুনিকতার কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে বাহিরের আলোকে ঘরের কথা বুঝিতে শিখাইয়াছেন, আমাদিগকে আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের মধ্যে একদিকে উপনিষদ-চেতনা, অন্যদিকে বিশ্ববোধ—এই দুই বিপরীত সীমার মধ্যে আমাদের অনুভূতিকে প্রসারিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে সমস্যার তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ধ্যানলোকের তন্ময়তার এক আশ্চর্য ও সময় সময় বিসদৃশ সম্মিলন ঘটিয়াছে। শরৎচন্দ্র আমাদের জীবনসমুদ্র মন্থন করিয়া উহার বিষ ও অমৃত একসঙ্গে আমাদের ওষ্ঠে তুলিয়া ধরিয়াছেন ও অভ্যস্ত জীবনের আরাম-শ্লথ পরিবেশ হইতে বিচ্যুত করিয়া নূতন জীবনসমন্বয়ের দুরূহ কার্যে আমাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন। বাংলার অতি-আধুনিক জীবনযাত্রা ও উপন্যাস-সাহিত্য তাঁহারই পথনির্দেশের ধারানুসরণে তাঁহার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া আরও নূতনতর পরীক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প

চতুর্থ অধ্যায়

কাব্য ও কবিতা

১

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার প্রাচীন কাব্য-ধারা নিঃশেষিত হইল। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও যাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাহা তাঁহার অতীতের অনুস্মৃতি নহে, ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শের পূর্বেই তাঁহার মনে যে বস্তু-সচেতনতা, যে তির্যক প্রকাশভঙ্গী ও ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি, কল্পনার নূতন ক্রীড়াশীলতা ও ছন্দের যে নূতন পরীক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল তাহাই বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিতবাহী। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা শুষ্কপ্রায়; শাক্ত পদাবলীর অচিরোদ্ভূত প্রেরণাও যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না তাহার লক্ষণও সুপরিস্ফুট। যুগের পরিবর্তনশীল হাওয়ায় কবিচেতনাকে এমন নাড়া দিয়াছে যে উহার পক্ষে অতীতের আত্মতৃপ্ত ও নিঃসংশয় পুনরাবৃত্তি আর সম্ভব হইল না।

ভারতচন্দ্রে ভাবী যুগের পূর্বাভাস

এই যুগে কবিয়ালদের উদ্ভব হইয়াছে—কবিগানই এই যুগের প্রধান নূতন সৃষ্টি। ইহার মধ্যে প্রাচীন যুগের আদিরস ও ভক্তিরসের সংমিশ্রণ ঘটিলেও, বিদ্যাসুন্দর, রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ও শক্তিপূজার প্রাকৃতজনোচিত রুচিহীন রূপান্তর ও বিচ্ছিন্ন সুরের প্রতিধ্বনি অনুভূত হইলেও, ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে এতাবৎ অভিজাত-সংস্কৃতি ও আনুষ্ঠানিক ধর্মসাধনার দ্বারা সুরক্ষিত কাব্যের গণ্ডীর মধ্যে গণজীবনের অসংস্কৃত স্বভাবধর্মের অনুপ্রবেশ ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষীণ আবরণে বাস্তবজীবনের আকৃতির ক্রমস্ফুরণ। দীর্ঘ দিন ধরিয়া অনুশীলিত পুরাণসম্মত ভক্তিবাদ যে নিরক্ষর জনসাধারণের চিত্তকে রসসিঞ্চিত করিয়া তাহাদের কণ্ঠের সুরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কবিগানের মধ্যে তাহারই নিদর্শন। ইহা ঠিক লোক-সাহিত্য না হইলেও অভিজাত-সাহিত্যের লৌকিক সংস্করণ। পৌরাণিক সংস্কৃতির অত্যন্ত ব্যাপক প্রসারের ফলেই ইহা গণচেতনায় কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় ইহার অতীতাশ্রয়ী ভাব নহে, ইহার ভবিষ্যৎ তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যানুভূতির সার্বভৌম প্রসার ও সাধারণ মানুষের বোধোপযোগী

কবিগানে বাস্তবতার সুর

প্রকাশরীতি। কবিওয়ালাদের সকলেই অশিক্ষিত ছিল ও সকলেই আসরের মধ্যে বসিয়া প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তরস্বরূপ মুখে মুখে গান বাঁধিত, আমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কবিওয়ালারা—যথা, গোঁজলা গুঁই, কেষ্ট মুচি, এণ্টনি ফিরিঙ্গি—হয়ত অশিক্ষিত ছিল ও স্বভাব-কবিত্বের বলেই কবিতা রচনা করিত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণসম্ভূত কবিওয়ালাগণ—যেমন রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি—নিশ্চয় অক্ষরজ্ঞান-বর্জিত ছিলেন না ও তাঁহাদের কবিত্বশক্তি সাহিত্যরুচির দ্বারা কিছুটা মার্জিত ছিল। আর যে সমস্ত প্রসিদ্ধ কবিগান বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে তাহারা আসরে গীত হইলেও কাব্যসাধনার নিভৃত আত্মচিন্তার অনুকূল অবসরে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কবিগানে মানবিক প্রেমের অনুভূতি

কবিগানে আধুনিকতার আর একটি লক্ষণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বেনামিতে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন মানবিক প্রেমের অনুভূতি ও প্রকাশ। মনে হয় যে কৌলীন্যপ্রথা-বিড়ম্বিত সমাজজীবনে যে অবরুদ্ধ প্রেমের করুণ আর্তি হৃদয়ের তলে গুমরাইয়া মরিতেছিল, তাহাই এই সমস্ত পল্লীকবির বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবসাধনার প্রচলিত রস ও রীতির কৃত্রিম আবরণ ভেদ করিয়া বাস্তব-জীবনসম্ভূত হৃদয়বেদনাই এই গানের মধ্যে অনিবার্য ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রামনিধি গুপ্তের টপ্পাসঙ্গীত শুধু যে সুরের দিক দিয়া অভিনব তাহা নয়, ইহার মধ্যে বাঙালী চিত্তে বিরহমিলন-মান-অভিমানে বিচিত্র প্রেমচেতনার বাস্তব স্ফুরণের প্রমাণ মিলে। ইহা ছাড়াও কবিগানের মধ্যে অনেক সমসাময়িক ঘটনার ব্যঙ্গাত্মক উল্লেখ দেখা যায়—ইহাতেও মনে হয় যে কবি-কল্পনা কাব্যের সুনির্দিষ্ট বিষয়-পরিধি অতিক্রম করিয়া জীবনের প্রত্যক্ষ প্রবাহ হইতে প্রেরণা আহরণ করিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইতেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমাজ-সচেতনতা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) যুগসন্ধিক্ষণের কবি ও ইহার রুচিনিয়ামক। তাঁহার কবিতায় মধ্য ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রণধারাটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। তিনি শুধু কবি ছিলেন না, 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর সম্পাদকরূপে তিনি সাহিত্যসমালোচনা, কবিয়ালদের জীবনী ও কবিতাসংগ্রহ, সমাজ ও ধর্মনীতি-বিষয়ক সমসাময়িক ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিচিত্ররূপ মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাব্য ও সাংবাদিকতা—উভয় ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতা, বাস্তব জীবনের সহিত গভীর পরিচয়ের নিদর্শন মিলে। এই দিক দিয়া তাঁহার মনোধর্ম

আধুনিক হইলেও তাঁহার কবিতার অনেক স্থলেই তিনি কবিয়ালদের বিশিষ্ট ভঙ্গীর অনুবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গ-প্রবণতা, কৌতুকরসসৃষ্টির দিকে বিশেষ ঝোঁক, অনুপ্রাস-যমকের আতিশয্যে চমক লাগাইবার প্রয়াস, তাঁহার উচ্চকণ্ঠ হাসিহল্লা—এ সবই কবিয়ালদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রমাণ। তিনি যখন 'পাঁঠা', 'তপ্‌সে মাছ' বা 'আনারস' লইয়া ভোজ্যরসের কবিতা লেখেন, তখন তিনি মূলতঃ কবিয়ালদের ভাবে অনুপ্রাণিত, তাহাদেরই জীবনদৃষ্টির অনুসারী। কিন্তু কবিয়ালদের অসংলগ্ন, শিল্পবোধহীন রচনাকে তিনি তাঁহার মনীষা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রয়োগে উন্নত শিল্পপর্যায়ে উঠাইয়াছেন। তাঁহার পূর্বে মুকুন্দরাম, এমন কি বৈষ্ণবসাধনায় নিবিষ্টচিত্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাদের কবিতার মধ্যে সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যের সরস বর্ণনা দিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কোন কবি ভোজন-বিলাস লইয়া কবিতা রচনা করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন। তা ছাড়া বাংলা দেশের ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা-ও-আকাঙ্ক্ষা-বিড়ম্বিত গার্হস্থ্য জীবন ও ইহার কলহপরায়ণা, স্থূলরুচি, রন্ধন ও ঢেঁকিশালার কুশ্রী পরিবেশে অধিষ্ঠিতা বঙ্গনারীর ব্যঙ্গ-চিত্র বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় শেষবারের মত অঙ্কিত হইয়াছে। এই যুগের পর নারী সম্বন্ধে আমাদের কাব্য-মনোভাব রোমান্টিক প্রশস্তির পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের মনোধর্মের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে শেষ খাঁটি বাঙালী কবিরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

ইংরাজীর গঠনমূলক প্রভাব—ঈশ্বর গুপ্তে অস্বীকৃত

কিন্তু তাঁহার কবিজীবনের আর একটি দিক আছে, যেখানে তিনি ইংরেজ শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙালী সমাজে যে আলোড়ন জাগিয়াছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। একদিক দিয়া বলা যায় যে তাঁহার খাঁটি বাঙালীসুলভ গুণগুলিরও বিকাশ হইয়াছে বাংলা-সমাজের এই পরিবর্তনের স্রোতে চঞ্চল, হাস্যকর অসঙ্গতিপূর্ণ প্রতি-বেশের অভিঘাতে; ইংরেজ ও ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে আমাদের চিরাভ্যস্ত সমাজপ্রথা ও রীতি-নীতির বিপর্যয় তাঁহার যে ব্যঙ্গাত্মক বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহাই তিনি আমাদের দেশী জীবনেরও অসঙ্গতির প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনোভঙ্গী স্বভাবতই শ্লেষ-প্রবণ ছিল বলিয়াই তিনি এই বৈদেশিক প্রভাবের অভাবাত্মক দিকটাই লক্ষ্য করিয়াছেন; উহার বিশৃঙ্খলতা ও রুচিবিকারের অন্তরালে যে গভীরতর সংশ্লেষ-মূলক গঠনকার্য চলিতেছিল তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন। সেইজন্য

আমরা তাঁহার কবিতায় হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-প্রহসনেরই প্রাধান্য দেখি, অপর দিকের সন্ধানই পাই না। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়াও বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ পরিণতি হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি যে পথে বাঙালীর জীবনস্রোতকে প্রবাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন উহা সে পথে না চলিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত পথই অবলম্বন করিয়াছে। বিদেশী সুরার তীব্র ঝাঁজ ও উগ্র স্বাদ যে কালক্রমে বিশুদ্ধ মধুর রসে পরিণত হইয়া বাঙালীর জীবনসঞ্চিত অমৃতের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া যাইবে ইহা অনুমান করিবার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তাই এই যুগের বাঙালীর প্রতিনিধি-কবি পরবর্তী যুগে একক ব্যতিক্রমে পর্যবসিত হইয়াছেন—আধুনিক কাব্যধারার প্রবর্তক না হইয়া ইহার গতিরোধের ব্যর্থপ্রয়াসের নায়করূপেই সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৬) সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধক কাব্যে পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিক কবি-কল্পনা প্রয়োগ করিয়া আধুনিক কবিতার সৃষ্টি করিলেন।

রঙ্গলালের রোমাণ্টিক দেশাত্মবোধ

তাঁহার 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮) 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) ও 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) এই নূতন কাব্যধারার সার্থক নিদর্শন। রাজপুত-ইতিহাস ও উড়িষ্যার ধর্মমূলক কিংবদন্তী হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি গীতি-উচ্ছ্বাসময় ভাষায় ও শৌর্যদৃপ্ত ভঙ্গীতে এই কাব্যগুলি রচনা করিয়া বাংলা কাব্যের মোড় ফিরাইয়া দিলেন ও নূতন বিষয়ের সহিত অভিনব কাব্যরীতির সংযোগে যে গতানুগতিকতার গ্লানিমুক্ত কবিতা রচনা করা যায় তাহা প্রমাণ করিলেন। তাঁহার ভাষা অনেকটা ঈশ্বর গুপ্ত-প্রভাবিত ও ক্লাসিক্যাল রীতির সংযম ও গাঢ়বদ্ধতায় মননপ্রধান হইলেও উদ্দীপনাময় আবেগসঞ্চারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তবে গীতিকবিতার অন্তর্মুখী নিগূঢ়তা ও ছন্দোবৈচিত্র্য তাঁহার রচনায় দুর্লভ; প্রবহমান পয়ারছন্দে আখ্যান-কাব্যের ওজস্বী ভাবপ্রকাশেই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব। মধ্যযুগের দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের গণ্ডী হইতে আধুনিক যুগের বিস্তৃততর কাব্য-পরিধিতে উত্তরণের দিকে রঙ্গলাল অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন ও কাব্যের বন্ধনমুক্তিবিষয়ে তাঁহার আংশিক সাফল্য যে তাঁহার পরবর্তী কবি মধুসূদন দত্তকে তাঁহার মৌলিক পথ-আবিষ্কারে অনেকখানি উৎসাহিত করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

২

প্রকৃতপক্ষে **মাইকেল মধুসূদন দত্তই** (১৮২৪—১৮৭৩) নব যুগের বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই প্রথম দেশীয় বিষয়বস্তুর কাব্যোপস্থাপনায় পাশ্চাত্ত্য কবি-কল্পনার বিশেষ রীতিটির সার্থক প্রয়োগ করিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহার সবদিক দিয়াই অনন্যসাধারণ যোগ্যতা ছিল। কি অন্তঃপ্রকৃতিতে, কি মানস-অনুশীলনে ও জ্ঞান-চর্চায় তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়-স্থাপনের জন্য যেন দৈব-প্রেরিত ভাগ্যবিধাতা-রূপেই বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার দোষ ও গুণ, তাঁহার শক্তি ও দুর্বলতা, তাঁহার অস্থিরমতিত্ব ও স্থির সাধনা, তাঁহার ভোগবিলাস ও আদর্শনিষ্ঠা সবই একযোগে তাঁহাকে বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়-সিদ্ধির বাহনরূপে নির্মাণ করিয়াছিল। সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-কলেজের অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় তিনি ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের রস আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন, ও প্রাচীন সমাজপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রতি তাঁহার এই গভীর অনুরাগ ও সমাজ বিদ্রোহপ্রবণতা শুধু ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠীর একটা সাধারণ চিত্তচাঞ্চল্য ও সমাজশাসন-অসহিষ্ণুতার পর্যায়ভুক্ত ছিল না। ইহা প্রতিভাশালীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মর্মমূল হইতে উৎসারিত ছিল। ইহা শুধু সমাজপ্রথাকে ভঙ্গ করিয়া ও ধর্মজীবনে স্বাধীনতার দাবি করিয়াই সুলভ তৃপ্তিলাভ করে নাই। মধুসূদনের অতৃপ্তি ও অস্বস্তির মূলে এমন একটা দুর্বার বেগ ছিল, আত্মকেন্দ্রিক জীবনের এমন একটা নিগূঢ়-রহস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক প্রেরণা ছিল যে ইহা তাঁহাকে কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় সমস্ত নিয়মবন্ধন, সমস্ত অভ্যস্ত আবর্তনচক্র হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। প্রতিভার এত বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, এত অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণের নিরঙ্কুশ দাবির, সমস্ত পরিমিতিবোধের এত সামগ্রিক অস্বীকৃতি লইয়া বাঙালী সমাজে আর কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। সমাজ-সংস্কারক এক আদর্শ ত্যাগ করিয়া অপর এক উচ্চতর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, এক সমাজপ্রথার বশ্যতা অস্বীকার করিয়া উদারতর, মুক্ততর প্রথার বশীভূত হইয়াছেন, হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্মে আশ্রয় লইয়াছেন, পরিবার-নির্দিষ্ট পাত্রীর পরিবর্তে স্বয়ং-নির্বাচিত প্রণয়িনীকে গ্রহণের দাবি জানাইয়াছেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহার কবিধর্মের অনির্দেশ্য ও দ্রুত-পরিবর্তনশীল প্রয়োজনবোধ ছাড়া আর কোনও মানদণ্ডে তাঁহার জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে রাজী হন নাই। তাঁহার পিতামাতার আশ্রয় ও পিতৃপুরুষের ধর্মত্যাগ, খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণ ও ইউরোপীয় মহিলা-

আধুনিক কাব্য-প্রতিষ্ঠায় মধুসূদনের অধিকার

বিবাহ, তাঁহার ভোগবিলাসের আতিশয্য ও অমিতব্যয়িতার জন্য দারিদ্র্যবরণ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে না পারার জন্য অবিরত অশান্তিভোগ—এসবই তাঁহার মহাকবি হওয়ার জন্য আয়োজন ও প্রস্তুতি, দেশীয় শিরা-ধমনীতে পাশ্চাত্ত্যের উষ্ণ-রক্ত-সঞ্চারের জন্য যন্ত্রণা ও অস্ত্রোপচার। কোন কবি এরূপভাবে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া কাব্যসরস্বতীর চরণে রক্তপদ্মের ন্যায় উপহার দেন নাই। মধুসূদন শুধু প্রতিভায় নয়, শুধু বিরাট ও বহুমুখী জ্ঞানার্জনে নয়, তাঁহার সমগ্র জীবনসাধনার মধ্য দিয়া, এই নব কাব্যসৃষ্টির জন্য সর্বতোমুখী আত্মনিয়োজনের প্রয়োজন তাহার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

মধুসূদনের আত্মপ্রত্যয় ও বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসংশয় শ্রদ্ধা

কিন্তু যদিও এই কাব্যসাধনার জন্য মধুসূদনের জীবনব্যাপী প্রস্তুতি ছিল, তথাপি আকস্মিকতার অঙ্গুলিস্পর্শেই তাঁহার কাব্যরচনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব লইয়াই কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার যেমন আত্মশক্তিতে অসীম প্রত্যয় ছিল, তেমনি বাংলা ভাষার শক্তি সম্বন্ধেও অগাধ আস্থা ছিল। মধুসূদনের যুগে মহাকাব্য-রচনাই ভাষার শ্রেষ্ঠ মর্যাদালাভের একমাত্র উপায় ও পরীক্ষাস্থল বলিয়া বিবেচিত হইত। সেইজন্য তিনি যখন বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন স্থির করিলেন, তখন তিনি হোমার, ভার্জিল, ডাণ্টে, ট্যাসো, এরিয়স্টো প্রভৃতি বিদেশী এবং ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি দেশীয় মহাকবিদের রচনার প্রতিস্পর্ধী মহাকাব্য-রচনার দুঃসাহসিক কল্পনাকেই রূপ দিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্বে বাংলা নাটকের দুরবস্থা তাঁহার সুপ্ত প্রতিভার উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছিল—তিনি সপ্তাহের মধ্যে যুগোপযোগী, আধুনিকতার লক্ষণ-সম্পন্ন নাটক-রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা সগৌরবে পালন করিলেন। আবার বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাজী রাখিয়াই তিনি বাংলার প্রথম মহাকাব্য 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্য-রচনায় ব্রতী হইলেন। এইরূপ উদাত্ত ভাষাগৌরব ও ধ্বনিগাম্ভীর্য-সমন্বিত, অন্ত্যমিলনহীন, অথচ অন্তশ্ছন্দঃস্পন্দের বিচিত্র প্রবাহের দ্বারা গীতোচ্ছ্বাস-ময় কবিতার জন্য দেশের কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। ইহার জন্ম মধুসূদনের পাশ্চাত্ত্য-কাব্যপুষ্ট, প্রতিবেশনিরপেক্ষ একক কল্পনার মধ্যে। কবিপ্রতিভার সহিত সমকালীন কাব্যরুচির এরূপ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করিবার শক্তি তিনি নিজ অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেই পাইয়াছিলেন।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য (১৮৬০) মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার প্রথম গৌরবময় পরীক্ষামূলক নিদর্শন হইলেও ইহা বিদগ্ধ সমাজের রুচিবিরোধ সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে নাই। ইহার আবির্ভাবে প্রশংসা অপেক্ষা বিস্ময়েরই পরিমাণ ছিল বেশী। ইহাতে নব-পরীক্ষিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের আড়ষ্টতা ও পয়ার-অনুকৃতির একঘেয়েমি সম্পূর্ণ কাটে নাই। বিশেষতঃ ইহা মহাভারতের সুন্দ-উপসুন্দ-কাহিনীরূপ এক অখ্যাত আখ্যান-অবলম্বনে রচিত। ইহার কোন সার্বভৌম যুগোচিত বা যুগাতিশায়ী ভাব তাৎপর্য ছিল না। সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালী ইহার মধ্যে নিজ মানস অভীপ্সার প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় নাই। ইহার শব্দধ্বনিসমারোহ ও ছন্দকুশলতার পিছনে কোন প্রাণচঞ্চল জাতীয় আকাঙ্ক্ষার আলোড়ন জীবনাবেগের উত্তপ্ত রক্ত-প্রবাহ সঞ্চারিত করে নাই। ইহার মধ্যে ছন্দ ও ভাষাশিল্পীর কারুকার্য আছে, জীবনবোধের সূক্ষ্মতর আবেদন নাই। মধুসূদনের মনে তিলোত্তমার অপরূপ রূপোচ্ছলতা যে মোহ বিস্তার করিয়াছিল তাহাই কাব্যের মুখ্য আবেদন—অথচ এই দেহ-লাবণ্য রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'র মত কোন অমূর্ত ভাবব্যঞ্জনা-সংযোগে দেহাতীত স্তরে উন্নীত হয় নাই। প্রকৃতি-বর্ণনায়ও কবির কৃতিত্ব প্রশংসার্হ। কিন্তু সৌন্দর্যদর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত দুই অসুর-ভ্রাতার ভ্রাতৃবিরোধ নিছক বর্ণনাই রহিয়া গিয়াছে—যুগচেতনায় কোন বিশিষ্ট তাৎপর্যবাহী হইয়া উঠে নাই। 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এ মহাকাব্যের বহিরাঙ্গিকের সহিত অন্তঃপ্রেরণার কোন সার্থক সমন্বয় হয় নাই।

তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য

'মেঘনাদবধ' কাব্যে (১৮৬১) মহাকাব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ অনবদ্যভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। উদাত্ত ভাষণ, ছন্দ-নির্মিতি-কৌশল ও মানবিক রসবৈচিত্র্যের দিক দিয়া 'মেঘনাদবধ' 'তিলোত্তমাসম্ভব' অপেক্ষা অনেকখানি অগ্রসর। রাবণ কর্তৃক সীতা-অপহরণ ও রামের সীতা-উদ্ধারের উদ্যম বাঙালীর নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত ও উহার চিত্তে এক শাশ্বত রসসংস্কারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজেই বিষয়বস্তুর দিক দিয়া মহাকাব্যটি বাঙালী পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তদাক্ষিণ্য দাবি করে। মধুসূদন রাম-রাবণের যুদ্ধের মধ্যে এক যুগ-চেতনা-আকাঙ্ক্ষিত নূতন তাৎপর্য সন্নিবেশ করিয়া ইহার আবেদন আরও ঘনীভূত করিয়াছেন। বাল্মীকি রামচন্দ্রকে নরচন্দ্রমারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন; কৃত্তিবাস উঁহাকে অবতাররূপে কল্পনা করিয়া উঁহার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও ভক্তিরসোচ্ছলতায় উঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া

মেঘনাদবধ-কাব্যে যুগাদর্শ

যুগপ্রয়োজনের দাবি মিটাইয়াছেন। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস উভয়ের নিকট রাম-রাবণের যুদ্ধ ধর্ম ও অধর্ম, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সংগ্রাম; এই সংগ্রামে রাবণের প্রতি যে সহানুভূতি জাগিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনাতীত ছিল। এই যুদ্ধ যে কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে আততায়ীর বিরুদ্ধে জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্যাদা ও ভাবাদর্শ লাভ করিতে পারে তাহাও তাঁহারা মনে করেন নাই। কিন্তু মধুসূদনের রচনায় যুগমানসের বিশেষ অভিলাষটি, যুগচেতনার কাম্যতম স্পন্দনটি স্ফুরিত হইয়া ইহাকে প্রকৃত মহাকাব্যের গৌরব দিয়াছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এর যে অভাবের জন্য ইহা শিল্পশালা হইতে জীবনবেদীতে উন্নীত হইতে পারে নাই, 'মেঘনাদবধ'-এ সেই অভাব পূর্ণ হইয়া ইহা জাতির সর্বজনীন জীবনবোধের উপর আশ্রয়লাভ করিয়াছে।

রাম ও রাবণ দুই আদর্শের প্রতীক

অবশ্য রাম-রাবণ-যুদ্ধের যে ঐতিহ্যগত ভাবাদর্শ তাহাকে মধুসূদন অস্বীকার করেন নাই। গৌড়জনের সুধাপানের জন্য তিনি মধুচক্র-রচনার সংকল্প পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি যে পূর্বতন ও সর্বজন-আস্বাদ্য মধুসঞ্চয়কে সম্পূর্ণভাবে নিংড়াইয়া ফেলিয়া সেই শূন্য ভাণ্ডারে আধুনিক যুগের সুরাসার রক্ষা করিবেন ইহা তাঁহার কাব্যের মূলগত উদ্দেশ্যেরই বিরোধী। তিনি রামসীতার চরিত্র-মহিমা, রামের বিনয়মণ্ডিত, করুণার্দ্র স্বভাব ও সীতার দুঃখদহনে শুচিস্নাত, অনুপম সারল্য, পতিপ্রেম ও ভাব-সৌকুমার্য গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার মুখে তিনি রাবণের প্রতি যে অভিযোগ ধ্বনিত করিয়াছেন ও চতুর্থ সর্গে সীতার অরণ্যবাসের যে আরণ্য প্রকৃতির সহিত একাত্ম, ক্রীড়াশীল কল্পনার মনোহর চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতেই নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হয় যে হিন্দুর সনাতন সংস্কারের মর্যাদাহানি করা তাঁহার একেবারেই অভিপ্রায় ছিল না। তিনি রামকে ছোট করিয়া রাবণকে বড় করেন নাই। কিন্তু রাবণের যে একটা মহত্ত্ব আছে, সে যে নিছক পাপের প্রতিমূর্তি নহে, সেও যে এক গৌরবময় আদর্শের প্রতীক ইহাও তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ রাম-রাবণের সংঘর্ষ যে একেবারে পাপ ও পুণ্যের বিরোধ নহে, পরন্তু দুই বিরোধী আদর্শের দ্বন্দ্ব ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া তিনি সমস্ত সংগ্রামটিকেই উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। রাক্ষসকুলেও যে রাবণের মত নিয়তি-নির্যাতনের নিকট অপরাজেয় চরিত্র, ইন্দ্রজিতের মত দেশপ্রেমিক বীর, প্রমীলার মত আদর্শ পাতিব্রতা বীরনারী জন্মিতে পারে, তাহারাও যে সুনিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দাঁড়াইয়া মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, নিজপক্ষের নৈতিক

দুর্বলতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-সংগ্রামের পবিত্রব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য সর্বস্ব পণ করিতে পারে, রামের প্রতি সহানুভূতির মাত্রা না কমাইয়া রাক্ষসগোষ্ঠীর এই মহনীয় দিকটা দেখান যে শুধু সম্ভব নহে, অপক্ষপাত বিচারে অপরিহার্য, কবি ইহাই দেখাইয়াছেন। এখানে রাক্ষসচরিত্রের উপর ইলিয়ডের ট্রয়-যোদ্ধাদের ছায়াপাত হইয়াছে, যদিও হেলেন স্বেচ্ছায় কুলত্যাগিনী আর সীতা বলপ্রয়োগে অপহৃতা হওয়ায় এই সমীকরণের নীতির দিক দিয়া বিশেষ যৌক্তিকতা নাই। গ্রীক দেব-দেবীর অনুকরণে 'মেঘনাদবধ'-এর দেবসমাজের খানিকটা নৈতিক অধোগতি ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রামচরিত্রের সনাতন মহিমা অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। সমসাময়িক যুগে রামের নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা রাবণের দৈবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য সংগ্রামের অধিকতর উপযোগিতা ও প্রবলতর আবেদন আছে বলিয়া মধুসূদন ইহারই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে রামের প্রতি সহানুভূতির অভাব প্রকাশ পায় নাই।

মহাকাব্যের সংগঠনে মধুসূদনের পরিমিতিবোধ

মহাকাব্যের সার্থক রচনা যুগমানসের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও কয়েকটি বিরল গুণের একাঙ্গিক (organic) সমাবেশের উপর নির্ভরশীল। যে বিরাট পটভূমিকার মধ্যে উহার ঘটনাবিন্যাস করিতে হয় তাহাকে পূর্বতন ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, আখ্যান-কিংবদন্তী, ধর্মবোধ ও সমাজচেতনার সমবায়ে গঠন করা প্রয়োজন। সুতরাং অতীত ইতিহাসের সহিত ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ পরিচয়, কল্পনার দিগন্তব্যাপী প্রসার, ভাবসমুন্নতি-সৃষ্টির জন্য অতীতের বিচিত্র-উপাদান-গঠিত প্রাণসত্তার এক বিশাল-আয়তন-ব্যাপ্ত, সহজ সম্প্রসারণ—মহাকাব্য-রচয়িতার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় গুণ। প্রকাণ্ড প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের উপর প্রসারিত অসীম নীলাকাশের ন্যায় মহাকাব্য-বর্ণিত আখ্যায়িকার উর্ধ্বতন বায়ুস্তরে যেন জাতীয় জীবনের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা স্থির-স্তব্ধভাবে আসীন এইরূপ অনুভূতি জাগাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই পরিধির বিশালতা ও কল্পনা-প্রসারের উপযোগী উদাত্ত প্রকাশরীতির উপর সহজ, অস্খলিত অধিকার থাকা চাই। এই মহিমান্বিত, উর্ধ্বচারী প্রকাশের জন্য যেমন চাই সুপ্রযুক্ত শিল্পকৌশল ও শব্দনির্বাচনের বিশিষ্ট আভিজাত্যপ্রধান ভঙ্গী, তেমনি চাই অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত সমুন্নতি। শুধু শিল্পকলা আনিবে নিষ্প্রাণ আলঙ্কারিক স্ফীতি; আর অলঙ্কারবর্জিত শুষ্ক অনুভূতি, যতই অকৃত্রিম হউক, আনিবে মহাকাব্যের মর্যাদাহীন সাধারণ কাব্যের ভাষা। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন কাব্যের তুলনায় মহাকাব্যে থাকিবে সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিবর্তে বড় তুলির টানে আঁকা একপ্রকার

প্রশস্ত, সাধারণীকৃত রং ও রেখার বিন্যাস, যাহার প্রধান লক্ষণ অন্তর্মুখী গভীরতা নহে, বহির্মুখী ব্যাপ্তি। মধুসূদনের কাব্যে এই সমস্ত গুণেরও আশ্চর্য সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বীররস, করুণরসের সাধারণীকৃত রূপ, ঐশ্বর্যসমারোহ, বর্ণাঢ্য চিত্রসৌন্দর্য, রণসজ্জা ও যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও কোলাহলমুখরতা—এই সমস্ত কাব্যবর্ণনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্যক্তিত্বের নিগূঢ়তায় কোন মহাকাব্যকারই প্রবেশ করেন না, মধুসূদনও করেন নাই; তাঁহার নর-নারী শ্রেণী-প্রতিনিধি। রাবণের রাজমহিমার অন্তরালে তাহার ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন বিশেষ শোনা যায় না; ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার কণ্ঠে যে শৌর্য ও প্রণয়াবেশের মিশ্রিত স্বর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা রাজপরিবারের তরুণ-তরুণীর সাধারণ পরিচয়; চিত্রাঙ্গদা রাজমহিষীর সম্ভ্রম-সংযত শোকপ্রকাশে সন্তানহারা মাতৃহৃদয়ের হাহাকারকে সংবৃত করিয়াছে। চিতাশয্যায় শায়িত ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার ভস্মীভূত দেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাবণের যে শোকোচ্ছ্বাস তাহা রাজচরিত্রানুযায়ী, রাজ্যের কল্যাণচিন্তায় ব্যক্তিগত শোকের আতিশয্য হইতে নিয়ন্ত্রিত। মধুসূদনের মহাকাব্যের সর্বত্রই এই পরিমিতিবোধ ও কাব্যাদর্শের নিখুঁত অনুসরণ।

বীরাঙ্গনার অনন্যতা

মহাকাব্যের এই উচ্চকণ্ঠ, শক্তিগর্ভ ভাষণ মধুসূদনের এক অত্যাজ্য, বারে বারে ফিরিয়া-আসা সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সমস্ত অন্যজাতীয় রচনাতে—পত্রসাহিত্য, চতুর্দশপদী কবিতা, এমনকি গীতি-কবিতাতেও এই বলিষ্ঠ প্রকাশরীতির চিহ্ন পরিস্ফুট। স্বল্পায়তন বিষয়ের অন্তর্মুখী স্বগতোক্তির মধ্যেও যেন অকস্মাৎ এক দূরোৎক্ষিপ্ত আহ্বানের সুর শোনা যায়। তথাপি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর (১৮৬২) একান্ত ব্যক্তিগত, ঘরোয়া আবেগ-প্রকাশের মধ্যে ইহার ধ্বনিবহুল ধাতব স্বনন ত্যাগ করিয়া এক নূতন কোমলতা, মানবকণ্ঠ-সুলভ সূক্ষ্ম অনুরণন ও বিষয়ানুযায়ী স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করিয়াছে। ইহার নায়িকারা প্রকৃতি ও অবস্থা-ভেদে প্রত্যেকে এক স্বতন্ত্র সুরে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে—চরিত্রের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর এক সূক্ষ্ম সঙ্গতি এই অন্তররহস্যের দর্পণরূপ রচনাগুলিকে নাটকীয়-গুণসমৃদ্ধ করিয়াছে। এই নায়িকাগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই পদমর্যাদায় রানী রাজকুলোদ্ভবা, কিন্তু নারীত্বই ইহাদের প্রধান পরিচয়। ইহারা মহাকাব্যের আভিজাত্যের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্ব স্ব নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যে, নারীপ্রকৃতির বিচিত্র-আবেগ-চিহ্নিত, পরিপূর্ণ

আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রণয়ের আত্মনিবেদন শকুন্তলা, রুক্মিণী, শূর্পণখা, তারার উক্তির মধ্য দিয়া নূতন নূতন অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। শকুন্তলার হীনতাবোধের, অনুগ্রহপ্রার্থনার কুণ্ঠা, রুক্মিণীতে সমপর্যায়ভুক্তা, মুগ্ধা কিশোরীর সলজ্জ, অথচ আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ প্রেমজ্ঞাপন, শূর্পণখার ভোগবিলাসে অভ্যস্তা রাজকুমারীর বনচারী লক্ষ্মণের প্রতি ঈষৎ আত্মপ্রাধান্যগর্বিত, অনুগ্রহের আশ্বাসে লোভনীয় অনুরাগবিবৃতি, আর তারার প্রচ্ছন্ন-ইঙ্গিত-ভরা, আত্মদোষ-ক্ষালনে ব্যগ্র লালসার নির্লজ্জ প্রকাশ—এ সমস্তই একই ভাবের বিচিত্র স্বরূপাভিব্যক্তি। কৈকেয়ী, জনা, দ্রৌপদী, ভানুমতী—ইহারা সকলেই বিবাহিতা নারী, পতির প্রতি ক্ষুব্ধ অনুযোগ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের মনোভাব ও বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্যে কি চমৎকার পার্থক্য? কৈকেয়ীর তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী শ্লেষ, জনার পুত্রশোকে আত্মহারা রমণীর স্বামীর প্রতি অসংবরণীয় রোষোচ্ছ্বাস, ভানুমতীর ভ্রান্ত পতির প্রতি মৃদু, কল্যাণকামী উপদেশ, আর দ্রৌপদীর স্বর্গলোক-প্রবাসী প্রিয় দয়িতের প্রতি ঈষৎ অভিমান-স্নিগ্ধ, বঙ্কিম কটাক্ষ এক দাম্পত্য সম্পর্কের নানা দিকের নাটকীয় প্রকাশ। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব ও অননুকরণীয় সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি আখ্যান-কাব্য কতকটা এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংলাপ গীতি-উচ্ছ্বাসের ও নীতিকথার অতিবিস্তারের জন্য নাটকীয় পরিমিতিবোধ ও তীব্র সংঘাতের আদর্শ হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইহার বিচিত্র ভাব-প্রকাশের উপ-যোগিতা, আমাদের সাধারণ-জীবনের নানাবিধ আবেগের গতিচ্ছন্দের সহিত সমতা রক্ষা করার আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়াছে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১) ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ। আমরা যখন চিন্তা করি যে 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' একই বৎসরে, প্রায় একসঙ্গেই রচিত হইয়াছিল, তখন আমরা তাঁহার এই দুই বিপরীত কোটিতে সমকালে ক্রিয়াশীল প্রতিভাতে চমৎকৃত না হইয়া পারি না। যে কবি একই সঙ্গে রণভেরী ও প্রেমের বাঁশী বাজাইয়াছেন, তাঁহার বিচিত্রগামী শক্তি অনিবার্যভাবে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। অবশ্য মধুসূদনের বৈষ্ণব-ভাবনিষ্ঠা বা ধর্মবিশ্বাসের কিছুই ছিল না; তিনি অধ্যাত্মসাধনাহীন, নিছক রূপমোহসঞ্জাত আধুনিক প্রেমেরই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধাকে 'Mrs Radha'

বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত পর্যায়ের নায়িকাতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। মধুসূদন বৈষ্ণব ভাবাদর্শের বহিরবয়বই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অন্তঃপ্রকৃতির ভাবগভীরতা ও অলৌকিক ব্যঞ্জনা তাঁহার অনুভবশক্তির বাহিরে ছিল। তথাপি প্রাচীন সুরের প্রতিধ্বনিপূর্ণ, রমণীয় প্রকৃতির পরিবেশে উদ্ভূত, খেদ-অনুযোগ-অতৃপ্তিতে ভরা নিছক প্রেম-কবিতারূপে ইহাদের মূল্য মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। বিধর্মী মধুসূদন বাংলা দেশের প্রাচীন ভাবধারায় যে কতখানি অবগাহন করিয়াছিলেন—এই ছন্দকুশল, অথচ গভীর-অনুভূতিহীন কবিতাগুলি তাহারই নিদর্শন।

চতুর্দশপদী
কবিতাবলী

চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) মধুসূদনের নূতন কাব্য-আঙ্গিক-গঠনে কৃতিত্বের আর একটি নিদর্শন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সনেটকে মধুসূদন বাংলায় প্রবর্তন করিয়া বাংলা কাব্যে একটি অভিনব প্রকাশরীতি যোজনা করিলেন। গীতি-কবিতার তরল, স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত ভাবোচ্ছ্বাসকে যে সংহত-ঘনীভূত করিয়া চতুর্দশ পংক্তির কঠোর-নিয়ম-বদ্ধ, আঁটসাঁট কাঠামোর মধ্যে বিন্যাস করা যায় বাংলা কাব্যে মধুসূদনের পূর্বে তাহার কোন দৃষ্টান্ত মিলে না। ইহাদের মধ্যে আবেগের তীব্রতা অপেক্ষা জীবন সম্বন্ধে পরিণত চিন্তা, প্রজ্ঞা ও মননের মাধ্যমে মুহূর্তের অনুভবের স্থায়িত্ব-বিধান, অতীত স্মৃতিচারণা-অবলম্বনে চেতনার গভীর স্তরে অবতরণ ইত্যাদি প্রধান রস। এক অখণ্ড ভাব ও চিন্তার ত্বরাহীন রসপরিণতি ও সনেটের অষ্টক, ষট্ক—এই দুই অংশে ইহার বিবর্তনের পরিপাটি বিন্যাস ইহার বিশিষ্ট রূপাবয়ব।

সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য

মধুসূদনের সনেটগুলি তাঁহার বাল্যস্মৃতি, হিন্দুর বিবিধ পূজা ও উৎসব, পূর্বতন কবিগোষ্ঠীর স্মৃতিতর্পণ ও বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়, কবিতা ও কাব্যের রসবিশ্লেষণ প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া রচিত। এগুলির অধিকাংশই তাঁহার ইউরোপে প্রবাসকালের মধ্যে তাঁহার কবিকল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। মহাকাব্য ও নাট্যরীতি-অনুসারী পত্রাবলীর মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবনের যে অন্তরঙ্গ অভিলাষ, আত্মরতির যে স্বচ্ছন্দ বিলাস প্রকাশের সুযোগ পায় নাই, সেগুলি বাহিরের সকল চাপ, কল্পনার ঊর্ধ্ববিহারের কৃচ্ছ্রসাধনা হইতে মুক্তি পাইয়া সহজ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। মধুসূদনের অবিচ্ছিন্ন বীররস-অনুশীলনের মধ্যে করুণ রসের উৎস যে কোথায় লুকানো ছিল, রাজপরিবেশের ঐশ্বর্যময় বর্ণনার অন্তরালে গার্হস্থ্য জীবনের শান্ত-মধুর

স্মৃতি কোথায় আত্মগোপন করিয়া ছিল, রক্ষঃকুল-লক্ষ্মীর দেব-মহিমার মধ্যে কোজাগরী পূর্ণিমার শরৎ-লক্ষ্মী তাঁহার জ্যোৎস্নাশুভ্র, চোখ-জুড়ানো শ্রী ও বরদানের ঝাঁপি লইয়া কেমন প্রচ্ছন্ন ছিলেন তাহারই ইঙ্গিত আমরা এখানে পাই। রণভেরীর কর্ণবিদারী কোলাহলের ক্ষণিক বিরতিতে, প্রখরোজ্জ্বল নাট্যশালার স্তিমিতদীপ নেপথ্যলোকে আমরা যে অকস্মাৎ উপমা-উৎপেক্ষা-বহুল প্রকৃতিবর্ণনার ভিতর দিয়া শান্তশ্রীমণ্ডিত, করুণ কোমল পল্লীজীবনের একটি চকিত আভাস উপলব্ধি করি, তাহা মধুসূদনের এই গভীরস্তরশায়ী, অবদমিত চেতনালোক হইতেই উদ্ভূত। 'স্বর্ণ দেউটি যথা তুলসীর মূলে' অথবা 'দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে'—এই জাতীয় উপমা কবির বাল্যস্মৃতিবিভোর, ছাড়িয়া-আসা অতীতের মুগ্ধরোমন্থনরত প্রকৃতিরই পরোক্ষ পরিচয় বহন করে।

মধুসূদন সনেটের প্রথম শিল্পী, কিন্তু একেবারে নিখুঁত শিল্পী নহেন। কল্পনার উদ্দামতায়, মননের অতিরেকে, প্রকাশের বাঁধভাঙা উচ্ছলতায়, তাঁহার সনেট যে খানিকটা রূপাদর্শচ্যুত হইয়াছে তাহা স্বীকার্য। সনেটের ভাব জমাট বাঁধিতে যে পংক্তিসীমা-নিঃশেষিত, স্থির ছন্দগতির প্রয়োজন, মধুসূদনের মুহুর্মুহু যতিস্থান পরিবর্তনে, ছন্দের পংক্তির সীমা-লঙ্ঘনে, কল্পনা-তরঙ্গের দ্রুত উত্থান-পতনে তাহা সময় সময় ব্যাহত হইয়াছে। মহাকাশ বিহারে অভ্যস্ত ঈগলপাখীকে গণিয়া গণিয়া নাচানো ভবন-শিখীতে রূপান্তরিত করিলে সে ময়ূরের সহজ নৃত্যচ্ছন্দ আয়ত্ত করিতে কিছু অসুবিধা বোধ করে। সময় সময় অতিরিক্ত কল্পনাবিলাস ('কমলে কামিনী') বা বর্ণনাত্মক বিষয়-নির্বাচনেও সনেটের বিশিষ্ট রূপ ও রীতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই। তথাপি, এই সমস্ত ছোটখাট দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও, মধুসূদনের সনেট, কবি-মনের একটি সার্থক বিকাশ ও কবি-শিল্পীর একটি সার্থক রূপসৃষ্টি-রূপে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছে ও ভবিষ্যৎ সনেট-লেখকদের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। তাঁহার গীতিকবিতার সংখ্যা অল্প হইলেও 'আশার ছলনে ভুলি' বা 'রেখো মা দাসেরে মনে' প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতি, কবি-মনের অকৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাস নূতন যুগের মন্ময়তার উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছে।

মধুসূদনের সনেটের দোষগুণ

মধুসূদন তান্ত্রিক সাধকের ন্যায় উৎকট এবং কতকটা বাংলা কাব্যের স্বভাবধর্ম-বিরোধী তপস্যার দ্বারা প্রাচ্য কাব্যদেহে পাশ্চাত্য ভাব-আত্মার যে অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার শৌর্যধর্মের

মহাকাব্যোচিত উদাত্ত কল্পনারীতির যোগ্য উত্তরসাধক বাংলার সমকালীন সমাজে দুর্লভ ছিল। যাঁহারা তাঁহার বহিরঙ্গের অনুকরণ-প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী যুগের গীতিকবিতার প্লাবনে মধুসূদনের মহাকাব্য-সেতুবন্ধ ক্রমশঃ ক্ষয়মূল হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—তাহার ভগ্নাবশেষের দুই-একটি খণ্ড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও খেদ জাগায়। তাঁহার ঠিক পরের যুগের বিহারীলাল চক্রবর্তী হইতে এই গীতি-প্লাবনের আরম্ভ। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাবের দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মধুসূদনের বিপরীতধর্মী সাহিত্যস্রষ্টারাও তাঁহার নিকট ঋণী। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তিনি প্রথম অপসারিত না করিলে, তাঁহার পরবর্তী লেখকদের প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশ, অপরিচিত পথে সাবলীল পদক্ষেপ ও নবসৃষ্টির প্রেরণা যে বহু পরিমাণে ব্যাহত হইত তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি কলম্বসের ন্যায় দুস্তর সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া নূতন মহাদেশের আবিষ্কার না করিলে সেই নবাবিষ্কৃত ভূমিখণ্ডে নানা বিচিত্র ছাঁদের উপনিবেশ-পরম্পরা এত দ্রুত গতিতে গড়িয়া উঠিত না। বাংলা সাহিত্যে সেই আধুনিকতা-মহাদেশের আবিষ্কারকের জয়মাল্য চিরদিন তাঁহার কণ্ঠে অম্লান হইয়া থাকিবে।

উত্তরকালে মধুসূদনের প্রভাব

৩

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) : বাংলা কাব্যের নবযুগে কবিপ্রকৃতির নূতন পরিচয়ের একটা দিক যেমন মধুসূদনে রূপ পাইয়াছে, তেমনি উহার বিপরীত-ধর্মী আর একটা দিক বিহারীলালে উদাহৃত। কবির অন্তরে একটা যে অকারণ, অনির্দেশ্য বেদনাবোধ, একটা অপ্রশমিত অভাবের অস্বস্তি অনির্বাণ দহনজ্বালায় ধূমায়িত হয়, এবং ইহাই যে তাঁহার কবিতার প্রেরণা ও প্রাণশক্তি কবির এই জীবনসত্য প্রাগ্-আধুনিক যুগে অজ্ঞাত ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের কবিতায় প্রেমের রহস্যময় অনুভূতি রাধিকার অন্তর্দীর্ণ ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া কবিচিত্তের এই নিগূঢ় অতৃপ্তি-বেদনার কিছু পরোক্ষ সন্ধান দেয়। কিন্তু সেখানেও প্রথমতঃ অনুভূতি কবির ব্যক্তিগত নহে; দ্বিতীয়তঃ, মনোবেদনার একটা সুনির্দিষ্ট প্রণয়াকূতি-মূলক কারণ আছে। আধুনিক যুগের কবিতায় খেদের সুর আরও সর্বাত্মক ও

বিহারীলালের কবি-প্রেরণার উৎস

ইহা ব্যক্তিপ্রকৃতির গভীরতর মূলে নিহিত। আদর্শ-কল্পনার স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয় ও রূপ-সুষমার স্থির জ্যোতির পরিবর্তে অনুভূতির ক্বচিৎ-দীপ্ত, ক্বচিৎ-স্তিমিত আলোকে ইহার চকিত, অসংলগ্ন আভাসন—ইহাই বিহারীলালের কবি-প্রেরণার অভিনব উৎস।

বিহারীলালের স্বকীয়তা

বিহারীলালের কবিধর্মের মধ্যে প্রথম হইতেই একটা অনন্যসাধারণ স্বকীয়তা ছিল। তাঁহার 'বন্ধুবিয়োগ' ও 'প্রেমপ্রবাহিণী' (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, ১৮৭০) কাব্যদ্বয়ে তিনি চিরপ্রচলিত কাব্যপ্রথার অনুসরণ না করিয়া নিজের ও বন্ধুবর্গের জীবনের অতি-বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবিতার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে তাঁহার বিষয় যেমন একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ কাব্যপ্রথা-বিরোধী, তেমনি তাঁহার ভাষাও অমার্জিত ও তীক্ষ্ণভাবে বাস্তবানুসারী। নিজের অন্তরঙ্গ জীবনের সমস্ত কথা যে এত খোলাখুলিভাবে, কোনও রূপ ভাব-মার্জনার পালিশ ছাড়া কাব্যে প্রকাশ করা যায় ইহা বিহারীলালের পূর্বে কেহই কল্পনা করেন নাই। ইহাতে অবশ্য তাঁহার কবিতার উৎকর্ষ বাড়ে নাই, কিন্তু তাঁহার মৌলিকতার দুঃসাহস প্রকাশিত হইয়াছে।

নিসর্গসন্দর্শন ও বঙ্গসুন্দরী

'নিসর্গসন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী'-তে (১৮৭০) বিহারীলাল ধীরে ধীরে তাঁহার বস্তুবিন্যাসের স্থূলতা অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিজস্ব কল্পনাবৈশিষ্ট্যের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। প্রথমটিতে তাঁহার প্রকৃতি-সচেতনতা, ও দ্বিতীয়টিতে তাঁহার নারী সম্বন্ধে রোমান্টিক মনোভাব উন্মেষিত হইয়াছে। প্রকৃতির যে রূপে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহা উহার শান্ত, অন্তর্মুখী প্রকাশ নহে, উহার বাহ্য বিক্ষোভ ও বিপর্যয়ের উন্মত্ত আলোড়ন। তিনি ঝটিকার ধ্বংসলীলা ও সমুদ্রের চির-অশান্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে কোন স্থির ভাবকেন্দ্রিকতা নাই, আছে তথ্য ও আবেগের এক বিসদৃশ সংমিশ্রণ, অতিরিক্ত বস্তুসন্নিবেশ, অবান্তর মন্তব্য, ছেলেমানুষী বিস্ময় ও মাত্রাতিসারী উত্তেজনার একপ্রকার জগাখিচুড়ি। 'বঙ্গ-সুন্দরী'-তে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নারীর শ্রেষ্ঠ গুণের বিচিত্র বিকাশই কবির বিষয়। এখানেও তথ্যের বস্তুপ্রধান কাঠামোর মধ্যে নারী-আদর্শের ভাব-প্রশস্তি একটি সঙ্গতিহীন, বিরুদ্ধ-উপাদান-গঠিত বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা আখ্যান-কাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে আন্দোলিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত রচনার মধ্যে বিহারীলাল যে তাঁহার প্রথম কবিতাগ্রন্থের অসংস্কৃত বস্তু-

তান্ত্রিকতাকে ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত ভাবুকতা ও নিবিড় কল্পনাময়তার দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইতেছেন, স্থূল বস্তুপিণ্ডকে সূক্ষ্ম অনুভূতিতে রূপান্তরিত করিতেছেন তাহার নিদর্শন মিলে। যদিও বাস্তবকে তিনি পরিহার করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার গতি যে রূপহীন বস্তু হইতে স্বপ্নসুষমার দিকে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী'র একটি স্তবক :

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী-রতন
খেলা করে নীল-নলিনীদলে।

'সারদামঙ্গল'-এর অপরূপ জ্যোতির্ময় আবির্ভাব, 'তামসী-তরুণ-ঊষা কুমারী-রতন'-এর পূর্বসূচনা। কবির ছন্দ-লালিত্য ও স্বর্গাভিসারী কল্পনা যে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে সমস্ত পার্থিববন্ধনমুক্ত হইয়া বিশ্বের মূলীভূত সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ ভাবরূপের আধার রচনা করিবে তাহার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি এখানে সঙ্গীত ও চিত্ররূপে আমাদের অনুভূতিগোচর হয়।

সারদামঙ্গল ও সাধের আসন

'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) ও 'সাধের আসন'-এ (১৮৮৯) বিহারীলালের কবি-প্রতিভার এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রকাশ। এরূপ বিরাট, মহিমান্বিত কল্পনা, এরূপ অন্তর্গূঢ় রহস্যময় ভাবব্যঞ্জনা, বোধাতীত ধ্যানতন্ময়তার এরূপ আত্মকেন্দ্রিক প্রসার আর কোন গীতিকাব্যের বিষয় হইয়াছে কি না সন্দেহ। কাব্য যতই আবেগময় ও কল্পনাপ্রধান হউক না কেন তাহার মধ্যে কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা যুক্তিশৃঙ্খলার যোগসূত্র, একটা গঠনসৌষ্ঠবের ক্রম বর্তমান থাকে। বিহারীলালের কাব্যে এই শৃঙ্খলা ও ক্রমবিন্যাসের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। কবি বাহ্যজ্ঞানশূন্যের ন্যায় কখন যে এক কথা বলিতে বলিতে অন্য কথায় চলিয়া যাইতেছেন, প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে পদক্ষেপ করিতেছেন তাহা ভাবক্রমের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। যেমন স্বপ্নের আপাত-অসংলগ্নতা, মিশ্র উপাদান ও অবাধ ব্যাপ্তির মধ্যে একটা মূলগত ভাবের ঐক্যক্রিয়া থাকে, তেমনি বিহারীলালের দ্রুতপরিবর্তনশীল চিন্তাধারা ও চিত্রকল্পের মধ্যে একই অনুভূতির লীলাবিলাস অদৃশ্য অথচ অনুভবগম্য যোগসূত্রের মত প্রতিভাত হয়। এই কবি-বৈদান্তিকের চোখে বস্তুজগতের বহির্বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে মায়াবরণভেদী একক শক্তির খেলা তাহা যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাই যুক্তিতে যাহা খাপছাড়া ও

অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, যাহাকে স্বপ্নসঞ্চরণের ন্যায় অর্থহীন বলিয়া ঠেকে তাহার মধ্যে এক গভীরতর ঐক্যবোধের অন্তঃসঙ্গতি আছে।

এই কবিতাদ্বয়ের বিষয় নিখিলবিশ্বের মূলীভূত কারণস্বরূপ সৌন্দর্যসত্তার বন্দনা। সারদা ইহারই মানবী প্রতিমূর্তি। কবি ইঁহাকে কখনও কবিপ্রতিভার উন্মেষ-প্রেরণা, কখনও বা প্রেয়সী-জায়া, কখনও বা সর্বভূতব্যাপ্তা বিচিত্ররূপিণী প্রাণশক্তিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইঁহার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের চিন্ময় রূপ ও মানবিক প্রণয়োচ্ছ্বাসের ব্যাকুল মিলনাকূতি যেন এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এক অদেহী সত্তাকে ঘিরিয়াই কবির বিরহ-মিলন, মান-অভিমান, প্রণয়োৎকণ্ঠার সব কয়টি সুর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। রূপের মধ্যে অরূপের সুদূর ব্যঞ্জনা, পার্থিব প্রণয়ের আবেগবিহ্বলতার মধ্যে এক উচ্চতর ভাবমুগ্ধতার স্ফুরণ তাঁহার প্রেমনিবেদনকে এক ধ্যান-রোমাঞ্চের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে কবি ও সাধকের যে অপূর্ব সমন্বয়, কাব্যসৌন্দর্য ও তত্ত্বানুভূতির যে আশ্চর্য সমীকরণ, সীমা ও অসীমের, উভয়েরই পারস্পরিক অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যে অন্তরঙ্গ মিলন সাধিত হইয়াছে, বিহারীলালে তাহারই অসম্পূর্ণ প্রারম্ভিক প্রয়াস। বিহারীলাল অবশ্য সর্বত্র কাব্যের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেন নাই—তাঁহার ভাবমত্ততা সর্বদা রূপের শাসন মানে নাই। তিনি যে পরিমাণে ভাবুক ছিলেন সে পরিমাণে শিল্পী ছিলেন না। যাঁহারা কাব্যরসিক, বিহারীলালের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অনুযোগ থাকিবেই; কিন্তু যে কল্পনা নিজ গতির আবেগেই মূর্তি গ্রহণ করে, যে ভাবনিবিড়তা নিজ প্রতিচ্ছায়া-প্রক্ষেপের দ্বারাই রূপধর্মী হইয়া উঠে তাহা তাঁহার কাব্যে প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং এই গুণের জন্যই তাঁহার কবিতা উহার সমস্ত অস্পষ্টতা ও সংহতি-শিথিলতা সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট কাব্যের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে।

বিহারীলালের দার্শনিক তত্ত্ব ও প্রেমসৌন্দর্য-সাধনার যুগ্মানুভূতি

৪

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) ও **নবীনচন্দ্র সেন** (১৮৪৭—১৯০৯)—তাঁদের কবিত্বশক্তির আপেক্ষিক অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যুগনির্দিষ্ট ধারক ও বাহকরূপে, যুগের ভাবপ্রতিনিধিত্বের প্রতীকরূপে বাংলা কাব্যে মধুসূদনের পরেই এক মর্যাদাপূর্ণ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। মধুসূদনের আবির্ভাব ও পৌরাণিক কাহিনী-

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

অবলম্বনে সার্থক কাব্যসৃষ্টির ফলে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে একটি নানামুখী, বিরুদ্ধ-উপাদানগঠিত ভাব-আলোড়ন জাগিয়াছিল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাহারই তরঙ্গশীর্ষে দুই উজ্জ্বলতম ফেন-মুকুটরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। মধুসূদন বিধর্মী হইয়াও তাঁহার রচনায় হিন্দুসংস্কৃতির মহিমময় জয়গাথা গাহিয়াছেন—সুতরাং তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাঁহার ঠিক পরবর্তী কবিগোষ্ঠী মহাকাব্যোপম সুবিস্তীর্ণ আধারে ও উদাত্ত রচনারীতিতে, হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতর, দার্শনিক তত্ত্বানুযায়ী সূক্ষ্মতর মর্মব্যাখ্যান ও উন্নততর আদর্শবাদ-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) ও 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) হেমচন্দ্রের রচনার পরবর্তী, কিন্তু নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস'-এর (১৮৯৬) পূর্ববর্তী। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব হেমচন্দ্রের উপর অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে না পড়িলেও 'বঙ্গদর্শন'-এ হিন্দুধর্মের যে নবপ্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল তাহার আবেগ-রঞ্জিত রশ্মিচ্ছটা সে যুগের সমস্ত বাতাবরণে বিকীর্ণ হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধুসূদনের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে মহাকাব্যের বিরাট আঙ্গিক ও পরিকল্পনা ও হিন্দুধর্মের গূঢ়তত্ত্ব-উদ্ঘাটন-প্রয়াসরূপ রচনাশৈলী ও বিষয়নির্বাচন গ্রহণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা ইহার সহিত ইঁহাদের কাব্য-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও কল্পনার স্বকীয়তা যোগ করিয়া এক মিশ্রধরনের কাব্য সৃষ্টি করিলেন। বিষয়ের সহিত রচনাশৈলীর অনুপযোগিতা, মহাকাব্যের আঙ্গিক অনুসরণ করিয়াও উহার আদর্শরক্ষায় অক্ষমতা, বীরত্বময় পরিবেশে গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের তরলায়িত কারুণ্য-উচ্ছ্বাসের অযথা সংমিশ্রণ ও বাঙালীর অন্তরে ক্রমসঙ্কীয়মান গীতরসধারার অবারিত প্রয়োগ—এই সমস্ত প্রবণতার সমাবেশই তাঁহাদের কাব্যকে মহাকাব্যের উত্তুঙ্গ মহিমা হইতে চ্যুত করিয়া মধ্যস্তরের অশ্রুনির্ঝরসিক্ত, কোমলভাব-প্রলেপে তাপহীন জীবনবোধের পর্যায়ে স্থাপন করিয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে সে যুগ হইতে অতি-আধুনিক যুগ পর্যন্ত হেম-নবীনের কাব্যের মূল্য মহাকাব্যের মানদণ্ডে বিচারিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের কাব্যগত যে সমস্ত দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা হয়, উহা সমস্তই মহাকাব্যের আদর্শচ্যুতি ও লক্ষণহীনতা-বিষয়ক। যেহেতু সমসাময়িক যুগে তাঁহারা মধুসূদনের সহিত তুলিত হইয়া কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন ও হিন্দুত্বের আদর্শের প্রতি অতি-শ্রদ্ধাশীল সমালোচক-গোষ্ঠী কর্তৃক কেহ

বা 'নভোলোকের কবি', কেহ বা 'উনবিংশ শতকের মহাভারতকার'-আখ্যায় সম্মানিত হইয়াছিলেন, সেই অতি-প্রশংসার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এখন পর্যন্ত তাঁহাদিগকে অতি-দূষণের ফলভোগ করিতে হইতেছে। যখন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধর্মানুরাগের নেশা কাটিয়া গিয়া বিশুদ্ধ কাব্যবিচারের মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হইল, ও মহাকাব্যের বিরল-গুণ-সন্নিবেশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্ফুটতর হইল, তখনই এই একদা-প্রশংসিত কবিদ্বয় তাঁহাদের মধুসূদন-প্রতিস্পর্ধী উচ্চাসন হইতে ব্যর্থ কবিযশঃপ্রার্থীর বক্রদৃষ্টিসম্বর্ধিত লাঞ্ছনার বিপরীত কোটিতে অবনমিত হইলেন। এখন তাঁহাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহাতে তাঁহারা কি পারিয়াছেন তাহার অপেক্ষা তাঁহারা কি পারেন নাই তাহারই তালিকা দীর্ঘতর হইয়া থাকে।

হেম-নবীনের সমালোচনায় আদর্শের ত্রুটি

অনুবীক্ষণের উল্টা দিক দিয়া দেখার ফলে এই কবিদের যে বিকৃত রূপ দেখা যায় তাহা যে তাঁহাদের সত্য পরিচয় নয় এই উপলব্ধির সময় আসিয়াছে। যে কোন বিরাট পরিকল্পনা ও ভাবগাম্ভীর্যমূলক রচনাকে যে মহাকাব্য হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সাধারণ আখ্যান-কাব্যেও মহাকাব্যের লক্ষণ অংশতঃ প্রকটিত হইতে পারে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কেহই তাঁহাদের মহাকাব্য রচনার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন নাই। সুতরাং মহাকাব্যীয় ফলশ্রুতি তাঁহাদের নিকট দাবি করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহাও বিচার্য। তাঁহাদের কবিপ্রকৃতিকে মহা-কাব্যের লোহার খাটে (Procrustean bed) শোয়াইয়া উহাদের স্বাভাবিক অঙ্গায়তনকে সেই খাটের মাপে বিন্যাস করিবার কৃত্রিম চেষ্টা আমাদিগকে সেই কবিত্বের মর্মমূলে পৌছিতে সহায়তা করিবে না ইহা সুনিশ্চিত। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' ও নবীনচন্দ্রের 'কাব্যত্রয়ী' কতকটা মধুসূদন-প্রভাবিত হইলেও, মহা-কাব্যের বহিরঙ্গের কিছুটা গ্রহণ করিলেও উহাদের অন্তঃপ্রকৃতি, মূলগত ভাব-প্রেরণা ও কাব্যাভিপ্রায় যে মহাকাব্য হইতে বহুলাংশে পৃথক ইহা মনে রাখিয়াই এই কাব্যগুলির মূল্যাবধারণ বিধেয়।

হেম-নবীনের কাব্যের মূল্যায়নের নূতন দৃষ্টি-কোণের আবশ্যকতা

'বৃত্রসংহার'-এর সহিত 'মেঘনাদবধ'-এর নিবিড় সাদৃশ্য ও হেমচন্দ্র-কৃত মধুসূদন-কাব্যের প্রথম রসগ্রাহী সমালোচনা-সূত্রে উভয়ের কবিসম্পর্কের নৈকট্য উহাদের মধ্যে তুলনাকে অনিবার্য করিয়া তোলে এবং এই তুলনার ফলে হেমচন্দ্র কতকটা নিষ্প্রভরূপে প্রতীয়মান হন।

মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার

মহাকাব্যের হরধনুতে জ্যা-রোপণ তাঁহার শক্তির অতীত ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া লঘুতর ধনুকের শরসন্ধান-নৈপুণ্য যে তাঁহার ছিল না এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। আসলে, 'বৃত্রসংহার' 'মেঘনাদবধ'-এর বিচিত্ররসপুষ্ট এক পারিবারিক সংস্করণ; ইহাতে গার্হস্থ্য জীবনের রূপ, রস, সাধারণ দ্বন্দ্ব-জটিলতা ও বিষণ্ণ-করুণ অনুভূতি মহাকাব্যের কঠোর-আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত সীমাকে অতিক্রম করিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে 'মেঘনাদবধ'-এর কেন্দ্রানুসারী রসবিন্যাস ও সমকালীন যুগের তীক্ষ্ণ জীবনাদর্শ-ব্যঞ্জনার একান্ত অভাব। বৃত্রের জয়-পরাজয়ের মধ্যে যুগমানস কেবল সুপ্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর সুপরিচিত নীতির পুনরাবৃত্তি দেখিয়াছে, নিজ মানস অভীপ্সার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে নাই। পাঠকের সমস্ত অনুভবশক্তি, সমস্ত মানস প্রতীক্ষা একান্তভাবে একই পরম পরিণতির দিকে সংহত হয় নাই, ধীর মন্থরগতিতে, পরিসমাপ্তির প্রতি অতি-কৌতূহলী না হইয়া, বিভিন্ন রসের আস্বাদন করিয়া ফিরিয়াছে। কাজেই ছন্দোবৈচিত্র্য, গীতসুরের প্রবর্তন, আখ্যানরসের আস্বাদন, বর্ণনাকৌশলে তৃপ্তি ও শেষে একটা প্রত্যাশিত পরিণতিতে নিরুত্তাপ সন্তোষ পাঠকচিত্তকে নানাভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। এই বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি মহাকাব্যীয় গাঢ়বদ্ধতার পরিবর্তে একটা শিথিল আখ্যান-সূত্র-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। এই বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনাকৌশল ও আখ্যানের শিথিল-সংবদ্ধ রূপনির্মিতিই 'বৃত্রসংহার'-এর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের উৎকর্ষের মূলে।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের আদর্শের পার্থক্য

'বৃত্রসংহার'-এর কতকগুলি সর্গে যে ভাবগাম্ভীর্যেরও সমুন্নত প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাতালপুরে দেবতাদের মন্ত্রণা, বিশ্বকর্মার যন্ত্রশালার বর্ণনা, ব্রহ্ম ও শিবলোকের দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ রূপক-ব্যাখ্যা ও বৃত্রাসুরের অন্তিম সংগ্রামের প্রলয়-বিপর্যয়—এইগুলির মধ্যে, কবিত্ব মাঝে মাঝে তথ্যভারপীড়িত হইলেও, উন্নত ভাব-প্রকাশের উপযোগী কবি-কল্পনা ও রূপায়ণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের সংস্কার ও উপলব্ধিসমূহের রূপদান-বিষয়ে মধুসূদন ও হেমচন্দ্র বিভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদনের পিতৃলোক-বর্ণনা ও নরক-দর্শন চিত্রধর্মী ও মানবিক-রসাপ্লুত; তিনি পাপীদের যন্ত্রণা বর্ণনা করিয়াছেন কবিসুলভ অনুভূতি ও চিত্রণশীলতার মাধ্যমে; তিনি তত্ত্বের দুরূহতা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার বর্ণনা সুখপাঠ্য ও মহাকাব্য-প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের পরলোকের বিবরণ দার্শনিকতত্ত্ব-সমাকীর্ণ ও নিগূঢ়-অর্থ-উদ্ঘাটন-প্রয়াসী; তাঁহার ব্রহ্ম ও শিবলোক প্রাকৃতিক রম্যতা-বর্ণনার উপলক্ষ মাত্র নহে, ইহাদের মধ্যে সৃষ্টিরহস্য ও অধ্যাত্মসাধনার ক্রমারোহী মানস স্তর আভাসিত। মধুসূদন পৌরাণিক চিত্র-কল্পনার অনুগামী; হেমচন্দ্র উপনিষদের তত্ত্বগহন ও রূপরিক্ত পথের পথিক। মধুসূদন হিন্দুধর্মের দুই-একটি বিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন; হেমচন্দ্র উহার জটিল ও সূক্ষ্মতত্ত্ব-কণ্টকিত সামগ্রিক পরিচয়টি কবিত্বের ভাষায় ফুটাইতে চাহিয়াছেন। এই দুরূহতর কার্যে তাঁহার সাফল্য যে মধুসূদনের অনুরূপ হয় নাই তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। মধুসূদনের নিয়তিবাদ আত্মবিরোধক্লিষ্ট আধুনিক মনের জীবনার্তিরই একটা দৈব প্রতিরূপ; হেমচন্দ্রের নিয়তিবাদ কর্মফলের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিধানের অমোঘ ন্যায়-বিচার। একটি দৈবলীলার ছদ্মবেশধারী মানবিকতার স্বাধীন, বেদনাময় বিকাশ; অপরটি দৈবশক্তি-নিয়ন্ত্রিত মানব-কর্মফলের অনিবার্য পরিণতি।

হেমচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা ও গীতপ্রধান অংশও প্রশংসার্হ। এগুলিকে মহাকাব্যের অঙ্গরূপে বিবেচনা না করিয়া গাথাকাব্যের স্বচ্ছন্দ-বিচিত্র ভাববিকাশের উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করাই উচিত।

বৃত্রসংহারে গার্হস্থ্য পরিবেশ ও কোমলতার প্রাধান্য

'বৃত্রসংহার'-এ 'মেঘনাদবধ'-এর তুলনায় গার্হস্থ্য প্রতিবেশ ও পরিবার-জীবনের কোমল ভাবনিচয়ের প্রাধান্য। বৃত্র ও ঐন্দ্রিলার দাম্পত্য-সম্পর্ক, উহাদের স্থূল আত্মাভিমান ও ভোগস্পৃহা রাবণ-চিত্রাঙ্গদার মহাকাব্যীয় রাজমহিমার ভাবসমুন্নতিমূলক প্রকাশমাত্র নহে—ইহাতে প্রাকৃত জীবনের বস্তুরস ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই মুখ্য উপাদান। ইহারা কেহই মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকার উপযুক্ত নহে। হঠাৎ-বড় মানুষের আত্মম্ভরিতা, অশোভন জিদ ও আবদার, আত্মপ্রাধান্যের মত্ত আস্ফালন ইহাদের চরিত্রের প্রধান উপাদান। সুতরাং ইহাদের চারিদিকে যে পরিমণ্ডল রচিত হইয়াছে তাহাও এই নিম্নস্তরের জীবনযাত্রার সমপর্যায়ের। এই আবহাওয়ায় ইন্দ্রের দেব-মহিমা ও নিঃস্বার্থ রাজকর্তব্যনিষ্ঠা, শচীর ভাব-গরিমা, রুদ্রপীড়ের উদার শৌর্য—প্রভৃতি মহাকাব্যোচিত চরিত্র-গৌরবের দৃষ্টান্তগুলিও যেন ম্লান ও প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা-লিপ্ত হইয়াছে। শচীর পুত্র-বাৎসল্যের মধ্যেই তাহার দেবপ্রকৃতি বিশেষভাবে প্রকটিত—এইখানেই ঐন্দ্রিলার সহিত তাহার সহধর্মিত্ব। ইহাতেই কাব্যটির সংসারকেন্দ্রিকতা প্রমাণিত। রাবণের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা প্রসঙ্গতঃ একটু-আধটু শুনি, কিন্তু ইহার স্নেহ-মমতা বিস্তৃততর রাজকর্তব্য-

পরিধির মধ্যে বিলীন হইয়াছে। বৃত্রের প্রধান পরিচয় পরিবার-গোষ্ঠীর কর্তারূপে, প্রশ্রয়শীল স্বামী ও স্নেহশীল পিতারূপে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দুবালার রণবিমুখ শান্তিপ্রিয়তা, তাহার প্রকৃতির পুষ্প-পেলব রমণীয়তা ও শত্রুমিত্র-ভেদজ্ঞানহীন, উদার সমদর্শিতা নিতান্ত বেমানান বলিয়া মনে না হইতেও পারে। যেখানে গার্হস্থ্য সুখশান্তিই প্রধান সুর ও যুদ্ধবিগ্রহ উহার একটা সাময়িক বিপর্যয়, সেখানে ইন্দুবালা-চরিত্র একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে। ঐন্দ্রিলা-শচী-রতি-চপলা প্রভৃতি নারীচরিত্র-সমাবেশে কাব্যে যে একটি ভাববৃত্ত রচিত হইয়াছে, ইন্দুবালা তাহার কোমলতম, নমনীয়তম বিন্দুরূপে উহার সম্পূর্ণতাবিধান করিয়াছে। দিকে দিকে প্রজ্বলিত সমরানলের পিছনে গার্হস্থ্য জীবনের যে শান্তিবারি-সেচনের অভিপ্রায় কবির অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন ছিল ইন্দুবালা-চরিত্র তাহারই অনাবৃত, উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। সে দৈত্যকুলে দেবী; সুতরাং অসুর-বিক্ষুব্ধ স্বর্গলোকে দেবরাজ্য-প্রতিষ্ঠার পূর্বসূচনারূপে কাব্যমধ্যে তাহার একটি সঙ্গত স্থান আছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীতে মহাকাব্যিক আবেদনের অভাব

নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই কাব্যত্রয়ীকে মহাকাব্য-লক্ষণান্বিত, ও মহাকাব্যের আদর্শে বিচারণীয় বলিয়া কোন মতেই মনে করা যায় না। ইহাদের মধ্যে যে বিরাট পরিকল্পনা ও স্থানে স্থানে ভাবগাম্ভীর্য আছে, তাহার মধ্যে মহাকাব্যের কিছু কিছু উপাদান থাকিলেও, ইহা সামগ্রিকভাবে একেবারেই মহাকাব্য-জাতীয় নহে। প্রথমতঃ এই রচনাগুলি তত্ত্বপ্রধান; কৃষ্ণের দেবত্ব-প্রতিপাদন ও তাঁহার মহাভারত-স্থাপনের উপযোগী বিরাট রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা ও উদার ধর্মনীতির ব্যাখ্যা ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের ঐতিহাসিক অংশ কবিকল্পনা-প্রসূত ও কবির তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কল্পনার চমৎকারিত্ব ও ভাবমহিমা থাকিলেও ইহা পাঠকের পূর্ব-সংস্কার-বিরোধী বলিয়া যে পরিচিত বাতাবরণ মহাকাব্যিক আবেদনের প্রধান উপাদান তাহার অভাব এখানে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বিখ্যাত সমালোচক প্যাটিসন মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহা জীবন-কল্পনা (Scheme of life), জীবনের প্রত্যক্ষ-সংযোগ-সঞ্জাত নহে, সেই মন্তব্য নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অবশ্য কাব্যে গভীরভাবে অনুভূত ও উপস্থাপিত জীবনকল্পনারও স্থান আছে; কিন্তু সে কাব্য মহাকাব্য-পর্যায়ভুক্ত হইবে না।

হেমচন্দ্র অপেক্ষাও নবীনচন্দ্র অধিকতর মাত্রায় গার্হস্থ্য জীবনের রসাতুর ও

ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণ। কাজেই তাঁহার কৃষ্ণের জীবন-সাধনা ব্যাখ্যার সঙ্গে পারিবারিক জীবনের তরল রসোচ্ছ্বাস প্রচুর পরিমাণে মিশিয়াছে। আসলে নবীনচন্দ্র ভক্তিরস ও ভাববিলাসের কবি। মহাভারত-প্রতিষ্ঠার রাষ্ট্রিক আয়োজন ও নবরাজ্য-সংস্থাপকের নীতি-কৌশল ও দূরদর্শিতা তাঁহার কাব্যে গৌণ; কৃষ্ণভক্তি-প্রচারের দ্বারা মানুষের চিত্তশুদ্ধি ও প্রেমোন্মত্ততার প্রভাবে হিংসা-দ্বেষ-ভেদবুদ্ধির বিলোপই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং তত্ত্বের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের যে ভাগীরথী-ধারা তাঁহার কাব্যে প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার উপাদান-বিন্যাসের দৃঢ়তা ও মূলকল্পনার কেন্দ্রিকতা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়াছে। 'রৈবতক'-এ আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে নাটক-রোমাঞ্চ ও বীররস-স্ফুরণের ভূমিকা রচনা করিয়াছিল, আখ্যানের পরবর্তী স্তর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিয়া এই প্রতিশ্রুতিকে ব্যর্থ করিয়াছে। 'রৈবতক'-এ অর্জুন-সুভদ্রার প্রেম ও সত্যভামার রসিকতা শৌর্য-ও-কূটনীতি-প্রধান বাতাবরণের মধ্যে কতকটা সহনীয়; ব্যাসাশ্রমে শিশুদের স্খলিতবাক্ অভিবাদন উন্নত ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে একেবারে বিসদৃশ বোধ হয় না। কিন্তু 'কুরুক্ষেত্র'-এ মহাভারতের সুপরিচিত বস্তুবিন্যাস ও রসাবেদনের মধ্যে একদিকে 'রৈবতক'-এর কল্পনাপ্রসূত ঐতিহাসিক পরিবেশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; অপরদিকে অভিমন্যু-উত্তরা-সুলোচনার পুতুলখেলার ন্যায় তরল-চপল আচরণ, বাঙালী-পরিবার-সুলভ সোহাগ-মান-অভিমানের চটুল আতিশয্য শুধু যে মহাকাব্যের পরিপন্থী তাহা নহে, আখ্যান-কাব্যের যে পূর্বতন ভাবসমুন্নতি তাহার সহিতও সঙ্গতিহীন। 'প্রভাস'-এ একদিকে যেমন জলোচ্ছ্বাস-প্রলয় ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের উদাত্ত-গম্ভীর, সুষ্ঠু-ব্যঞ্জনাপূর্ণ বর্ণনা আছে, অপরদিকে আবার নামসংকীর্তনের ভাবমত্ততা মহাকাব্যের সু-উচ্চ মালভূমিকে ভক্তিপ্লাবনের নীচে ডুবাইয়া দিয়াছে। বিরাট পরিকল্পনার নানামুখী বিস্তারে যে রচনার আরম্ভ তাহার শেষ পরিণতি ক্রম-সংকুচিত, একক ভাবাবেগের সর্বগ্রাসিতায়। এ যেন হিমালয়ের বিচিত্র, বহু-বিস্তৃত ভূমিপ্রসারের কুমারিকা অন্তরীপের সমুদ্র-কবলিত, সূক্ষ্মাগ্র বিন্দুতে ভাবসর্বস্ব পরিসমাপ্তি।

কাব্যত্রয়ীর অধিকতর গার্হস্থ্য-প্রবণতা ও পরিকল্পনার ক্রম-সংকোচ

আসল কথা, নবীনচন্দ্রের মহাভারতীয় পরিকল্পনার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট গঠনসুষমা বা আভ্যন্তরীণ ভাবসঙ্গতি ছিল না। তাঁহার অসংযত ভাবোচ্ছ্বাস, বৃহৎ ও মহৎ হইতে অতর্কিতভাবে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছে অবতরণ, তাঁহার আখ্যান-

বিবৃতির মধ্যে অতিপল্লবিত বিস্তার, অতিরিক্ত ভাবার্দ্রতার প্রক্ষেপ ও গীতিমূর্ছনার অবাঞ্ছিত অতিরেক—এই সমস্ত লক্ষণই তাঁহার স্থির মননশীলতা ও সদাজাগ্রত শিল্পবোধের অভাবই সূচিত করে। এই প্রবণতাগুলি কেবল যে মহাকাব্য-বিরোধী তাহা নহে; যে কোন সুষম আখ্যান বা তত্ত্ব-মনন-মূলক রচনার পক্ষেই ইহা অনুপযোগী। তাঁহার বিরুদ্ধে যথার্থ অভিযোগ তাঁহার কবিত্বশক্তির অপ্রাচুর্য নহে, ইহার অপপ্রয়োগ। গীতার জ্ঞান-ও কর্ম-যোগী শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিতে গিয়া যিনি শ্রীচৈতন্যচরিত্র-সুলভ রসবিহ্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার কবিত্বের পরিমাণ যাহাই হউক তিনি যে উপায়-দক্ষ নহেন ইহা সুনিশ্চিত। পদাবলীর ভক্তিবিহ্বল রসোচ্ছ্বাসে যাহার পরিণতি, উদাত্ত-গম্ভীর তত্ত্ব-উপস্থাপনায় তাহার প্রারম্ভে কোন সঙ্গত ভাব-সংযোজনার নিদর্শন মিলে না। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ক্রমস্ফীত-গীতি-নির্ঝর-দীর্ণ মহাকাব্য-শৈলশৃঙ্গে তাঁহাদের কাব্যসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে দৃঢ় আশ্রয়ভূমি হইতে স্খলিত হইয়া নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন ও উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন ইহাই তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। যে গীতিধারা স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত হইবার সুযোগ পাইলে তাঁহাদিগকে কীর্তিসমুদ্র-সঙ্গমে অবলীলাক্রমে পৌঁছাইয়া দিত, তাহাই মুহুর্মুহু প্রস্তর-বেষ্টনীর মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া হয় শুষ্ক হইয়াছে, না হয় দৃঢ় পদক্ষেপের অযোগ্য ভাবার্দ্র জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আখ্যান ও গীতের বিসদৃশ মিলনে উভয় রীতিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে—আখ্যানের মধ্যে গীতের ভাবাতিশয্য ও গীতের মধ্যে আখ্যানের বস্তুকাঠিন্য অনুপ্রবেশ করিয়া উভয়কেই অনেক পরিমাণে স্বধর্মচ্যুত করিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের মহাভারতীয় কল্পনার ভাব-অসঙ্গতি

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই কিছু বিশুদ্ধ গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' দুই ভাগ (১৮৭০, ১৮৮০); 'বিবিধ কবিতা' (১৮৯৩) ও 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮); নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১, ১৮৭৮)—এইগুলি তাঁহাদের গীতিকবিতাসংগ্রহ। এই যুগে তত্ত্বাচ্ছন্ন ও মননির্ভর কবিগোষ্ঠীর বিশুদ্ধ গীতিমানস তখনও নির্বারিত হয় নাই। হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত', 'পদ্মের মৃণাল এক', 'প্রভু, কি দশা হবে আমার' ইত্যাদি কবিতায় কবির তীব্র স্বাজাত্যবোধ, জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন সম্বন্ধে ভাবনা ও নিজ অন্ধত্বের জন্য মনোবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কবির মনোভাবের আন্তরিকতা সত্ত্বেও, তাঁহার প্রকাশ আবেগময়

হেম-নবীনের গীতিকবিতা

ও কল্পনা-ভাস্বর হইয়া উঠে নাই; ভাবনার ধূম্ররাশি ভাবের অগ্নিদীপ্তি লাভ করে নাই। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'র 'পিতৃহীন যুবক' যদিও আত্মজীবনের করুণতম অভিজ্ঞতার কাব্যরূপ, তথাপি, ইহার অপরিমিত দৈর্ঘ্য ও উক্তির পৌনঃপুনিকতা রসকে জমাট বাঁধিতে দেয় নাই এবং প্রকাশ-দুর্বলতার দ্বারা ইহার ভাবের অকৃত্রিমতা বহু স্থলেই বিড়ম্বিত হইয়াছে। তাঁহার 'ভারত-উচ্ছ্বাস' হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীতের' সহিত তুলনায় নিকৃষ্ট স্তরে স্থান পাইয়াছে। বরং হেমচন্দ্রের বৃহৎ কাব্য 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫) স্থানে স্থানে ভাবের গভীর উপলব্ধি ও সুমিত প্রকাশে উন্নত গীতি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। হেম-নবীনের অধিকাংশ কবিতাতেই কাব্য-প্রেরণা আসিয়াছে কোন তত্ত্ব বা বহির্ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া; সমস্ত বহির্ব্যাপার-নিরপেক্ষ নিবিড় অন্তর-অনুভূতি কবির মনে এক অখণ্ড রসের অনিবার্য প্রকাশ-আকৃতি উদ্রিক্ত করে নাই।

বাংলা-সাহিত্যে হেম-নবীনের স্থান

সমকালীন সমালোচক-গোষ্ঠী মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বর্তী কালে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের জন্য যে প্রধান আসন নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক সমালোচনার মানদণ্ডে কতকটা অতিপ্রশংসামূলক বলিয়া মনে হইলেও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যথার্থ বিচারবুদ্ধি-প্রণোদিত। বাংলা কাব্যের অগ্রগতির প্রধান শাখা তাঁহাদের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিল। বিষয়-গৌরব, সমসাময়িক রুচির অনুবর্তন, ভাবনার সমুন্নতি ও কাব্যশক্তির, অসম হইলেও, উন্নত প্রকাশ—এই সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলে উঁহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হয়। ইঁহাদের যথার্থ স্থান নির্ণয় করিতে হইলে ইঁহাদের তুলনা করিতে হইবে মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় যুগাতিসারী কবির সঙ্গে নহে, যাঁহাদের কাব্যে যুগচেতনা আংশিকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেই যুগানুগত কবি-গোষ্ঠীর সঙ্গে। অবশ্য বিহারীলাল সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ ও আত্মসমাহিত গীতিকবি হইয়াও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাব-শিল্পের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের জন্য ভবিষ্যৎ কাব্য-ধারার পথিকৃতের গৌরব অর্জন করিয়াছেন। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যে পৌরাণিক মহাকাব্যের দিন ফুরাইয়াছে তাহার অনুশীলন ও যে গীতি-কবিতার দিন আসিতেছে তাহার সার্থক প্রত্যুদ্গমনে অক্ষমতার জন্য ভবিষ্যৎ-নিয়ন্ত্রণের অধিকার হারাইয়াছেন। তথাপি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫),

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ কাব্য' (১৮৮১) প্রভৃতি কল্পনাশ্রয়ী, নিরাশ-প্রণয়মূলক ও উদ্ভট ও অবাস্তব ঘটনাজালে কুহেলিকাচ্ছন্ন কাব্যের সহিত তুলনায় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যে অনুভূতির গাঢ়তা ও ভাবসত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাব্য সম্বন্ধে আমাদের মতের যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৫

রবীন্দ্রপূর্ব গীতিকবিগোষ্ঠী

বিহারীলালের পূর্বেও যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গীতি-কবিতার অনুশীলন হইতেছিল, তাহার নিদর্শন মিলে অধুনা-বিস্মৃত-প্রায় বহু কবির রচনা হইতে। এই সমস্ত গীতি-কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষের পরিচয় না মিলিলেও এবং ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির আপেক্ষিক অভাব ও প্রচলিত রীতির অনুবর্তনে ভাববিলাসের অতি-প্রাদুর্ভাব দেখা গেলেও, ইহারা কাব্যময় ভাষার অনুশীলনে ও আত্মগত ভাবধারার প্রবাহকে চালু রাখিয়া প্রতিভা-চিহ্নিত গীতিকবির আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল। কাব্যাকাশে বাষ্পাকার ভাবরাশির ইতস্ততঃ সঞ্চরণ-শীল লঘু মেঘমালা কখন যে অনুকূল বায়ুর প্রভাবে সংহত ও নিবিড় হইয়া ধারাবর্ষণে আপনাকে মুক্তি দিবে, কখন যে প্রথানুসরণের মধ্যে প্রতিভার স্বকীয়তা দীপ্ত হইয়া উঠিবে তাহা নিশ্চিত করিয়া নির্ধারণ করা যায় না। তথাপি সকল দেশের সাহিত্যে বহু পথিকের যাতায়াতের চিহ্নিত রাজপথ দিয়াই একদিন প্রতিভার স্বর্ণরথ বিজয়যাত্রার প্রেরণা লাভ করে। এই প্রাক্-বিহারীলাল কবিগোষ্ঠীর মধ্যে **ভুবনমোহিনী দেবীর** ছদ্মনামধারী **নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (১৮৫২—১৯২২), 'যমুনা-লহরী' ও 'ভারতবিলাপ'-এর কবি **গোবিন্দচন্দ্র রায়** (১৮৩৮—১৯১৭), সদ্ভাবশতক-এর (১৮৬১) কবি **কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার** (১৮৩৭—১৯০৬) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

প্রাক্-বিহারীলাল গীতিকবি

রবীন্দ্রনাথের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ও তাঁহার জীবনকালে আবির্ভূত অনেক প্রতিষ্ঠাবান কবি তাঁহার আবির্ভাবের আকস্মিকতাকে ভূমিকা-প্রস্তুতির সূচনা

দ্বারা কিছু পরিমাণে খণ্ডিত করেন। এই কবিদের আলোচনা করিলে এই ধারণাই জন্মে যে রবীন্দ্রনাথ আকাশ হতে পড়েন নাই, বাংলা দেশের বহুকর্ষিত কাব্য-মৃত্তিকাতেই বীজরূপে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল। **সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের** (১৮৩৮—১৮৭৮) 'মহিলা' কাব্য (১৮৮০, ১৮৮৩) বিষয়ের দিক দিয়া এক যুক্তিনিষ্ঠ আবেগমুক্ত তথ্যদৃঢ় রূপের পরিচয় বহন করে। কাব্যরীতির দিক দিয়া তিনি বিহারীলালের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে নারীসৌন্দর্য ও প্রেম সাধারণ কবির মনে আবেশমত্ততার সৃষ্টি করে তাহারই বর্ণনায় তিনি ক্লাসিকাল রীতির মননশীল দৃঢবদ্ধতা ও শ্রদ্ধান্বিত ভাবসংযমের পরিচয় দিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্য

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০—১৯১৯) বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের ভাব-সমন্বয়পুষ্ট কবি। তাঁহার আবেগ ও হৃদয়োচ্ছ্বাস বিহারীলালের ন্যায় গভীর হইলেও উহার প্রকাশ সুরেন্দ্রনাথের সংযম ও যুক্তি-নিবদ্ধ রীতির সমধর্মী। তাঁহার 'নারীবন্দনা' কবিতায় সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়; তাঁহার 'মানববন্দনা'-য় জীববিবর্তন-বাদের বিজ্ঞানতত্ত্ব, মানবের ক্রমাভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তর, ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্ররূপক ও ভাষার ঘনবদ্ধ, অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্তির সাহায্যে চমৎকারভাবে কাব্যোচিত প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এইরূপ কাব্যরূপায়ণের সার্থক দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তাঁহার পত্নীবিয়োগ উপলক্ষে রচিত 'এষা' (১৯১২) গভীর বেদনাবোধের সহিত দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছে। তাঁহার মননপ্রধান কাব্য পরিমাণের স্বল্পতা ও জিজ্ঞাসা-কণ্টকিত ভাবধারার প্রবাহের বেগহীনতার জন্য বাংলা সাহিত্যে উহার ন্যায্য প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার বড়াল

দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৪—১৯২০) কবিতায় বাঙালীর চিরন্তন গার্হস্থ্য রস-পিপাসা বর্ণাঢ্য কল্পনা ও অরূপলোকের ইঙ্গিতবাহী ঐকান্তিক ভক্তির সংস্পর্শে এক নূতন আস্বাদ-নিবিড়তা লাভ করিয়াছে। তিনি আমাদের সাধারণ গৃহাঙ্গনে ছোট ছোট শিশুর খেলায় ও হাসিতে, দাম্পত্য প্রেমের স্বভাবমাধুর্যে, পারিবারিক সম্পর্কের সহজ প্রীতি-বিনিময়ে বৈষ্ণব কবির ভাব-প্রগাঢ়তা, বৃন্দাবনের অলৌকিক রসব্যঞ্জনা, অশোক-পলাশের রক্তিম রাগের অতিরঞ্জন আরোপ করিয়া উহাকে অসাধারণত্ব-মণ্ডিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেনের মতই তাঁহার ভাবাকুলতা, তাঁহার হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত, অসংবরণীয়

দেবেন্দ্রনাথ সেন

রূপপিপাসা, কিন্তু তাঁহার রচনার পরিণততর শিল্পবোধ ও প্রকাশদক্ষতা তাঁহাকে নবীনচন্দ্রের ভাবপ্লাবনে অসহায় আত্মসমর্পণের দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। তথাপি তাঁহার অনেক কবিতায় কষ্টকল্পনা, অপরিমিত বর্ণবিলাস ও অনুভূতির অসমতা লক্ষিত হয়। তাঁহার অতি-প্রখর ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensuousness) সময় সময় অধ্যাত্ম-ইঙ্গিতের সীমার মধ্যে সংযত না থাকিয়া মাত্রাতিরিক্ত উগ্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়ে অতিগুরু ভাবতাৎপর্যের আরোপ, রং লইয়া মাতামাতি, আবীর-কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি তাঁহার কাব্যে ঔচিত্য ও পরিমিতিবোধের অভাবও সূচিত করে। তাঁহার সনেটসমূহে গাঢ়তা ও শিথিলতার যুগপৎ অবস্থিতিও তাঁহার কাব্যপ্রেরণার অসমত্বের পরিচায়ক।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৬—১৯১৮) ঢাকা জেলায় ভাওয়ালের কবি-রূপে পরিচিত। তাঁহার কাব্যে দুর্বার আবেগ, অসঙ্কোচ দেহভোগ-কামনা ও তীব্র বেদনাময় জীবন অভিজ্ঞতার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। তাঁহার প্রেম-কবিতায় তিনি কবিসুলভ আদর্শবাদের ও অতীন্দ্রিয় মিলনাকূতির স্নিগ্ধ-শীতল পানীয়ের পরিবর্তে উগ্র দেহলালসার উত্তেজক সুরা পরিবেশন করিয়াছেন। গৈরিক অগ্নিস্রাবের ন্যায় অসংযত ও সময় সময় সুরুচির সীমালঙ্ঘী ভাব-প্রকাশে তিনি এক অসাধারণ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অনুভূতির প্রখরতার অনুরূপ শিল্পসংযম থাকিলে তিনি উনবিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। তথাপি তিনি বাংলা কাব্যের স্থির, শান্ত, নীলাম্বর-প্রতিবিম্বিত সরোবরে এক উষ্ণ জীবনধারা, এক আবিল স্রোতোবেগ প্রবেশ করাইয়া ইহার শক্তিবৃদ্ধি ও বাস্তব জীবনের সহিত ইহার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করিয়াছেন। ইঁহার কবিতার প্রকাশভঙ্গীর রূঢ় সবলতা ও অকৃত্রিম ভাবানুসারিতা বাংলা কাব্যে এক নূতন সুর ধ্বনিত করিয়াছে।

মহিলা-কবি

এই যুগের গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে অনেকগুলি মহিলা-কবির আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র কবি চন্দ্রাবতী ছাড়া আর বড় একটা নারী-কবির নাম শোনা যায় না। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীতে প্রেম-ভক্তির যে সর্বজনীন রস-মহোৎসব, তাহাতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের বিশেষ কোন নিদর্শন মিলে না। পদাবলীর মাধবী হয়ত কোনও সখীভাববিভোর পুরুষ-পদকর্তার

ভাব সাধনার ছদ্মবেশ। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিকে, নর-নারীনির্বিশেষে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের ফলে, হয়ত বা পুরুষ-কবির ভাববিহ্বল স্তবস্তুতির প্রেরণায়, নারীর অন্তর-দ্বার উন্মোচিত হইল ও তাহার মনে আত্ম-প্রকাশের আবেগ সঞ্চারিত হইল। এই মহিলা-কবিগোষ্ঠীর মধ্যে **স্বর্ণকুমারী দেবী** (১৮৫৫—১৯৩২), **গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী** (১৮৫৮—১৯২৪), **মানকুমারী বসু** (১৮৬৩—১৯৪৩) ও **কামিনী রায়ের** (১৮৬৪—১৯৩৩) নাম সম্মানিত উল্লেখের দাবি করে। এই মহিলা-কবিগণ সকলেই দীর্ঘজীবী ছিলেন ; তাঁহাদের জীবন-কাল রবীন্দ্রনাথের অন্তিমযুগ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যজীবন অতীতের স্মৃতিরোমন্থনাশ্রয়ী, হারানো যুগের ম্লান গোধূলি-আলোকে ধূসর। রবীন্দ্রকাব্যের নবভাবধারার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস তাঁহাদিগকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। ইঁহাদের কবি-প্রেরণা, এক কামিনী রায় ব্যতীত অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রেই, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। পারিবারিক জীবনের বেদনাময় আঘাত, প্রিয়জন-বিরহ, পুত্র-কন্যার প্রতি আশঙ্কা-ব্যাকুল, নিবিড়-সংসক্তিপূর্ণ স্নেহ-মমতা, ভাগ্য ও ভগবানের প্রতি অশ্রুবিহ্বল, দীর্ঘশ্বাসক্ষুব্ধ অনুযোগ, জীবন-রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তার জন্য মৃদু খেদ ও ক্ষোভ—বিরল ব্যতিক্রম সত্ত্বেও তাঁহাদের কবিতার সাধারণ ভাব ও বিষয়। তাঁহাদের সমস্ত কবিতায় একটা শান্ত, বিষণ্ণ আত্মনিবেদনের সুর শোনা যায়। তাঁহাদের কবিতা, তুলসী-তলায় জ্বালা সন্ধ্যাদীপের স্তিমিত আলোকের ন্যায়, যিনি মানববুদ্ধির অগোচর, সংসারের সুখদুঃখের বিধাতা, তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভাবারতির স্নিগ্ধ, শান্ত অর্ঘ্যরচনা। তাঁহাদের কথাগুলি যেন অবগুণ্ঠনের আড়াল হইতে মৃদুস্বরে ফিস-ফিস করিয়া বলা ; কোথাও কণ্ঠস্বরের উচ্চতা, আবেগের উদ্দামতা বা কল্পনার ঊর্ধ্বচারী মহনীয়তা নাই। সংসার-জীবনেও যেমন, কাব্যজীবনেও তেমনি, নারীসত্তার অবগুণ্ঠিত প্রকাশ এই কবিতাগুলিতে রূপ পাইয়াছে। মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি, অন্তররুদ্ধ আবেগের মৃদু স্পন্দন, প্রকাশের মর্মস্পর্শী, নিরাভরণ সরলতা, জীবনজিজ্ঞাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষতা নারীর অন্তর-সৌকুমার্যের সুরভিত পরিচয় বহন করে। ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে, যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে নারীপ্রেমের বিচিত্র পরিচয়, নারীহৃদয়ের অপরিমেয় রহস্যের অপূর্ব গাথা রচনা করিতেছেন, তখন তাঁহারই প্রায় সমকালীন মহিলা-কবিরা আপনাদের এই ভাববৈচিত্র্য, হৃদয়ের এই আবেগ-উদ্বেলতার ইঙ্গিতমাত্র না দিয়া কেবল ঘর-কন্নার কথায়, ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ-চিন্তাভাবনা-বিজড়িত সংসার-জীবনের প্রতিচ্ছবিতেই

তাঁহাদের কাব্য প্রেরণাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। যেখানে প্রতিবেশীর গৃহে নারীর চারিদিকে হাজার রংমশাল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেখানে ইঁহারা নিজের ঘরে কেবল স্তিমিত গৃহপ্রদীপের মিটমিটে আলোকেই আত্মপরিচয় অর্ধ-উদ্ঘাটিত করিয়া সন্তুষ্ট আছেন। নারীর দ্বৈতসত্তার যে জ্যোতির্বিভাসিত দিকটি পুরুষের চক্ষে উদ্ভাসিত হয়, নারীর চক্ষে সে দিকটা অদৃশ্য থাকাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবন্ধ-সাহিত্য

১

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের ফলে যখন কোন জাতির মধ্যে নানাবিষয়ক কৌতূহল এবং জগৎ ও জীবনের জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে পিপাসা জাগিয়া উঠে, তখনই সে জাতির সাহিত্যে প্রবন্ধরচনার সূত্রপাত হয়। প্রবন্ধের বাহিরের রূপ ইহার আকারের আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতা ও স্বল্পপরিসরে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দ্বারা নির্ণীত হয়। সাময়িক পত্রিকাই প্রবন্ধ সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণা ও প্রধান আশ্রয়স্থল যোগাইয়াছে। ইহার কলেবর পূর্ণ ও পাঠকসাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে এই ক্ষুদ্রাকার, তথ্যপূর্ণ রচনা-সম্ভারের প্রয়োজন। সেই একই কারণে ইহা যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় ও সরস ভঙ্গীতে লিখিত হইবার দাবি করে। একটা সমগ্র গ্রন্থ পড়িতে যে পরিমাণ অখণ্ড মনোযোগ ও গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন, ইহার দুরূহ তত্ত্ব ও গুরুগম্ভীর রচনাপদ্ধতি আয়ত্ত করিতে যে মানসিক প্রয়াস অপরিহার্য, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যাহাতে সে পরিমাণ মাথাঘামান দরকার না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার ভাবগ্রন্থন ও প্রকাশভঙ্গী নিয়মিত হয়। সুতরাং ইহার পিছনে একদিকে যেমন থাকে জ্ঞান-পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তেমনি থাকে বিষয়ের আয়তন ও দুরূহতা যথাসম্ভব কমাইয়া এই জ্ঞানের সহজ উপস্থাপনা। তথ্য ও তত্ত্ব যাহাতে ভার না হইয়া উপভোগ্যরূপে অন্তরে প্রবেশ করে সেই মূল-উদ্দেশ্য লইয়াই প্রবন্ধ-সাহিত্যের সূত্রপাত।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের মূলসূত্র

প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ-জাতীয় কোন রচনার নিদর্শন মিলে না। অবশ্য সেখানে প্রবন্ধ শব্দটি প্রকৃষ্ট-বন্ধন-সমন্বিত বৃহৎ রচনাকেই বুঝাইত। তবে রামায়ণ-মহাভারত বা ভাগবত-পুরাণাদির মূল-আখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে যে সমস্ত ছোট ছোট গল্পের সাহায্যে কোন নীতিতত্ত্বের বা ধর্মসমস্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা বা স্বরূপ-প্রতিপাদন-চেষ্টা হইত সেই প্রচেষ্টাগুলিকে প্রবন্ধ-পর্যায়ভুক্ত করা চলে। অবশ্য যে জাতীয় গল্পে গল্পরসটা গৌণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই মুখ্য, গল্প যেখানে কেবলমাত্র কোন সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার উপায়রূপে ব্যবহৃত হইত,

প্রাক্-আধুনিক যুগে প্রবন্ধ-সাহিত্যের অনুপস্থিতি

সেইখানেই ইহা প্রবন্ধের সমধর্মী। এই মানদণ্ডে কিছু কিছু বৌদ্ধ জাতককেও প্রবন্ধের পূর্বরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত খণ্ড-আখ্যান বৃহত্তর ধর্মকাব্যসমূহের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে তাহাদের বিরাট কলেবরে বিলুপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। আর যেখানে ধর্মতত্ত্ব-আলোচনায় কেবলমাত্র শাস্ত্রানুগত্যই প্রধান, স্বাধীন বুদ্ধির বিকাশ সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানেও প্রবন্ধের পূর্বলক্ষণ আবিষ্কার করা যায় না।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ

সুতরাং প্রবন্ধ ইহার বিশেষ অর্থে যে আধুনিক যুগেরই আবির্ভাব তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। ইহার উদ্ভবের প্রথম উপলক্ষ্য হইল উনবিংশ শতকের প্রথমে ধর্মবিষয়ক বাদানুবাদ। রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজক-গোষ্ঠীর ধর্মবিরোধকে কেন্দ্র করিয়াই প্রবন্ধের কায়া প্রথম নির্মিত হয়। অবশ্য আধুনিক অর্থে প্রবন্ধের আত্মা বা অন্তরের বিশেষ রসাবেদনের যে কতটুকু ইহাদের মধ্যে আছে তাহা বলা শক্ত। তবে ইহার বহিরঙ্গের প্রথম সাক্ষাৎ আমরা এইখানেই পাই।

প্রবন্ধে সাহিত্যরসের মূল-উৎস

অতিরিক্ত উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতা ও প্রকাশ সৌষ্ঠবহীন যুক্তিতর্ক-সর্বস্বতা প্রবন্ধের সাহিত্যিক গুণ-বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ। যখন প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে, যখন কি বলা হইল অপেক্ষা কেমন করিয়া বলা হইল এই প্রশ্নই আমাদের নিকট বড় হইয়া দেখা দেয়, তখনই প্রবন্ধের সাহিত্যরস সঞ্চিত হইবার অনুকূল সময় আসে। যখন কোন প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নহে, লেখকের নিজেরই মননশীলতা বা ভাবপ্রেরণা এক অনুকূল পাঠকগোষ্ঠীকে শ্রোতারূপে কল্পনা করিয়া আত্মবিকাশের পথ খোঁজে তখনই প্রবন্ধে রসসঞ্চার হয়। জ্ঞান-বিতরণ উদ্দেশ্য হইলেও যখন উহার পরিবেশন-প্রথার হৃদয়গ্রাহিতাকে সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়, তখন জ্ঞানের বস্তু রসের পর্যায়ে পদক্ষেপ করে।

অক্ষয়কুমার দত্ত

এই সাহিত্যরস-সৃষ্টিপ্রয়াসী প্রাবন্ধিক-গোষ্ঠীর মধ্যে **অক্ষয়কুমার দত্ত** (১৮২০-১৮৮৬) কালের দিক দিয়া সর্বাগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁহার সমস্ত রচনাই, ছোট হউক বড় হউক, প্রবন্ধধর্মী। তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' (১৮৫২-১৮৫৩), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০, ১৮৮৩) ও 'ধর্মনীতি' (১৮৮৫)—বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা-সংযুক্ত ; অখণ্ড গ্রন্থ হইলেও ইহাদের এক-একটি অধ্যায়ের মধ্যে

প্রবন্ধের রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় ও ভঙ্গীর সরসতা ও ব্যক্তিক অনুভূতির আপেক্ষিক অপ্রাচুর্য থাকায় ইহারা প্রবন্ধ হিসাবে খুব উচ্চ স্তরে পৌছায় নাই। কিন্তু তাঁহার 'চারুপাঠ' তিন খণ্ড (১৮৫২, ১৮৫৪, ১৮৫৯) সত্যিকার প্রবন্ধ-সংগ্রহ। এই লেখাগুলিতে অক্ষয়-কুমারের চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনের প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দপ্রয়োগে ও বাক্যগঠনরীতিতে কিছুটা গতিস্বচ্ছন্দতা, অনায়াস-লভ্য সাবলীলতার অভাব থাকিলেও তাঁহার মননের ঋজুতা ও তথ্যের বিন্যাস-পারিপাট্য পাঠকচিত্তের অভিনন্দন লাভ করে। তাঁহার তিনটি স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক নিবন্ধ, ইংরেজ প্রাবন্ধিক অ্যাডিসনের দৃষ্টান্ত-প্রভাবিত হইলেও, রূপক-কল্পনার সার্থক প্রয়োগ ও লেখকের নিবিড় মানসানুভূতির স্পর্শে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপদবাচ্য হইয়াছে, শুধু তথ্য ও জ্ঞানের প্রকাশ-সীমা অতিক্রম করিয়া পাঠকের মনে রসবোধের গভীরতর আগ্রহ জাগাইতে সমর্থ হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর (১৮২০-১৮৯১) ছন্দসুললিত ও প্রসাদগুণাঢ্য রচনার মধ্যে প্রবন্ধের বিশেষ দর্শন মিলে না। তাঁহার শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'বোধোদয়' বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি হইলেও, ইহার বিষয় ও বিন্যাসরীতি এত সর্বজনবোধ্য প্রাথমিক স্তরের যে ইহাতে প্রবন্ধের যে আদি-লক্ষণ মননশীলতা তাহারও বিশেষ স্পর্শ পাওয়া যায় না। তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' ও 'বহুবিবাহ'-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও মতপ্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত ও আকারে এত বড় যে প্রবন্ধের বিশুদ্ধ ও ফল-নিরপেক্ষ জ্ঞানসাধনা উহাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই। তবে তিনি প্রবন্ধ না লিখিলেও প্রবন্ধের উপযোগী মার্জিত ও সুগঠিত ভাবসৃষ্টির কার্যে সহায়তা করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়মিত লেখক এবং ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকরূপে প্রবন্ধ-সাহিত্যের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংপৃক্ত ছিলেন। তাঁহার রচনায় পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা সৌন্দর্যবোধ ও গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির আধিক্য ছিল। এই লেখাগুলির মধ্যে লেখকের মনের একটি বিশেষ ভাবমুগ্ধতা, তাঁহার অন্তর-বিচ্ছুরিত একটা জ্যোতির্ময় অনুভূতি প্রবন্ধের একটা নূতন প্রকাশ-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তত্ত্বালোচনাকে কাব্যলোকের অনির্বচনীয় রহস্যলোকে উন্নীত করিয়াছে। তাঁহার রচনায়

জ্ঞান-বিজ্ঞানের খাঁচায় আবদ্ধ প্রবন্ধ-পাখী যেন ব্যক্তিমনের খোলা জানালা দিয়া মুক্তিলাভ করিয়া অসীম নভোবিহারের পথে উধাও হইয়াছে। তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে (১৮১৮) যুক্তিধর্মী, তথ্যভারবাহী প্রবন্ধ আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের, মন্ময় অন্তরঙ্গতার একটি নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই সুরটি পরবর্তী যুগে তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথে আরও প্রসারিত ও বিচিত্র গ্রামে ধ্বনিত হইয়া প্রবন্ধের নূতন রূপবিধান করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য ততটা ছিল না; তৎপরিবর্তে ছিল ভাবানুভূতির প্রগাঢ়তা।

২

রাজনারায়ণ বসু

এক-একজন লেখক থাকেন যাঁহারা প্রাণরসে উচ্ছল, যাঁহাদের রচনার বিষয়-বস্তুকে ছাপাইয়া তাঁহাদের ব্যক্তিসত্তা নানা আভাসে ইঙ্গিতে, কৌতুকরসের প্রাবল্যে, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যবৈশিষ্ট্যে অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইঁহারা যদি প্রবন্ধ-রচনায় ব্রতী হন, তবে সেই প্রবন্ধ নৈর্ব্যক্তিক, জ্ঞানপ্রধান আলোচনার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ব্যক্তির জীবনরসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। **রাজনারায়ণ বসু** (১৮২৬-১৮৯৯) এইরূপ ব্যক্তিত্বপ্রধান লেখক ছিলেন। কাজেই তাঁহার রচনার অনেকাংশই এই ব্যক্তি-ধর্মের প্রবল উৎক্ষেপে প্রাণবান ও অনুভব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'সেকাল ও একাল' (১৮৭৪) ও 'আত্মচরিত' যদিও প্রবন্ধ-রচনার উদ্দেশ্য ও বহিরঙ্গ-অনুবর্তনে লিখিত হয় নাই, তথাপি পরবর্তী স্তরে প্রবন্ধ যে বিশিষ্ট মেজাজ ও আত্মভাবনা-বিকিরণের বাহন হইয়াছে তাহা তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। প্রবন্ধ-সাহিত্য ক্রমশঃ মননপ্রধান, জ্ঞানগরিষ্ঠ ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল না হইয়া, যাঁহারা খেয়ালী কল্পনা, আবেগধর্মিতা ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যসঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী তাঁহাদিগকেই বেশী পরিমাণে আশ্রয় করিতে আরম্ভ করিল। প্রবন্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপাটি-বিন্যস্ত আধার না হইয়া ক্রমশঃ তথ্যের সূতায় জড়িত আবেগের আকাশে উড্ডীন বিচিত্রবর্ণ ফানুসের আকার ধারণ করিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর (১৮২৫-১৮৯৪) সমস্ত রচনাই প্রবন্ধধর্মী। তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪) ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৯৪) প্রভৃতি গ্রন্থের নামকরণই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার প্রায় সমস্ত সাহিত্যকৃতিই প্রবন্ধপর্যায়ভুক্ত। তাঁহার প্রবন্ধের পরিকল্পনায় ও রচনা-পদ্ধতিতে তিনি অক্ষয়-

কুমারের মননশীল আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পিছনে ছিল এক দৃঢ় আদর্শবাদ ও স্বধর্মনিষ্ঠা। ভূদেবের যে প্রখর ও অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও ইয়ং-বেঙ্গল-গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যও তাঁহার রক্ষণশীল মন ও প্রাচীন আচারের নিষ্ঠাবান অনুসরণকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আঘাতশীল উগ্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ না করিয়া প্রাচীন সমাজপ্রথা ও জীবনাদর্শের অকুণ্ঠ সমর্থনেই নিজ অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে। তাঁহার ইংরেজী শিক্ষা তাঁহাকে যে যুক্তিবাদ-মন্ত্রে ও সংস্কার-মুক্ত জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহাই তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন প্রাচীনত্বের যুক্তিসম্মত প্রতিষ্ঠায়। রামমোহন ও অক্ষয়কুমার যেমন যুক্তিবাদের দ্বারা উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্মের গ্রহণীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, ভূদেব সেই যুক্তি-প্রয়োগেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও আচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যে সাধারণতঃ মননপ্রধান তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তথাপি ইহারই পিছনে এক অবরুদ্ধ-সংযত আবেগ, এক আদর্শ স্বপ্নচারী ভাবকল্পনা ঈষৎ আভাসিত হইয়া প্রবন্ধগুলির উপর একটি অনতিস্পষ্ট কাব্যব্যঞ্জনা আরোপ করিয়াছে। ইহারা বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগের যে মিলিত প্রকাশ এই ধারণাই পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয়। নূতন বিষয়ে কৌতূহল উদ্রিক্ত করা অপেক্ষা অস্থিমজ্জাগত প্রাচীন সংস্কারের সম্বন্ধে সংশয় নিরসন করিয়া উহাকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে মননের আরও দুরূহ পরীক্ষা নিহিত। ভূদেবের যুক্তিবাদ এই দুরূহতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রবন্ধ-সাহিত্য যে আর সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভরতার স্তরে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, ভূদেবের আপাতদৃষ্টিতে আবেগহীন, ব্যক্তিত্ব-স্পর্শবর্জিত রচনাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

৩

প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র

প্রবন্ধ-সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট, ইহার অনন্যমেয় রূপ-বৈচিত্র্যের চারুশিল্পী, ইহার সমস্ত সীমাতিসারী ভাবসত্তার স্রষ্টা **বঙ্কিমচন্দ্র**। যে প্রবন্ধ এতদিন নাতিসূক্ষ্ম চিন্তা-মননের বাহন ছিল, যাহার পরিধি জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রচারের তথ্য ও তত্ত্বের গুরুভারক্লিষ্ট, মন্থরগতি সার-সংকলনে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা অকস্মাৎ প্রতিভার স্পর্শে প্রাণের বিচিত্র-ছন্দায়িত স্পন্দনে আন্দোলিত, জীবনতরঙ্গের বহুমুখী উদ্বেলতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তাহার অঙ্গে অঙ্গে কি লাবণ্যপ্রবাহ, বিদ্যুৎশিখার ন্যায় কি তীক্ষ্ণ দীপ্তি ও দ্রুত গতি, প্রাণবন্যার কি দুর্বার উল্লাস সঞ্চারিত হইল! ইহার বস্তুভার আশ্চর্যরূপে লঘু হইয়া ভাবের ঊর্ধ্বাকাশে লীলাসঞ্চরণের শক্তি লাভ করিল; ইহার ভূমিচারী পদাতিক-বৃত্তি অকস্মাৎ ডানা মেলিয়া কবিকল্পনার সহযাত্রী হইল। ইহার ভোঁতা ও ভারী মুদ্গর দিব্যবিভাদীপ্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্রে পরিণত হইল। ইহার স্থূল প্রয়োজনাত্মক উচ্চারণ-শ্লথতার মধ্যে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-তির্যগ্‌ভাষণের তীক্ষ্ণতা, পরিহাস-রসিকতার চমক, আবেগময় ভাবমুগ্ধতা, গীতিকবিতার সুরের উচ্ছ্বাস, জীবন-পর্যালোচনার অন্তরঙ্গ অন্তর্মুখিতা, ক্ষোভ-অনুযোগ-আশা-নৈরাশ্যের সম্মিলিত ঐকতান—মানবকণ্ঠের সমগ্র স্বরগ্রাম, অনুভূতির সর্বসঞ্চারী ভাবসমষ্টি আপনাদের যথাযথ বাক্‌ছন্দটি খুঁজিয়া পাইয়াছে। গুটিপোকার বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতিতে রূপান্তরের ন্যায় বঙ্কিমের হাতে প্রবন্ধের এক নবজন্ম-পরিগ্রহ ঘটিল। জ্ঞানপ্রধান প্রবন্ধ ভাবপ্রধান রসরচনার রূপ গ্রহণ করিল।

সাময়িক পত্রিকার সহিত প্রবন্ধ-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদাহৃত হইয়াছে। তিনি যদি ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি উপন্যাসক্ষেত্রে তাঁহার নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার আসন ছাড়িয়া তাঁহার বিপুল ও বহুমুখী প্রবন্ধসাহিত্য-রচনার প্রেরণা পাইতেন কিনা সন্দেহ। সাময়িক পত্রিকার কলেবর-পূরণের তাগিদ, বিভিন্নরুচি পাঠকের তৃপ্তিসাধনের আয়োজনই তাঁহাকে এই নূতন শক্তিপরীক্ষার আসরে অবতীর্ণ করাইয়াছিল। তাঁহার জ্ঞানের বিচিত্র ভাণ্ডার হইতে তিনি উপাদান আহরণ করিয়া বাঙালী পাঠকের শুধু জ্ঞানের ক্ষুধা নহে, রসপিপাসা-নিবৃত্তিরও এক অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করিলেন। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, জীবন-দর্শন, পরাশ্রয়ী শিক্ষা-সংস্কৃতির গ্লানি, কৌতুক-হাস্যের স্নিগ্ধচ্ছটা ও ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত—এই সমস্ত বিষয় ও মানসরীতিকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে অজস্র রসের ধারা, ভাবপ্রকাশের যে অনবদ্য শিল্পরূপ, স্বাদবৈচিত্র্যের জন্য যে রসনারুচিকর রন্ধননৈপুণ্যের প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর রুচিবোধ ও সমাজচেতনা এক অভিনব অনুভূতি-পর্যায়ে উন্নীত হইল। 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিজ্ঞান-রহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬) ও 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯)—পরে এই দুইখানি গ্রন্থ 'বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ' নামে একত্র পুনর্মুদ্রিত হয় (১৮৮৭)—'সাম্য' (১৮৭৯), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪),

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্য

'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২)—এই-সমস্ত গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিষয়োপযোগী সরস রচনাভঙ্গীর যুগপৎ পরিচয় দেয়।

ইহাদের মধ্যে যেগুলি বস্তুপ্রধান রচনা, যাহারা বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কিত, সেগুলিতে বঙ্কিম তাঁহার মুখ্যকর্তব্য তথ্য-পরিবেশনের দিকে বিশেষ-ভাবে অবহিত থাকিয়াও মন্তব্য ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁহার ব্যক্তিমানসের পরিচয় দিয়াছেন। এই তথ্যপুঞ্জ ও তত্ত্বব্যূহের মধ্যে যে একটি সরস-চতুর মন, একটি সৌন্দর্যসচেতন রসস্রষ্টা সাবলীল গতিতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি যে মুহুর্মুহু পাঠককে শুধু জ্ঞানাহরণের নিষ্ক্রিয় গ্রহণশীলতা হইতে মুক্তি দিয়া তাহার রসানুভব-শক্তি ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের সংবেগকে সক্রিয়ভাবে উদ্রিক্ত করিতেছেন তাহা প্রতিটি বাক্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি বিষয়ের উপরই এক উদার, উন্মুক্ত, অনুভূতিশীল মনের অবাধ গতিচ্ছন্দের ছাপটি সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি রসবিশ্লেষণের এক নূতন পদ্ধতি, অলঙ্কার-শাস্ত্রের এক অভিনব প্রয়োগ, সাহিত্য-আস্বাদনের মধ্যে এক অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি, কাব্য-পরিবেশের এক তাৎপর্যময় পুনর্গঠন, বিচারমূলসূত্রের সার্থক উপস্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ গুণের সমবায়ে সমালোচনার এক অজ্ঞাত দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়াছে। বঙ্কিমের পূর্বে সমালোচনার প্রাথমিক অসম্পূর্ণ প্রয়াস, সাহিত্যপাঠে মানস প্রতিক্রিয়ার প্রথম অসংগঠিত আলোড়ন দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে সার্থক সমালোচনার ভিত্তি তিনিই প্রথম রচনা করিলেন ও উহার কয়েকটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তও আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহার ধর্মতত্ত্ব-আলোচনার মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য আদর্শের, বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠা ও ভক্তিরসাপ্লুত প্রগাঢ় অনুভূতির সার্থক সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত না হইলেও তাঁহার আলোচনা-পদ্ধতির তাৎপর্য বহুলাংশে স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি হয়ত খুব নূতন কথা বলেন নাই, কিন্তু বাঙালীর দৃষ্টিকোণ হইতে এই বিষয়গুলির যে পুনর্বিবেচনা উচিত এই সত্যের দিকে তিনিই প্রথম অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন।

বঙ্কিমের বস্তুপ্রধান ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ

'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে জীবন-রসিকতার গভীরতর অনুরণন শ্রুত হয়। এইগুলিতে শুধু রচয়িতার ব্যক্তিমানস নহে, তাঁহার আবেগ-অনুভূতি-কল্পনাস্বপ্ন-জীবনবোধ প্রভৃতি বৃত্তির সূক্ষ্ম

তন্তুজালে রচিত, নিগূঢ় ব্যক্তিসত্তা এক অবর্ণনীয় আবেদন লইয়া পাঠকের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নাই, কোন 'প্রকৃষ্ট বন্ধনে' গ্রথিত চিন্তন-পারম্পর্য, প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রসারিত কোন অচ্ছেদ্য যুক্তি-শৃঙ্খলা নাই। প্রবন্ধের সমস্ত আঙ্গিক-বিন্যাস এখানে ছিন্ন হইয়া ইহা এক মুক্ত মানবাত্মার এক সর্ববন্ধনাতীত মানস-অনুভূতির লীলাবিহারক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। গোধূলিসন্ধ্যার একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ যেমন দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে, ইহার চারিদিকে যেমন বর্ণালী-মায়া অদৃশ্য চিত্রকরের সমাবেশ-সুষমার এবং স্বপ্নলোকের সুসম্বদ্ধ চিত্ররূপে প্রতিভাত হয়, কমলাকান্তের প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তেমনি ভাবোচ্ছ্বাসের একটি বিন্দু মনোলোকে ঘন হইয়া উঠে, নানা বর্ণের সংমিশ্রণে নানা সুরের সমবায়ে একটি অপরূপ সত্তা গ্রহণ করে ও অন্তঃসঙ্গতি ও প্রাণলীলার স্পন্দনে একটি চিরন্তন অধ্যাত্ম-সত্যরূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনের একটি আকৃতি, বেদনার একটি স্পন্দন, কল্পনার একটু উচ্ছ্বাস, জীবনানুভূতির একটি তরঙ্গলীলা বঙ্কিমের ভাবলোকে একটি সুষ্ঠু, সুগঠিত অবয়বে সংহত হয়, একটি অলক্ষ্য যোগসূত্রের টানে নানা সমধর্মী চিন্তা-ভাবনাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করে ও পরিশেষে একটি নানা-তন্ত্রীসমন্বিত সুরসঙ্গতিতে (harmony) পরিণত হইয়া অন্তর-গভীরে একটি অপরূপ সঙ্গীতের অনুরণন তুলিতে থাকে। বঙ্কিমের রচনায় প্রসঙ্গ-পরিবর্তন সাধিত হয় কোন বহিরঙ্গমূলক যুক্তিপারম্পর্যের দ্বারা নহে, এক নিগূঢ় মর্মানুভূতির অনুসরণে, উহার অন্তর্নিহিত প্রাণলীলার স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-সম্প্রসারণে।

কমলাকান্তের দপ্তরে জীবনরস

কমলাকান্তের দুই-একটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলেই উপরি-উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা অনুধাবন করা যাইবে। বঙ্কিমের সমস্ত মনন আসিয়াছে কমলাকান্তের আধ-পাগল, জীবন-রহস্যের মধ্যে গভীর-নিমজ্জিত বিশেষ মনোভঙ্গীর তির্যক পথ বাহিয়া, যুক্তিধর্মী আলোচনার সকলের-চলা রাজপথ দিয়া নহে। 'বিড়াল' প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থন জানানো হইয়াছে, কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌছানো হইয়াছে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিসমাবেশের দ্বারা নহে; ইহা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এক খেয়ালী কল্পনার এলোমেলো বাতাসে উড়িয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা যখন আসিয়াছে তখন পাঠকের নিঃসংশয় প্রতীতি হইয়াছে যে, কোন সমাজ-তত্ত্ববিদ বা অর্থনীতিবিশারদ ইহাকে আমাদের অন্তরের এত গভীরে প্রোথিত

বিষয়বিন্যাস ও সিদ্ধান্ত—পরিণতির দুইটি বৈশিষ্ট্য

করিতে পারিতেন না। কোথায় খট্টাশায়িত, অহিফেনে ঢুলুঢুলু-নেত্র, ওয়েলিংটনের মার্জারত্বপ্রাপ্তির কল্পনায় বিভোর কমলাকান্তও একদিকে দুগ্ধের মালিক প্রসন্ন ও অন্যদিকে দুগ্ধপায়ী মার্জারের সহিত তাহার নিত্যকার জীবনযাত্রামূলক সম্বন্ধ আর কোথায় বা সমাজতত্ত্বের গভীর আলোচনা ও বঞ্চিত দরিদ্রের চৌর্যবৃত্তির অনুমোদন! প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যে এই অভাবনীয় অসামঞ্জস্য বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বসমন্বয়কারী শক্তির সাহায্যেই সমাধান লাভ করিয়াছে—নেশাখোর কমলাকান্তকে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপকপদে আসীন হইতে দেখিয়া আমরা বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি বোধ করি না। কমলাকান্ত নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় ও প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোয়ালঘরে যে সমাজতত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে তাহাই, অর্থাৎ যে সর্বহারা তাহার মোসাহেবি করিয়াই হউক, দুগ্ধদান গ্রহণ করিয়াই হউক যে বাঁচিবার অধিকার আছে, এই জীবনসত্যই অকুণ্ঠিতভাবে সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে। 'একটি গীত'-এর আরম্ভ বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ধৃতি দিয়া; আর পরিসমাপ্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ভাবস্তরে, রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার মর্মজ্বালা-প্রকাশে ও ব্যাকুল মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায়। প্রেমের ভাব-তন্ময়তা স্বাধীনতার-আকূতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, বঁধু ও বৃন্দাবন নূতন দ্যোতনাবিশিষ্ট রূপক-পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই প্রেমের প্রসঙ্গান্তর-প্রাপ্তি এত সহজ ও অলক্ষিত ভাব-সংযোজনার মাধ্যমে সাধিত হইয়াছে যে-পাঠকের অনুভূতিতে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবের ভাবসাধনার বৃন্দাবনলীলা আর আধুনিক রাষ্ট্রচেতনার সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ চরিতার্থতার সন্ধান যেন একই সুরে বাঁধা হইয়া, একই প্রকার আবেগ-মূর্ছনার সৃষ্টি করিয়া একাত্মতালাভ করিয়াছে। 'কে গায়' প্রবন্ধে একটি গানের সুর অবলম্বন করিয়া প্রৌঢ় জীবনের সমস্ত পূর্বস্মৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং এই স্মৃতিমন্থনের অতল হইতে এক সার্বভৌম জীবনসত্য উত্থিত হইয়া মোহভঙ্গ-বিড়ম্বিত, নৈরাশ্য-তিক্ত জীবনে এক নূতন লক্ষ্য ও তাৎপর্য আরোপ করিয়াছে। এইরূপে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সমস্ত প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্কিম প্রবন্ধ -সাহিত্যের মধ্যে এক নূতন রূপ ও ভাবসত্তার সংযোজন করিয়াছেন। ইহাদের সমস্ত বিষয়-বিন্যাস ও সিদ্ধান্ত-পরিণতি দুইটি বৈশিষ্ট্যের মুদ্রাঙ্কিত—(১) কমলাকান্তের বিশিষ্ট জীবনবোধের রন্ধ্রপথ দিয়াই ইহারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; (২) ইহাদের আঙ্গিক-গঠনে গীতি-প্রেরণার মত স্বচ্ছন্দচারী এক নিগূঢ় ভাবসঙ্গতি আত্মবিকাশ করিয়াছে। এখন হইতে বস্তুসঞ্চয়ে নিরেট,

তথ্যের চাপে স্ফীত গদ্য-প্রবন্ধ এক আত্মিকজ্যোতিঃসমুজ্জ্বল, লঘু-সুষম ভাব-রূপে নবজীবনের পথে অগ্রসর হইল।

৪

বঙ্কিমচন্দ্র-সূর্যকে ঘিরিয়া 'বঙ্গদর্শন'-এর স্তম্ভে এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলী গদ্য-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। তিনি ইহাকে পাশ্চাত্ত্য রীতি-অনুযায়ী জ্ঞান-পরিবেশনের কতকটা দেশের নাড়ীর সঙ্গে নিঃসম্পর্ক কর্তব্যভার হইতে মুক্তি দিয়া বাঙালীর রুচি, রসবোধ ও জীবন-প্রজ্ঞার সহিত সুস্থ সম্বন্ধে স্থাপিত করিলেন। সুতরাং বাঙালীর প্রাণের সহিত সহজ সংযোগের জন্যই ইহার প্রসার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বঙ্কিমের প্রাবন্ধিক ভাব-শিষ্যের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) ও পরবর্তী যুগের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদর্শনের প্রাবন্ধিক-গোষ্ঠী

ইঁহাদের মধ্যে **অক্ষয়চন্দ্র সরকারই** বঙ্কিমের রচনারীতি ও তাঁহার সরস কৌতুকের সহিত মিশ্রিত তত্ত্বগভীরতার সুরটি বিশেষ দক্ষতার সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্ভুক্ত 'চান্দ্রলোকে' প্রবন্ধটি কেবল বঙ্কিম-রীতির সার্থক অনুসরণই নহে, কমলাকান্ত-চরিত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ও তাহার বিশেষ জীবনদর্শনদ্যোতক রস-রচনা। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনারীতিও অনেকাংশে বঙ্কিম-প্রভাবিত। তাঁহার হেমচন্দ্রের কাব্য-সমালোচনার মধ্যে মূলতত্ত্ব-উপস্থাপন-কৌশল ও অন্তর্দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধ-সংগ্রহগ্রন্থ, যথা—'সমাজ-সমালোচনা' (১৮৭৪), 'আলোচনা' (১৮৮২), 'সনাতনী' (১৯১১) ও 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩) তাঁহার রচনার মধ্যে জ্ঞান-গম্ভীর ও কল্পনা-সরস উভয় রীতির সংমিশ্রণের নিদর্শন। তাঁহার 'গগন-পটুয়া' প্রবন্ধে তাঁহার যে লীলায়িত কল্পনা-বিস্তার ও সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বঙ্কিম-রচনার বাহিরে দুর্লভ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্ভুক্ত 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে যে ভাবৈশ্বর্য ও কল্পনা-নিবিড়তার প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছিল, তাঁহার স্বাধীন রচনায় তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই। তাঁহার 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫)

গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুর আলোচনা করিলেই প্রতীতি জন্মিবে যে তিনি প্রাগ্-বঙ্কিম যুগের জ্ঞানগর্ভ বিষয়েই নিজ রচনাশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন, উহার মধ্যে রসের হিল্লোল প্রবাহিত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে তত্ত্বমূলক প্রবন্ধও যে সরসতার সংমিশ্রণে কতখানি সুখপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারে, তাহা পূর্ববর্তী যুগের অক্ষয়কুমার দত্তের অনুরূপ রচনার সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। রাজকৃষ্ণের মধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা যতটা প্রবল ছিল, ভাবুকতা সে পরিমাণে ছিল না। সুতরাং তিনি বিশুদ্ধ রস-রচনার দিকে অখণ্ড মনোযোগ না দিয়া ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তথ্যানুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহশীল হইলেন। তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু এই ইতিহাস-রচনায় আত্মনিয়োগই তাঁহার দ্বিধা-বিভক্ত মনের পরিচয় বহন করে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও অনেকটা প্রাচীন আদর্শ ও প্রথার গোঁড়া সংরক্ষকরূপেই দেখা দিয়াছেন। মনের যে চলমানতা ও স্থিতি-স্থাপকতা থাকিলে, নানা বিচিত্ররস-আস্বাদনের প্রতি যে সহজ রুচিগত উদারতার অধিকারী হইলে সার্থক প্রবন্ধকার হওয়া যায়, চন্দ্রনাথ বসুর সংস্কারবদ্ধ মনে তাহার বিশেষ চিহ্ন মিলে না। তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১), 'ত্রিধারা' (১৮৯১) ও 'সবিত্রীতত্ত্ব' (১৯০০) সেকালে খানিকটা সমাদর লাভ করিয়াছিল। তবে তাঁহার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, তত্ত্বপ্রতিপাদনে অত্যুৎসাহ ও মনোভঙ্গীর একলক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট নিশ্চলতা ঠিক প্রবন্ধ-রচনার উৎকর্ষলাভের পক্ষে অনুকূল নহে। অবশ্য এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহার বিশ্লেষণ-কুশলতা ও যুক্তি-প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে, কিন্তু ইহাতে প্রবন্ধক্ষেত্রে স্মরণীয়তার যে বিশেষ আনুকূল্য হইবে এমন বোধ হয় না।

চন্দ্রনাথ বসু

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৩৪-১৮৮৯) 'পালামৌ' (১৮৮০) ঠিক প্রবন্ধ নহে, মুখ্যতঃ ভ্রমণকাহিনী, তবে ইহার মধ্যে উপন্যাস ও প্রবন্ধেরও কিছু কিছু উপাদান দেখা যায়। ইহাতে জীবন-রস-আস্বাদন ও মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে কৌতূহল, তাহা প্রবন্ধের রূপ না লইলেও ইহার অন্তরাত্মার সৌরভে সুরভিত।

সঞ্জীবচন্দ্র

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্ব এবং বাংলা ও সংস্কৃতের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে সংস্কৃত-পণ্ডিতের গুরু-গম্ভীর

ভাষার প্রতি পক্ষপাত, দুরূহ বিষয়ের দুরূহতর উপস্থাপনা-প্রবণতা একেবারেই ছিল না। তাঁহার সমস্ত রচনাই সহজ, সরল ভাষায় ও কৌতুক-মণ্ডিত স্মিত-হাস্যের সহায়তায় লেখা। 'বঙ্গীয় যুবক ও তিনি কবি' প্রবন্ধে তিনি কালিদাস, শেক্সপিয়র ও বাইরনের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও সেদিনের বাঙালী তরুণ-সম্প্রদায়ের উপর উঁহাদের আপেক্ষিক প্রভাব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মনোজ্ঞ সরসতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯) উপন্যাসে তিনি বৌদ্ধ ও আদি-হিন্দুযুগের জীবনযাত্রার সরস ও উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছেন। যেমন সঞ্জীবচন্দ্রের, তেমনি তাঁহারও উপন্যাসে মন্তব্য ও জীবন-চিত্রণের মধ্যে প্রাবন্ধিক-সুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, যেন বঙ্কিম-যুগের একটা দক্ষিণী হাওয়া, একটা প্রাণোচ্ছলতার তরঙ্গ শতাব্দীর এক পাদ অতিক্রম করিয়া, বিংশ শতকের গম্ভীরতার পরিবেশে লালিত ও যুগোচিত পাণ্ডিত্যপ্রধান গবেষণাকার্যে নিয়োজিত হরপ্রসাদকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার মধ্যে অতীত-স্মৃতির সার্থক উদ্বোধন ঘটাইয়াছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্কিমগোষ্ঠী-বহির্ভূত প্রবন্ধকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা **দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৪০-১৯২৬) বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে (১৮৭৫) যে কল্পনার উচ্ছলতা ও সরস চিত্তস্ফূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে কিয়ৎ-পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে 'তত্ত্ববিদ্যা' (১৮৬৬-১৮৬৯), 'নানা চিন্তা' (১৯২০), 'প্রবন্ধমালা' (১৯২০), 'চিন্তামণি' (১৯২২) প্রভৃতিতে একটা খেয়াল-খুশির আমেজ, ধারাবাহিক গম্ভীর আলোচনার মধ্যে দমকা হাওয়ার উচ্ছ্বাসের ন্যায় কৌতুককর অপ্রাসঙ্গিকতার প্রবর্তন, দার্শনিকতার মধ্যে লঘু চাপল্যপূর্ণ রীতির অনুপ্রবেশ বিশেষ উপভোগ্যতার হেতু হইয়াছে। যে মেজাজ-গত উপাদানে সার্থক প্রবন্ধকার নির্মিত হয়, তাহা তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩) ও **বীরেশ্বর পাঁড়ে** প্রধানতঃ সাহিত্য-সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 'সমালোচনা-সাহিত্য' (পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯১ বাং সন হইতে উদ্ধৃত) প্রবন্ধে আধুনিক সমালোচনার আদর্শ ও মূলনীতির যে সূক্ষ্ম রসাত্মক ও মতবাদের ঊদারতা-ব্যঞ্জক বিচার দেখা যায়, তাহা তাঁহার সাহিত্যরস-আস্বাদনের অসাধারণ শক্তির পরিচয়-বাহী। তিনি এই প্রবন্ধে নিজ মৌলিক বিচারবুদ্ধির নিদর্শন দিয়াছেন। একদিকে

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

যেমন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রাচ্য রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া উহাদের আস্বাদনে পাশ্চাত্ত্য মানদণ্ডের নির্বিচারে অনুসরণ করেন নাই। প্রবন্ধের ভাব-বিস্তারে ও আঙ্গিক-নির্ধারণেও তিনি সু-মিত শিল্পবোধের অধিকারী। তাঁহার 'বিহারীলাল' সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ (নব্যভারত, ১৩০১ বাং সন হইতে উৎকলিত) এক সম্পূর্ণ অপরিচিত শ্রেণীর কবির কাব্যসৌন্দর্যের স্বরূপ-নির্ধারণে আশ্চর্য দক্ষতা দেখাইয়াছে। বাঙালী পাঠকের অনভ্যস্ত রুচি ও অনশীলিত রসবোধের নিকট নূতন সমালোচনা-রীতির মর্মোদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া, মৌলিক প্রতিভার সহিত প্রথম পরিচয়-স্থাপনের দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়া, লেখক তত্ত্বকথার প্রতি একটু বেশী জোর দিয়াছেন। যাহা আধুনিক কালে প্রায় প্রত্যেক বিদগ্ধ পাঠকের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তাহা সবিস্তারে প্রমাণ করিতে গিয়াছেন এবং এইজন্য হয়ত প্রবন্ধগুলি কিছুটা অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ ও তত্ত্বকণ্টকিত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে উহারা যে অনায়াসলব্ধ গঠন-সুষমা ও ভাবসঙ্গতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের লক্ষণ, সেই আদর্শ হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছে। তথাপি উহাদের মধ্যে যে প্রবল মানস উৎসাহ, সৌন্দর্য-অনুভূতির যে তীব্র উৎকণ্ঠা একটা রস-পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বীরেশ্বর পাঁড়ে

বীরেশ্বর পাঁড়ে চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় একটু উৎকটরূপে প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল। সাহিত্য-সমালোচনাতেও তিনি হিন্দুর সামাজিক আদর্শের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ বাং সন হইতে সঙ্কলিত) তিনি বঙ্কিমের উপন্যাসাবলীতে কতদূর হিন্দু-আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে এই বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিকোণ হইতে উহাদের বিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সূর্যমুখী ও ভ্রমর-চরিত্রের তুলনা করিয়া ভ্রমর যে অতিরিক্ত আত্মাভিমানের জন্য হিন্দুরমণীর পাতিব্রত্যের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজের প্রতিকারহীন দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' প্রবন্ধে নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর উপর তীব্র আক্রমণও তাঁহার মতবাদে নমনীয়তার অভাবের নিদর্শন-রূপে তাঁহার সহানুভূতির সঙ্কীর্ণতা সূচিত করে। অবশ্য প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিচারে সমালোচনায় অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দাবি প্রাসঙ্গিক নহে। তথাপি ইহাতে

প্রবন্ধকারের সংস্কারাচ্ছন্ন, একদেশদর্শী মনের পরিচয়ের ফলে তিনি যে প্রবন্ধকার-রূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায়।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ও **স্বামী বিবেকানন্দ** (১৮৬৩-১৯০২) যে গভীর অনুভূতি ও ওজস্বিনী ভাষার সাহায্যে তাঁহাদের ধর্মব্যাখ্যা ও প্রচারমূলক বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ধর্মতত্ত্ববিষয়ক সন্দর্ভাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহারা এই গুণের জন্যই সাহিত্যিক প্রবন্ধের পর্যায়ে স্থান পাইয়াছে।

কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ

কেশবচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতা ও ভগবৎ-স্বরূপ-উপলব্ধির একান্ত আবেগাপ্লুত কামনা ও স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত আহ্বান, সমাজসেবার জলন্ত আগ্রহ, দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি প্রাণ-গলানো ভালবাসা ও নিঃসংশয় দৃঢ় অধ্যাত্মবোধ তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবে উদাসীন, কিন্তু প্রাণোচ্ছল রচনাগুলিকে মর্মস্পর্শী আবেদনে মণ্ডিত করিয়াছে। প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অকৃত্রিম ভাবানুভূতি ও উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব হইতে সাহিত্য আত্মবিকাশের অনিবার্য প্রেরণা লাভ করে। যেমন সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হইতে ছোট ঝরনা নিঃসৃত হইলেও তাহা ক্রমশঃ বিরাট নদীর আকার ধারণ করে, তেমনি সুমহান্ ব্যক্তিসত্তার ধর্ম ও সংস্কৃতিবিষয়ক চিন্তা ও অনুভূতি স্বতঃই সাহিত্যরূপে বিকশিত হয়। কেশব-চন্দ্রের ধর্মচিন্তায় সমকালীন যুগাবেদন ততটা নাই বলিয়া তিনি সাহিত্যিক অপেক্ষা ধর্মপ্রচারকরূপে অধিকতর বিখ্যাত। স্বামী বিবেকানন্দের যেমন ধর্মবোধ আছে, তেমনি যুগসমস্যার আবেগময় অনুভূতি আছে বলিয়াই তাঁহার সন্ন্যাসী-সত্তা তাঁহার সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করে নাই।

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইল যে, প্রবন্ধ-সাহিত্য সর্ববিধ বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনন ও ভাবের আধার হইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র, কিন্তু স্বচ্ছ সরোবরে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম, ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও ভাবকল্পনা আপন আপন জলধারার উপহার লইয়া আসে। সরোবর নিজ স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই ধারাসমূহের যতটুকু গ্রহণ করিতে পারে, ততটুকুর উপরেই উহার ন্যায্য অধিকার। এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে প্রবন্ধ-সাহিত্যের অসীম বিস্তার ও অপার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

৫

সর্বশেষে প্রবন্ধসাহিত্যে দুইজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর বিচিত্র দানের কিছু পরিচয় দিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। তাঁহারা হইলেন **রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী** (১৮৬৪

—১৯১৯ ও **প্রমথ চৌধুরী** (১৮৬৮—১৯৪৬)। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানবের মনে যে নূতন জীবন-জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, তাহার অবলম্বনেই তাঁহার প্রবন্ধাবলী রচনা করেন। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিত্র-কথা', 'নানা কথা' প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ধ-সংকলন-গ্রন্থে তাঁহার বিজ্ঞানতত্ত্ব-নির্ভর দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানবের চিন্তাজগতে যে বিরাট আলোড়ন তুলিতেছে, তাহার অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াইয়া ও পূর্বসংস্কারকে উন্মূলিত করিয়া তাহার মনে যে নূতন বিস্ময়বোধ জাগাইতেছে, জীবনের তাৎপর্য, চরম লক্ষ্য ও পরিচালনা-বিধি সম্বন্ধে যে নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছে, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় সেই নব দার্শনিকতার রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনে ধর্মনির্ভর দার্শনিকতার পরিবর্তে বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা হইলে ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও সামগ্রিক রূপের কিরূপ পরিবর্তন হয়, কোন্ নূতন জীবননীতি ও নিয়মনিষ্ঠা ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করে, নূতন ভাবকেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত হইবার ফলে ইহার কক্ষপথ কতটা নূতন বৃত্ত রচনা করে, এই সমস্ত নবাঙ্কুরিত, এখনও অনতিস্পষ্ট প্রশ্নজালই তাঁহার প্রবন্ধাবলীকে এক মননদীপ্ত ভাব-পরিমণ্ডলে বেষ্টন করিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক হইয়াও ধর্মবিশ্বাসী ও আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন; বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও অন্যান্য জাতির ধর্মগ্রন্থেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। সুতরাং নূতন জীবনদর্শন-প্রণয়নের মাধ্যমে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মধ্যস্থতা করাই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও মনীষার সমন্বয়-কুশলতা ছাড়াও তাঁহার সরস ভঙ্গীই তাঁহার প্রবন্ধের প্রাণস্বরূপ ও ইহার সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রধান আকর। তিনি দুরূহ তত্ত্বসমূহ উপস্থাপনা করিয়াছেন অতিশয় চিত্তাকর্ষক প্রণালীতে, নানা দৃষ্টান্ত-উদাহরণের সার্থক সমাবেশে, নানা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের চতুর ইঙ্গিতে, কল্পনা-স্ফুরণের নানা ফান্দ-ফিকিরে, রসসৃষ্টির সুপরিকল্পিত আয়োজনে। বিজ্ঞান ও দর্শনের গূঢ় ও জটিল জিজ্ঞাসা তাঁহার রচনায় বস্তুনিষ্ঠতার সুনির্দিষ্ট রূপাবয়ব লইয়া, পরিচিত জীবনের বর্ণাঢ্য রেখাচিত্রে বিধৃত হইয়া, আমাদের মনোলোকে এক পূর্ব-পরিচয়ের অনুকূল ভাবাসঙ্গ সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তাঁহার রচনার প্রসাদগুণে, তাঁহার স্মিত কৌতুকের স্নিগ্ধচ্ছটায় আমাদের মনে

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা-ভঙ্গীর সরসতা

অপরিচয়ের বিভীষিকা কাটিয়া গিয়া নূতনের প্রতি আতিথেয়তাবোধ জাগিয়া উঠে; বিজ্ঞানের কত অপরিজ্ঞাত তথ্য, কত ধারণাতীত রহস্য, কত দুর্নিরীক্ষ্য ইঙ্গিত আমাদের মনের স্থায়ী ধারণা-সংস্কারের মধ্যেই আশ্রয় লাভ করে। তিনি আমাদের চিত্তকে বিজ্ঞানাভিমুখী করিয়াছেন, আমাদের চেতনা-সংস্কারের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার সর্বাধিক কৃতিত্ব।

তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা ছাড়া সাহিত্য-চর্চা ও জীবন-রসাস্বাদন-প্রয়াসও আছে। তাঁহার 'মহাকাব্য' প্রবন্ধটিতে এই অতিকায়, অধুনালুপ্ত, কাব্যরূপের যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ স্বরূপ-বিশ্লেষণ আছে, তাহা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর পেশাদার সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষেও গৌরবের বিষয় হইত। যে সামাজিক পরিবেশে, যে সহজ, কৃত্রিমতার আবরণহীন, হিংস্র-বলিষ্ঠ ভাব-পরিমণ্ডলে ইহার উদ্ভব, তাহার যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন, তাহা যেমন তথ্যের দিক দিয়া যথার্থ, তেমনি অন্তরের ভাবসত্যের দিক দিয়াও অনবদ্য। ইহাতে তাঁহার বস্তুজ্ঞান ও অন্তর-রহস্যভেদী কল্পনা সমানভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার 'চরিত-কথা'য় তিনি বিদ্যাসাগরের যে জীবনচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে বহির্ঘটনার যথাযথ সন্নিবেশে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণশিখার দীপ্ত রূপটি, তাঁহার বিশিষ্ট জীবনাদর্শটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যিনি তাঁহার মানসিকতার উদার, বিপুল প্রসারে দর্শন-বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন করিয়াছেন, তিনি যে মানুষের জীবনের ভিতর-বাহিরের অনুরূপ সমন্বয়সাধনে সমর্থ হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কারণ নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের জীবনরস

গঠনশিল্পের দিক দিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের কতকগুলি প্রবন্ধ অতিরিক্ত রকম দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত তাঁহার বক্তব্যের সুষ্ঠ প্রকাশের জন্য এই কলেবর-স্ফীতি অপরিহার্য ছিল। প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিষয়-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার আঙ্গিক-সুমিতির আদর্শের পরিবর্তন হইতে বাধ্য। রামেন্দ্র-সুন্দর হয়ত সব সময় তাঁহার উপস্থাপনা-প্রয়োজনে এত অভিনিবিষ্ট ছিলেন যে, গঠন-সুষমার দিকে তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তথাপি তঁহার রচনায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে একটা নূতন রূপ ও ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জীবনের অনুভব ও শিল্পীর রূপসৃষ্টির উপর উহার অধিকার-সীমা যে আরও প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

স্থানবিশেষে গঠন-সুষমার অভাব

৬

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে যে তৃতীয় ব্যক্তি প্রবন্ধকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, উঁহাকে নূতন মেজাজ ও ভঙ্গীর বাহন করিয়াছেন, তিনি **প্রমথ চৌধুরী**। তিনি মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রবন্ধকার। তাঁহার সমস্ত রচনা—উপন্যাস, ছোটগল্প, অর্থনীতি ও সমাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ, এমন কি কাব্য পর্যন্ত—প্রবন্ধধর্মী। তিনি প্রবন্ধের মধ্যে মজলিশী আলাপের সুর, খেয়াল-খেলার লীলায়িত ছন্দ, ভারমুক্ত, স্বচ্ছন্দ মননের লঘু-বিসর্পিত সঞ্চরণ প্রবর্তন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে মাঝে মধ্যে হালকা চাল থাকিলেও তাঁহার আলোচনা গাম্ভীর্যপ্রধান ও গভীর সুরে অনুরণিত। হাসি-তামাসা ও রঙ্গ-রসের ছদ্মবেশের আড়ালে তাঁহার গভীর হৃদয়াবেগ, ঐকান্তিক আকূতি আরও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কবিকল্পনাও তাঁহার আন্তরিক অনুভূতির সহিত মিশিয়া তাঁহার প্রবন্ধকে গীতিধর্মী ও আবেগঘন করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ কোথাও কোথাও গীতিকবিতার গদ্যরূপ, নিবিড় ভাবাবেগ ও কল্পসৌন্দর্যের সমাবেশে, ভাষায় ও ভাবে একান্তভাবে কাব্যধর্মী, কোথাও বা অন্তর্মুখিতায় আত্মমগ্ন, কোথাও বা খরধার যুক্তিপ্রয়োগে শাণিত খড়্গের ন্যায় দীপ্ত। প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ যুক্তি, লঘু কল্পনা ও স্বচ্ছন্দচারী খেয়াল—এই সমস্ত গুণই ছিল; কিন্তু ইহাদের সমাবেশে তিনি তাঁহার একান্ত নিজস্ব একটি ভাবমণ্ডল রচনা করিয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধতা হইতে মুক্ত। 'প্রবন্ধ' নামের মধ্যেই যে প্রকৃষ্ট বন্ধনের ইঙ্গিত আছে, তিনি তাহাকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে একান্ত নারাজ। তাঁহার প্রবন্ধের শিরোনামাতে যে বিষয়-অনুসরণের প্রতিশ্রুতি আছে, তাহা তিনি পূরণ করেন অত্যন্ত পরোক্ষভাবে, নানা শাখাপথে যদৃচ্ছ বিচরণের পর, বিবিধ অবান্তর প্রসঙ্গ-উত্থাপনের মাধ্যমে। দীর্ঘ ভূমিকা, আত্মকথার অবতারণা ও অনেক শিথিল-সম্পর্কিত প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়া তবে তিনি নির্বাচিত বিষয়ের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়ান ও ইহার মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত হন। শিকারী যেমন শিকার সম্বন্ধে অতি নিশ্চিত হইয়া লক্ষ্যভেদ করিবার পূর্বে পাশের ঝোপ-জঙ্গলে নিজ শরসন্ধান-শক্তির পরীক্ষা করে, প্রমথ চৌধুরী

গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্য—যদৃচ্ছাচরণ

তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় লইয়া সেইরূপ কৌতুকচ্ছলে খেলা করেন। তাঁহার প্রবন্ধ গঠনের দিক দিয়া ঢিলে-ঢালা, বিষয়ের শাসন-না-মানা, স্বচ্ছন্দ মানস বিচরণের আঁকাবাঁকা-রেখা-চিহ্নিত, নির্দিষ্টরূপহীন মানচিত্র, খেয়ালী মনের খাপছাড়া অঙ্গাবরণ।

ইহার বহিরবয়ব অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর আরও বিচিত্র ও অভাবনীয়। সাহিত্যের অন্তঃপুরে এ পর্যন্ত যাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, সেই বৈঠকী আলাপের ঢংকে তিনি সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়াছেন। বাঙালীর স্বভাব-সিদ্ধ ভাবপ্রবণতা ও প্রচলিত ধারণা-বিশ্বাসকে তিনি শ্লেষ-ব্যঙ্গের কশাঘাতে, আপাত-অসম্ভব উক্তির বিস্ময়-চমকে বিড়ম্বিত ও বিপর্যস্ত করিয়াছেন। ফরাসী দেশের সর্বপ্রকার মোহমুক্ত, মননোজ্জ্বল, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ, রসিক মন-মেজাজ তিনি বাঙালী-সমাজে প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন। সে দেশে যেমন চা বা কফির টেবিলের সামনে বসিয়া, পানপাত্রে চুমুক দিতে দিতে, অতি সহজ সরল সংলাপের ভঙ্গীতে, সমস্ত পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর-আস্ফালন বর্জন করিয়া জীবনের গূঢ়তত্ত্ব ও জটিল সমস্যার মর্মভেদ করা হয়, প্রমথ চৌধুরী বাঙালীর ভাবালুতায় স্যাঁতসেঁতে, নানা যুক্তিহীন সংস্কারে আচ্ছন্ন, কৃত্রিম আদর্শের প্রভাবে নিশ্চল মনোলোকে সেইরূপ স্বচ্ছ, সুস্থ জীবনবোধ, সদা-সক্রিয় গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বীরবল'-নাম-গ্রহণের মধ্যেই তাঁহার ভাবাদর্শ ও জীবন-বিচার-পদ্ধতির ইঙ্গিত নিহিত। তিনি কমলাকান্তের ন্যায় ভাবুক দার্শনিক নহেন, তিনি বীরবলের ন্যায় রসিক মনের আলোকচ্ছটায়, তির্যক ভাষণের খোঁচায়, উদ্ভট-মতবাদ-প্রতিষ্ঠায় স্থাণু জীবনের অসুস্থ বিকার দূর করিয়া সেখানে যৌবন-স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলশ্রী আনিবার অভিলাষী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি জীবনকে নিছক হাসি-খুশি ও রসচর্চার ব্যাপার বলিয়া মনে করেন ও ইহার মধ্যে কোন গভীর উদ্দেশ্য ও উপলব্ধির সন্ধান তিনি পান নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতা তাঁহাকে জীবন সম্বন্ধে কিছুটা বীতশ্রদ্ধ, ইহার উচ্চতর মূল্য, ইহার আবেগোচ্ছলতা ও মহান্ ভাব কল্পনা সম্বন্ধে অনেকটা আস্থাহীন করিয়াছে এবং ইহার মাত্রাহীন অসঙ্গতি ও ব্যর্থ বৈরাগ্যের অভিনয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ও কৌতুক-রসসিক্ত করিয়াছে। কিন্তু এই নেতিমূলক ও কৌতুকপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে তাঁহার যে একটি সু-মিত ও বলিষ্ঠ জীবনদর্শন আছে, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। তিনি জীবনকে সুস্থ যৌবনশক্তির ক্রীড়াভূমিরূপে, বাস্তববোধ, মৌলিক চিন্তা ও

প্রবন্ধের অন্তঃপ্রকৃতিতে-ও বৈঠকী মেজাজ

সর্বপ্রকার আতিশয্যমুক্ত ভোগ ও সৌন্দর্য-চেতনার অনুশীলন-ক্ষেত্ররূপে দেখিতে চাহিয়াছেন। অতীত যুগের বাঙালী-মনের যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ, উহার বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ভক্তিবিহ্বলতা ও সৌন্দর্যস্রোতে আত্মনিমজ্জন তিনি অনুমোদন করেন নাই ও উহার পুনরাবৃত্তি তিনি অবাঞ্ছিত মনে করেন। কিন্তু যে বৈষয়িক উন্নতি ও সমাজ-বিধানের শোভন বিন্যাসের ফলে বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি, জীবনরস-আস্বাদন ও কলাসৌন্দর্যের সুস্থ, পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল, প্রাচীন যুগের সেই সুচতুর, ঐহিক-চেতনা-তৎপর, রূপচর্চায় দক্ষ নাগরিক জীবনের পুনরভ্যুদয় তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ কাম্যরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধের ভিতর দিয়া, তাঁহার সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কথা লইয়া মারপ্যাচ-খেলা ও চমকপ্রদ অভিমত-প্রকাশের মাধ্যমে তিনি একটি বাস্তব জীবনসত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে ও বাঙালীর মনে এক নূতন চেতনা ও জীবনোৎসুক্য সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই দিক দিয়া তাঁহার রচনা শুধু সাহিত্যগুণসম্পন্ন নহে, এক অভিনব ভাব-প্রকাশ-রীতির প্রবর্তক নহে, পরন্তু এক চির-বিস্মৃত এবং ফরাসীদেশের দৃষ্টান্ত হইতে নূতন করিয়া শেখা জীবনদর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-রূপে আমাদের ভাব-জীবনের চিরন্তন সম্পদ।

তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্য হইতে তাঁহার মনন-কৌতূহলের বিরাট ব্যাপ্তি ও বিস্তারের ধারণা করা যায়। আর কোন প্রবন্ধকার জীবনের এত বিচিত্র দিক, এত বিবিধ প্রকারের প্রশ্ন লইয়া এমন সরস ও স্মরণীয়ভাবে নিজ মননের স্বচ্ছন্দ লীলা প্রকাশ করেন নাই। দেশী, পাশ্চাত্ত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য, যুগের সাহিত্যিক ও ধর্মসম্পর্কিত বিতর্ক, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সঙ্গীততত্ত্ব, যৌবনধর্ম-প্রশস্তি, ঋতুরহস্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা—এমন কোন বিষয় চিন্তা করা যায় না, যাহার সম্বন্ধে তাঁহার দীপ্ত মনীষা, মৌলিক চিন্তাধারা ও অননুকরণীয় প্রকাশ-চাতুর্য অপূর্ব শ্রী-সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই। প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার একটি নিজস্ব মতামত আছে, যাহা আমাদের প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করিয়া আমাদের নিকট সত্যের একটি নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত করে। তাঁহার লঘু-তরল ব্যঙ্গের ও আপাত-লক্ষ্যহীন, খেয়ালী-যদৃচ্ছ বিচরণের আড়ালে তিনি জীবনের গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন ও উপেক্ষিত, কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ জীবনসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বুদ্ধিহীন ভাবালুতা, অন্ধসংস্কার, ঐহিক-জীবন-চর্যাহীন অধ্যাত্ম-স্বপ্ন, বিদেশী আচার-ব্যবহারের অনুকরণ, রূপান্ধতা ও সঙ্গতিবোধের

প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য

অভাব, বাস্তববোধশূন্য রাজনৈতিক মাতামাতি যে সুস্থ জীবনযাত্রার ভিত্তি রচনা করিতে পারে না, তাহা তিনি আমাদের নিকট স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। আধুনিক যুগে কবি-ভাবুক-আদর্শবিলাসীর দিন ফুরাইয়াছে; তাহার পরিবর্তে মার্জিতরুচি-সম্পন্ন, আচার-ব্যবহারে শালীন, সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী, যৌবনধর্মী সাধারণ নাগরিকই জীবনের জয়পতাকা তুলিয়া ধরিবেন, ইহাই তাঁহার প্রত্যাশা। আমাদের সমাজ-চেতনায় হয়ত এই মনীষা ও রুচিবোধ এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই: প্রমথ চৌধুরী কোন ভাব-সন্ততিধারা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মতবাদের স্থায়িত্ব-বিধানে সমর্থ হন নাই; তাঁহার বিস্ময়চমকপূর্ণ ভাবস্ফুলিঙ্গগুলি কোন স্থির আলোকের সংহতি লাভ করে নাই। তথাপি তিনি বাঙালীর মনে যে জিজ্ঞাসার উদ্রেক করিয়াছেন, তাহার স্বাধীন চিন্তাশক্তির নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহার প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। প্রবন্ধ-সাহিত্যের মাধ্যমে চৌধুরী মহাশয় যে চিন্তানায়কের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা এই-জাতীয় সাহিত্যের উপর একটা অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ও ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও নববিকাশাভিমুখী করিয়াছে, ইহা সর্বথা স্বীকার্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

(১৮৬১—১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যের সমস্ত শ্রেণী-বিভাগকে অতিক্রম করিয়া সকলপ্রকার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই আপন উজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক, নাট্যকার, গীতিকার, প্রবন্ধকার ও সাহিত্য-সমালোচক। প্রত্যেক বিভাগেই তাঁহার রচনা অসাধারণ শিল্প-গুণ-সমৃদ্ধ ও অপরূপ সৌন্দর্যময়। কোন একজন লেখকের মধ্যে মনীষার এইরূপ প্রসার ও বৈচিত্র্য ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সৃষ্টিশক্তির এই সর্বব্যাপী বিস্তার ও অতুলনীয় উৎকর্ষের জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সহিত সমান মর্যাদার আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের ফলেই বাংলা সাহিত্য নানাদিকে পূর্ণ বিকশিত হইয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে বাংলা ভাষার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিলেও, কবি ছিলেন না ও কাব্যের রূপান্তর-সাধনে তাঁহার কোন অংশ নাই। কোন সাহিত্যের মর্যাদা ও প্রকাশ-শক্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে উহার কাব্যোৎকর্ষের মানের উপর। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির, উহার ভাব-মহিমা, ছন্দোগৌরব ও কল্পনা-লীলার অপরূপ বিকাশের দ্বারা এই ভাষাকে সর্বাঙ্গীণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে ও নব নব চিন্তা-মনন-অনুভূতির সহিত প্রাণময় সংযোগে ইহাকে আধুনিক মনের সর্ববিধ প্রকাশ-ব্যাকুলতা মিটাইবার উপযোগী বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখী দান

ক—কাব্য

(১)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন নানা ভাব-পরিণতির স্তর বাহিয়া ও ভাব-পরিবর্তনের অনুরূপ ছন্দরীতি, কল্পনার আবেশ ও প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করিয়া উহার শ্রেষ্ঠ পরিণতিতে পৌছিয়াছে। এই পরিণতির পর্যায়ের ভিত্তিতে উহাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্বে ভাগ করা যায়।

রবীন্দ্রকাব্যের পর্ববিভাগ

প্রথম পর্বে 'সন্ধ্যা-সংগীত' (১৮৮২), 'প্রভাত-সংগীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) এই কয়খানি কাব্যগ্রন্থকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই কবিতা-গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-কল্পনা যে ধীরে ধীরে উহার প্রাথমিক অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতার কুহেলিকাজাল কাটাইয়া নিজ স্বরূপ-আবিষ্কার দীপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। তরুণ কবির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনুভূতি একটা সংশয়ময় আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া, উচ্ছ্বাস-বিড়ম্বিত প্রকাশ-জড়িমার জাল ছাড়াইতে ছাড়াইতে, বাষ্পাকুল দিগন্তরেখার মধ্যে পথ সন্ধান করিতে করিতে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির দিকে চলিয়াছে। কবি যেন একটা বড়, গভীর-আবেগ-স্পৃষ্ট দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিতে আকুলি-বিকুলি করিতেছেন; ভাব ও ভাষা উভয়ই যেন তাঁহার স্বীকরণ-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। এই হৃদয়-অরণ্যে পথ-খোঁজার মধ্যে তাঁহার মনের জাগরণের নিদর্শনগুলি একে একে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং এই মানস জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রচনায়ও সুর ও বর্ণযোজনার বলিষ্ঠতা আসিয়াছে। একটা অনির্দেশ্য প্রেমানুভূতি, একটা আলো-আঁধারী রূপক-মায়া এই সময় কবিচিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এ গোধূলী-বিষাদ, 'প্রভাত-সংঙ্গীত'-এ নবজাগরণের আনন্দ-কাকলী, 'ছবি ও গান'-এ গভীর অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক রং ও সুরের খেলা এবং 'কড়ি ও কোমল'-এ প্রধানতঃ রূপ বিহ্বলতার মধ্য দিয়া সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষ কবি-মানসের অগ্রগতির স্তরগুলিকে সূচিত করে।

প্রথম পর্বের সংশয়ময় আত্মজিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্র-মানসের নিঃসন্দিগ্ধ স্বরূপবিকাশ। 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৩), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬) ও 'কল্পনা' (১৯০০) কাব্যগুলির মধ্য দিয়া এই পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পদক্ষেপ। এগুলিতে বোঝা যায় যে কবির মনের আকাশে কুয়াশা কাটিয়া গিয়াছে; হর্ষ-বিষাদ আর পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া, কল্পনা আর রূপ বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া, শব্দযোজনা আর মুহুর্মুহু ভাবসূত্র-স্খলিত হইয়া কাব্যসম্ভাবনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে না। কবিমনের বিশৃঙ্খল উপাদান এক নিবিড় ভাবসংহতিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। জীবন-জিজ্ঞাসা গভীরার্থক ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে; কল্পনা-বিস্তার সুনির্দিষ্ট রূপসীমার মধ্যে ঘনীভূত হইয়াছে; আবেগ ছন্দোময় ভাষার অবলম্বনে ভাবের উর্ধ্বাকাশে

দ্বিতীয় পর্বে কবি-স্বরূপের বিকাশ

স্থির আশ্রয় লাভ করিয়াছে। কবির রোমান্টিক কল্পনা ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন, বিশ্বসত্তার সহিত মিলনাকৃতি, জীবনদেবতার লীলাচেতনা, প্রেম-ভাবনার অতীন্দ্রিয়তায় উন্নয়ন—এই কাব্যস্তবকে স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'অহল্যার প্রতি', 'মেঘদূত', 'সুরদাসের প্রার্থনা,' 'সিন্ধুতরঙ্গ' (মানসী), 'সমুদ্রের প্রতি,' 'পুরস্কার', 'ঝুলন', 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী', 'হৃদয়-যমুনা', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'যেতে নাহি দিব' (সোনার তরী); 'অন্তর্যামী', 'জীবন-দেবতা', 'উর্বশী', 'প্রেমের অভিষেক' (চিত্রা); 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পর', 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ' (কল্পনা)—এই কবিতাগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার জয়যাত্রার পথে এক-একটি স্বর্ণতোরণ।

(২)

তৃতীয় পর্বে কবি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম ভাব-জগতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনদেবতা-কল্পনা ও বিশ্বানুভূতির মধ্যে ভগবৎ-স্বরূপ-উপলব্ধির যে পরোক্ষ আভাস ছিল, নিজ ব্যক্তিসত্তার অতীত রহস্যময়ী নিয়ন্ত্রী শক্তির পরিচয়-লাভে যে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা দেখা গিয়াছিল, তাহাই প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার কবিতার প্রেরণারূপে উপস্থিত হইল। 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'খেয়া' (১৯০৬), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও 'গীতালি' (১৯১৪) তাঁহার অধ্যাত্ম-ভাব-পরিক্রমার নিদর্শন। তিনি ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন কোন সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট পূজানুষ্ঠান বা রূপধ্যানের মধ্য দিয়া নহে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে তাঁহার চকিত প্রকাশে, এক ক্রীড়াশীল অদৃশ্য সত্তার মুহুর্মুহু আবির্ভাব-অন্তর্ধান-লীলার লুকোচুরিতে, কখনও কখনও একান্তবিহ্বল আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। ইহাদের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' গানের সংকলন-গ্রন্থ। এগুলিতে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় গীতিকবিতার লেখক-রূপে নয়, গীতরচয়িতা-রূপে। গান ও গীতিকবিতার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, গানে কবি তাঁহার ভাবকে, যথাসম্ভব লঘু তুলির টানে, কল্পনা-প্রয়োগকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া ও সুরের অন্তরঙ্গ সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, প্রকাশ করেন; গীতিকবিতায় কল্পনার ঐশ্বর্য ও বহুচারিতা ও অনুভূতির নিবিড়তা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ-প্রবাহের মাধ্যমে রূপ লাভ করে। রবীন্দ্র-নাথের গানগুলি সহজ, সরল, অলঙ্কাররিক্ত কথায় তাঁহার অন্তরের ভক্তি ও ভগবৎ-

তৃতীয় পর্বে ভগবৎ-স্বরূপোপলব্ধি

প্রেমের আকৃতিকে অভিব্যক্তি দিয়াছে। এই ভগবদ্‌ভক্তিমূলক গানগুলিতে কবির মনে উপনিষদের চেতনা ও আধুনিক মনের প্রকৃতিপ্রীতির ও ভাববৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। 'গীতাঞ্জলি'তেই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মবাদ ও ঈশ্বরোপলব্ধির নিবিড়তার প্রথম পরিচয় পায় ও রবীন্দ্রনাথের নোবেলপুরস্কার-প্রাপ্তি তাঁহার এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নিদর্শন।

এই কালপর্বের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও সমকালীন আর দুইখানি কাব্যগ্রন্থ —'কথা ও কাহিনী' (১৯০০) ও 'ক্ষণিকা' (১৯০০) রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার বিচিত্র লীলার পরিচয় দান করে। 'কথা ও কাহিনী'তে কবির প্রেমাতুর কল্পনা, বরণীয় বিষয়-গৌরব, দেশের ঐতিহ্য-কীর্তির উদাত্ত প্রশস্তি ও দৃঢ় ও দ্রুতগামী আখ্যানবস্তুর সংযোগে এক নূতন ওজস্বিতা, পৌরুষদৃপ্ত রসাবেদন লাভ করিয়াছে। কবির গীতিপ্রাণতা এখানে সংঘর্ষময় আখ্যায়িকার বস্তুরস ও গতিবেগের সহিত যুক্ত হইয়া উহার অভ্যস্ত স্বপ্নবিভোরতার পরিবর্তে এক সতেজ প্রাণোচ্ছলতায় স্পন্দিত হইয়াছে। 'ক্ষণিকা'তে কবি জীবনবোধের এক লঘু-চপল, পরিহাস-স্নিগ্ধ রূপ আঁকিয়াছেন—ভাবমুগ্ধ আদর্শবাদের উল্টা দিকে যে কৌতুকরস বাস্তব সত্যস্বীকৃতির আধারে সঞ্চিত থাকে, তাহারই ছোট ছোট তরঙ্গলীলায় দোলা খাইয়াছেন। তাঁহার কাব্য অতি সহজভাবে এই পরিবর্তিত মনোভঙ্গীর ছন্দটি অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছে।

'কথা ও কাহিনী' ও 'ক্ষণিকা'র সুর

চতুর্থ পর্বে রবীন্দ্রকাব্য আবার দিক্‌-পরিবর্তন করিয়াছে। 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) ও 'মহুয়া' (১৯২৯)—এই তিনখানি কাব্য কবির নূতন জীবন-দর্শনের পরিচয় বহন করে। এই কাব্যগুলিতে কবির প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস, তাঁহার প্রেমানুভূতির ভাবস্বপ্নবিহার ও উচ্চকণ্ঠ আবেগ-মূর্ছনা অনেকটা শান্ত, স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত মিশিয়াছে পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা, মননশীল জীবন-বীক্ষণ ও পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনের গভীরতর তাৎপর্যবোধ। 'বলাকা'-তে কবি প্রথম মহাযুদ্ধের ভাবালোড়ন, উহার জীবন-সমীক্ষার নূতন প্রেরণা, এই ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ পরিবেশে মানব-মনের দুরূহতর প্রয়াস ও আদর্শনিষ্ঠার কথা গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন ও তাঁহার ছন্দরীতির পরিবর্তনে এই ভাবান্তর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'বলাকা'র অনিয়মিত, অসম ছন্দ-বিন্যাসে, ঝড়-খাওয়া মনের বিসর্পিত আন্দোলন, উহার চিন্তাধারায় তট হইতে তটান্তরে প্রহৃত ভাব-তরঙ্গের অস্থির

চতুর্থ পর্বের বলাকা, পূরবী ও মহুয়া

গতি ও দূরব্যাপী বিস্তার, উহার সমাধান-অন্বেষণ ও আত্মানুসন্ধানের সংশয়াকুল পদক্ষেপ যেন আপন প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত করিয়াছে। 'পূরবী'তে যৌবনস্মৃতি-পর্যালোচনার সঙ্গে আসন্ন বিদায়ের করুণ সুর ও পরিণত জীবনদর্শনের শান্ত, সমন্বয়কারী বিচারবুদ্ধি মিলিত হইয়া জীবনের এক গভীরতর অর্থ দ্যোতিত হইয়াছে। যৌবনের আবেগ-উষ্ণতা ও সৌন্দর্যবোধ প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞাঘন অনুভূতিতে নিমজ্জিত হইয়া এক অপরূপ রসনিবিড়তা ও ভাববিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'মহুয়া'তে কবির বার্ধক্যে দ্বিতীয় যৌবনের রক্তিম স্ফুরণ ঘটিয়াছে। এ যৌবন বসন্তের সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিবিধানে ইহার নিগূঢ় অভিপ্রায়, ইহার মধ্যে প্রাণোচ্ছলতার দুর্বার বেগ, ইহার নেপথ্যলীলার গোপন ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করে। ইহার প্রেম প্রকৃতির প্রাণরহস্যে অভাবনীয়, ইহার বর্ণানুরঞ্জনে চিত্র-বিচিত্র, এক দুর্জয় আত্মিক সংকল্পে মোহমুক্ত ও উর্ধ্বচারী। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধিব পদের অনুরূপ এখানেও এক বিরলতর বয়ঃসন্ধির বর্ণনা। এখানে কৈশোর-যৌবনের মিলনের পরিবর্তে যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মিলন দেখি। হররোষদগ্ধ মদনের মত এখানে যৌবনের যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছে, তাহাতে ইহার স্থূল মোহাবেশের পরিবর্তে ফুটিয়াছে অনন্ত গতি-প্রেরণা, আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বিশ্বচেতনার উপলব্ধি, ইন্দ্রিয়ানুগত রূপপিপাসার পরিবর্তে তৃতীয় নয়নের প্রখর অধ্যাত্মদীপ্তি। এই তপঃপূত, অধ্যাত্মমন্ত্রদীক্ষিত, বিশ্বের চিরনবীন, বারে বারে প্রত্যাবৃত্ত প্রাণধারার উৎসের সহিত নিগূঢ়ঐক্যবিধৃত যৌবনলীলাই 'মহুয়া'র প্রধান মৌলিক প্রেরণা ও ইহার অপরূপ, ভাবানুসারী প্রকাশেই ইহার মহত্ত্ব।

(৩)

পঞ্চম পর্বে রবীন্দ্রনাথ আবার নূতন দুঃসাহসিক পরীক্ষা লইয়া কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও পাঠকের অভ্যস্ত ধারণাকে আবার বিপর্যস্ত করিলেন। এই পর্বে পর্বে নববিকাশই রবীন্দ্রকাব্যের মূল বিস্ময়। শাজাহান সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ", তাহা তাঁহার নিজের কবি-জীবন সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি সর্বদা নিজ অতীত কীর্তিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সমুৎসুক। করায়ত্ত সিদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া দুরূহতর অপরীক্ষিত সাধনার দিকেই তাঁহার অভিযান। যিনি ছন্দের রাজা ও কাব্যসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, গীতিরসে যাঁহার কবিতার পাত্র কানায় কানায় উচ্ছ্বসিত, তিনি হঠাৎ ছন্দোহীন ও গদ্যছন্দে লেখা, রূপপ্রসাধনবর্জিত, কল্পনার ঐশ্বর্যরিক্ত কবিতা-

পঞ্চম পর্বে গদ্য-ছন্দের সৃষ্টি

রচনায় মন দিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যেমন কাব্যের প্রাণশক্তির উৎস-সন্ধানে সমস্ত বহিরঙ্গমূলক অলঙ্কারকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ধ্বনিতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি কাব্যের মূল উপাদান-আবিষ্কারে ছন্দ-শব্দ-কল্পনার সমস্ত ঐশ্বর্য পরিহার করিয়া সর্বাভরণরিক্ত বিশুদ্ধ অনুভূতিকেই উহার প্রাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কবি তাঁহার এই পর্বের কাব্যগুলির মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন যে, কবিতার সৌন্দর্যবর্ধন কোন উপায়-প্রয়োগ-ব্যতিরেকেই, সংগীতঝঙ্কারে কানের ও কল্পনা-সৌন্দর্যে মনের কোন মোহাবেশ সৃষ্টি না করিয়াই, শুধু অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ও ব্যাকুলতায়ই কাব্যের নিগূঢ় আবেদন পাঠকচিত্তে সংক্রামিত করা যায় কি না। অর্থাৎ কবিতার আবেদনের মধ্যে উহার শিল্পরূপের ও ভাবরূপের পারস্পরিক গুরুত্ব কতখানি, তাহা নির্ণয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কোন একটি বিষয়ের প্রথম কাব্যানুভূতি ও ইহার পরিণত, সুষ্ঠু-আঙ্গিকবিন্যস্ত রূপশিল্পের মধ্যে কোন ব্যবধান আছে কি না, ও থাকিলে কি বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা তাহা পূর্ণ করা যায়, কবিকৃতির এই নিগূঢ়রহস্যোদ্‌ভেদ-প্রয়াসই এই সমস্ত কবিতায় করা হইয়াছে।

পঞ্চম পর্বের গন্ধ-কবিতার মূল সুর

অনেক সংবেদনশীল পাঠকের মনেই একটা কাব্যরসপ্রবণতা আছে; এই প্রবণতাই কবির শিল্পগুণান্বিত উদ্বর্তিত (Sublimated) রসপরিবেশনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। যেখানে এই পূর্ণ রসপরিণতি ও শিল্পায়ন ঘটে নাই, যেখানে কবি তাঁহার অর্ধপরিণত, মানস রসের ভিয়ানে আধ-পাক-করা ভাব-ভাবনাগুলি উপস্থাপিত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, সেখানে আমরা পূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকি। শ্রেষ্ঠ কাব্য শুধু অনুভূতি-সর্বস্ব নহে, অনুভূতির সু-সংস্কৃত, রসসারগঠিত, সার্বভৌম আবেদনে প্রতিষ্ঠিত সত্তাশ্রয়ী। অবশ্য এমন হইতে পারে যে, কোন বিরল মুহূর্তে প্রথম অনুভূতি ও পরিণত রসরূপ যুগপৎ আবির্ভূত হয়, বা কোন অনুভূতির অসংস্কৃত বিকাশই কবিমানসের একটা বিশেষ ক্ষণ বা মেজাজের নিখুঁত অভিব্যক্তি হইয়া দাঁড়ায়। 'ক্ষণিকা' ও 'কণিকা'র কবিতাগুলি এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে; কোন ঊর্ধ্বচারী কল্পনা বা সূক্ষ্ম কারুকার্যের আরোপ উহাদের প্রকৃতিবিরোধী হইত। এই পর্বের কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কোন দার্শনিক তত্ত্ব, জীবন-বীক্ষণের কোন বিশেষ রকমের মৌলিকতা কাব্যসৌন্দর্যের মুখাপেক্ষী না হইয়াই নিজ ভাবগরিমার বলেই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে—উহাদের মধ্যে কাব্যকলার বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও উহাদের বিষয়-গৌরব ও কল্পনার মহনীয়তা সেই

অভাব পূরণ করিয়াছে। মোটামুটি, তাঁহার এই পরীক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থগুলি—'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) ও 'শ্যামলী' (১৯৩৭)—সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাইতে পারে যে, ইহাদের মধ্যে ছন্দোহীন কাব্যের সীমা কিছুটা প্রসারিত হইলেও, কিছু কিছু দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা কাব্যকলা-নিরপেক্ষ হইয়া কাব্যরসের আস্বাদন দিলেও, কোন নূতন, ব্যাপকভাবে অনুসরণ-যোগ্য কাব্যরীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নিরাভরণা, সহজ-সুন্দরী কাব্যানুভূতি বিরলক্ষেত্রে সম্ভব হইলেও উহাকে এই বেশে রসিক-রুচির স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত করা যায় না। অতি-প্রসাধিতা ও অ-প্রসাধিতা—উভয়প্রকার কবিতাই আমাদের মনোহরণে অক্ষম। তবে উৎকৃষ্ট কাব্যেও অলংকরণের পরিমাণ যে কমানো যায় ও ইহাকে প্রধানত ভাবসৌন্দর্যের উপর যে নির্ভরশীল করা সম্ভব, এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের রচনার মধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে এরূপ দাবি করা যায়।

ষষ্ঠ বা শেষ পর্বের কাব্যধারায়—'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯), 'সেঁজুতি' 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪১), 'আরোগ্য' (১৯৪১) ও 'জন্মদিনে' (১৯৪১)—রবীন্দ্রকাব্য-মহিমার শেষ পরিচয়টি অস্তরশ্মির স্বর্ণকিরীটমণ্ডিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই কাব্যগুলির মধ্যে 'আকাশপ্রদীপ', নবজাতক' ও 'সানাই'-এ কবি-কল্পনার শিথিল, এলায়িত ভঙ্গী, ছোট ছোট ঘটনা ও অসংবৃত বস্তুপুঞ্জের অন্তর্নিহিত রসবিন্দুটিকে ফুটাইয়া তোলার প্রবণতা ও গদ্যছন্দের স্মৃতিবাহী সহজ সরল ছন্দ-প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের অধিকাংশ কবিতাতেই কবি যেন গোড়া হইতে কাব্যমনোভাব লইয়া লিখিতে আরম্ভ করেন নাই এই ধারণাই জন্মে। তিনি প্রথমে বস্তু-স্তূপ-জর্জরিত, স্থূল প্রতিবেশ-রচনায় মনোযোগী হইয়াছেন; তাহার পর অকস্মাৎ তাঁহার কাব্যানুভূতি এই বিপরীত প্রতিবেশে জাগিয়া উঠিয়া ইহার মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য-সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে। 'সানাই' কবিতাটিতে বিবাহবাড়ির ছুটাছুটি-হুড়াহুড়ি ও উপকরণ-বাহুল্য যেন সানাই-এর সুরে এক অমর্ত্য ব্যঞ্জনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মাটির পাত্র যেন অমৃতরসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। 'নবজাতক'-এর 'এপারে-ওপারে' কবিতায় কবির শুষ্ক, আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিবাদ ও তাঁহার প্রতিবেশীদের ছন্দোহীন, তুচ্ছ প্রয়োজনের চাপে বিকৃত জীবনযাত্রার মধ্যে যে ফাঁক তাহাই পূর্ণ করিয়া অকস্মাৎ প্রাণলীলার সর্বকলুষহর আনন্দনির্ঝর প্রবাহিত হইয়াছে। অনেকগুলি

কবিতায় অস্পষ্ট অনুভূতি, ক্ষণিক ভাব, লঘু-রঙীন কল্পনাবিলাস, গানের হঠাৎ উচ্ছ্বসিত সুর, সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ সঞ্চয় হইতে হেলায় আহৃত উদ্বৃত্ত রসবিন্দু অনায়াস নৈপুণ্যের সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন কবিতায় আগামী কালের বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত জীবনে কাব্যানুভূতির কিরূপ স্ফুরণ সম্ভব, তাহা দেখানো হইয়াছে। এই কাব্যগুলির সামগ্রিক আলোচনা হইতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও কবি-চেতনা কিরূপ নূতন উপলব্ধির মধ্যে কল্পনা-লীলার সহজ, অযত্নসিদ্ধ ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মরণের উপকূলে দাঁড়াইয়াও কবি নূতন চিন্তা ও অনুভূতিকে আত্মসাৎ ও নূতন ছন্দে উহাদিগকে রূপায়িত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পর্বের কয়েকটি কবিতার মধ্যে লঘু কল্পনা-লীলা

'প্রান্তিক', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', ও 'জন্মদিনে' কবিপ্রাতভার স্বর্ণ-প্রদীপ নির্বাপিত হইবার পূর্বে এক নূতন, উর্ধ্বারোহী শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রোগজীর্ণ কবি তাঁহার রোগযন্ত্রণার মধ্য দিয়া জীবনকে এক দুঃখময় বিকার-আবিল দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, জীবনের মধ্যে ব্যাধিক্লিষ্ট-চেতনা-কল্পিত ব্যর্থ সৃষ্টিপ্রয়াসের প্রতিরূপ বিকলাঙ্গ বস্তুপিণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, রোগকক্ষের জীবনবেগহীন, একদিকে উদ্বিগ্ন শুশ্রূষা অপর দিকে অলস কল্পনার সমবায়ে রচিত, বদ্ধ আবহাওয়া অনুভব করিয়াছেন ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত অভিনব উৎপীড়নের উপর আত্মমহিমায় স্থির মানবাত্মার জয় ঘোষণা করিয়াছেন। ব্যাধি বিকারের এরূপ সূক্ষ্ম ও সত্য কাব্যরূপায়ণ, উহার বিভীষিকা, অসংলগ্ন চিন্তা, অসুস্থ মনের উদ্ভট, দুঃস্বপ্ন-ক্লিষ্ট অনুভূতির এরূপ আবেগময় ও শিল্প-সুমিত বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্তির স্বস্তি ও আনন্দোচ্ছ্বাস, জীবনের অতি-পরিচিত বিষয়ের মধ্যেও অপরূপত্বের আবিষ্কার, সদ্যোনিরাময় কল্পনার ক্লান্ত-করুণ, স্বল্প-পরিসরে নিঃশেষিত বিকাশ-প্রেরণা, দুর্বল মননের বাধা সত্ত্বেও কাব্যানুভূতির অল্প কয়েক পা হাঁটিবার প্রয়াস কয়েকটি কবিতায় চমৎকার-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রোগ ও আরোগ্য উভয় অবস্থারই এরূপ স্পষ্ট ও কৌতূহলোদ্দীপক ছাপ কাব্যসাহিত্যে আর কোথায়ও পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ।

ষষ্ঠ পর্বের প্রান্তিক, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে মানবাত্মার জয়-ঘোষণা

কিন্তু এই পর্যায়ের কবিতার বিশিষ্ট গৌরব ইহার জীবনমৃত্যুরহস্যের স্বচ্ছ, জ্যোতির্ময় অনুভূতি ও প্রকাশে, ইহার অধ্যাত্মবোধের স্থির দীপ্তিতে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আসন্ন বিদায়ের ছায়া দেহ-মনে অনুভব করিয়া মৃত্যুর স্বরূপ

সম্বন্ধে এত দৃঢ় প্রত্যয়, এরূপ প্রত্যক্ষবৎ সুস্পষ্ট, সংশয়লেশহীন উপলব্ধি হয়ত আর কোন কবিরই নাই। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-পুষ্ট মন নিজের ক্ষেত্রেও সেই ঔপনিষদিক তত্ত্ব-প্রতীতিকে প্রয়োগ করিয়াছে ও উহাকে কবিচিত্তের গভীর রসবোধ ও অসীমের সহজ অনুভূতির সহিত সংযুক্ত করিয়া ঋষির ধ্যানদৃষ্টি ও কবির ভাবতন্ময়তাকে এক সঙ্গে মিলাইয়াছে। অধ্যাত্মসত্য কবির ব্যক্তি-চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া এক অপরূপ রসপরিণতি ও অর্থনিগূঢ়তা লাভ করিয়াছে; কবি যেন এখানে উপনিষদের এক নূতন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যসমূহে এক প্রশান্ত, নিরাসক্ত মন লইয়া সমস্ত মোহবন্ধন ও মায়াবিভ্রম ছিন্ন করিয়া, তাঁহার ব্যক্তিজীবনের সমস্ত অর্জিত সম্পদ, এমন কি অহংবোধকে বিসর্জন দিয়া অস্তিত্বের পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; সমস্ত পরিচয় ও বিশিষ্ট-চিহ্নবর্জিত এক চেতনাবিন্দুরূপে জ্যোতিঃসমুদ্রের মহাসঙ্গমতীর্থে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহনীয় ভাবচেতনার সঙ্গে কবি-কল্পনার উদাত্ত গাম্ভীর্য, নিবিড় সংহতি ও বিষয়গৌরব-শাসিত বাক্-সংযম মিশিয়া এই কবিতাগুলিকে কেবল কাব্যকৃতির ঊর্ধ্বে এক-একটি নিগূঢ় ধ্যানমন্ত্রের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানবজীবনের সমগ্র বিচিত্র কর্মজাল ও বহুবিস্তৃত প্রয়াস যেমন মৃত্যুর আকর্ষণে একটিমাত্র পরিণামমুখী প্রবাহে সংহত হয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সমস্ত লীলাবৈচিত্র্য, তাঁহার কল্পনার নানাবর্ণরঞ্জিত উচ্ছ্বাস ও অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিচিত্রায়িত বিস্তার অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হইয়া পরমরহস্যাভিমুখী একটিমাত্র অনুভূতি-ধারার অচঞ্চলতায় আসিয়া মিশিয়াছে। বিচিত্ররূপিণীর অনুসরণে দূরাভিযানে বহির্গত, চিরপথিক কবি-আত্মা বৈচিত্র্যের অন্তরশায়ী একের সহিত একাত্মমিলনে নিজ চিরচঞ্চল গতিবেগে মহাবিরতির সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। মহাকবির কাব্যসাধনার ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর ও সার্থকতর পরিসমাপ্তি কল্পনাও করা যায় না।

এই পর্যায়ের বিশিষ্ট সুর অধ্যাত্মবোধের রস-পরিণতি

(৪)

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'জন্মদিনে' পর্যন্ত কবিমানসের জয়যাত্রার কি অপূর্ব ইতিহাস! বিষয়ের নানামুখীনতায়, রচনার বিষয়োপযোগী পরিবর্তনে, কাব্যের আঙ্গিকের বিচিত্র-রূপে, কল্পনা ও মনোভঙ্গীর নব নব প্রকাশে, মননসূত্রের দৃঢ়তায়, ভাব ও রূপের নিবিড় একাত্মতায় রবীন্দ্রকাব্য বিপুল, বিরাট, বিস্ময়কর ও বিশ্ব-সাহিত্যে অতুলনীয়। গীতিকবিতা, গান, আখ্যান-কাব্য, জীবন-ব্যাখ্যান ও

অধ্যাত্ম-অনুভূতি-মূলক কাব্য, নাট্যরস-প্রধান কাব্য, লঘু কল্পনা ও হাস্যরসিকতা-আশ্রয়ী কাব্য—ইত্যাদি কবিতার প্রায় সবরকম প্রকরণেই তিনি সমান কুশলী। বিষয় দিক দিয়া প্রেম, প্রকৃতি, পৌরাণিক আখ্যান, অতীত কিংবদন্তী ও ইতিহাস, আধুনিক যুগের চিন্তা-মনন, ভগবৎ-উপলব্ধির সাধনা—এই সমস্তই তাঁহার কাব্যের উপজীব্য; তাঁহার প্রেম-কবিতার ভাবওস্থর রূপবিহ্বলতার স্তর হইতে মনস্তাত্ত্বিক নানা বৈচিত্র্যের পর্যায় অতিক্রম করিয়া, ভোগ, অতৃপ্তি, বিরহাকুলতা, মানসজিজ্ঞাসার বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, শেষ পর্যন্ত চরম আধ্যাত্মিক পরিণতি, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্বর্তনে পৌঁছিয়াছে। তাঁহার ঋতুপর্যায়ের কবিতা শুধু প্রকৃতির রূপান্তরের চিত্রই আঁকে নাই, উহার অন্তর্নিহিত ভাবসাধনাটি ক্রমপর্যায়ে উদ্ঘাটিত করিয়া উহাকে নিখিলের নিয়মছন্দের সহিত গ্রথিত করিয়াছে; নটরাজের নৃত্যলীলার ছন্দে ছন্দে প্রকৃতির এক-একটি রূপ ও অন্তরের আবেগ যেন এক নিগূঢ় অভিপ্রায়-সাধনের অঙ্গরূপে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যের বিচিত্র আভমুখিতা

পুরাণের বিশেষ আখ্যানকে তিনি নির্বিশেষে ভাব-সত্য ও সার্বভৌম রূপ-ব্যঞ্জনার বাহনরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার উর্বশী স্বর্গনারী হইতে মানবের অপরিতৃপ্ত রূপমোহ, অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তাকে ব্যক্তি-কামনার মদির আলিঙ্গন-পাশে বাঁধিবার ব্যর্থ-করুণ প্রয়াসের বিভ্রমময় প্রতিমারূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার মদনভস্ম ও রতিবিলাপ দেহাতীত ভাবের ন্যায় সমস্ত জীবন-প্রতিবেশে পরিব্যাপ্ত ও এক অনির্দেশ্য, অন্তর্গূঢ় রোদনগুঞ্জনরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার চিত্রাঙ্গদা মহাভারতের বিশেষ নারী হইতে রূপ-ছলনা হইতে মুক্তিকামী ও নিজ প্রকৃতিস্বরূপের উপর দৃঢ়নির্ভরশীল এক মানবআত্মায় নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। অহল্যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাপ ও পাপমুক্তির উদাহরণ নহে, পাষাণরূপে সে যে নিখিলের প্রাণলীলাপ্রবাহের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল, তাহারই স্মৃতিতে রোমাঞ্চিত ও তাহার মানবজীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চেতনাহীন। জীবন যদি জড়ে ফিরিয়া যায়, তবে তাহার অনুভূতির কয়েকটা গবাক্ষ বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বচেতনার সিংহদ্বার যে তাহার নিকট অবারিত হয়, রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকেই অপূর্ব কাব্যরূপ দিয়াছেন। মেঘদূত রবীন্দ্রকাব্যে শুধু স্বাধিকারপ্রমত্ত ও অভিশাপ-বারিত যক্ষের বিরহ-বেদনা নহে,

পুরাণ-কল্পনার নবীকরণ

ইহা আদর্শ ও বাস্তবের ব্যবধান-পীড়িত প্রত্যেক মানুষের এক সর্বজনীন ক্ষুব্ধ অনুভূতি। পুরাণ-কল্পনার এই রূপান্তর ও নবীকরণ রবীন্দ্র-কাব্যের এক অনন্যসাধারণ গৌরব।

রবীন্দ্রকাব্যে বহিরঙ্গ-সৌন্দর্য

ফর্ম বা রূপের দিক দিয়া ও প্রকাশভঙ্গীর বিষয়ানুরূপ বিশিষ্টতার মানদণ্ডেও রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। গান, গীতিকবিতা, Ode বা ভাবসমুন্নতিময়, জটিলছন্দগ্রথিত, উদাত্তভঙ্গীর গীতোচ্ছ্বাস, গাথা-কবিতার অলঙ্কার ভারমুক্ত, স্বচ্ছন্দগতি, মনন ও তত্ত্বপ্রধান কবিতার নিরুচ্ছ্বাস, মুক্তছান্দিক বিসর্পিত চিন্তাপ্রবাহ, চতুর্দশপদী কবিতার গাঢ়বদ্ধ ভাব-পরিমিতি, গদ্যছন্দের অবাধ বিস্তারের মধ্যে অলক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ, রোমান্টিক রীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির অন্তরচারী কল্পনালীলা ও ক্ল্যাসিক্যাল রীতির ভাবগাম্ভীর্যময় অর্থগৌরবসন্ধানী মিতভাষিতা—এই সমস্ত রকমের রূপকলা ও প্রকাশ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ রবীন্দ্র-কবিতায় উদাহৃত হইয়াছে। তাঁহার কিছু কিছু কবিতা হয়ত অতি-মুখরতায় ভারাক্রান্ত; হয়ত কোথাও কোথাও আবেগের আতিশয্য অতি পল্লবিত বিস্তারের হেতু হইয়াছে। হয়ত ভবিষ্যৎ যুগে বাঙালীর জীবনছন্দ এমন মৃদুমন্দ গতিতে, এমন দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে, বিরোধী ভাব-ভাবনার চক্রঘূর্ণনে পাক খাইয়া অগ্রসর হইবে যে, ইহা রবীন্দ্রকাব্যের অবিরাম গতিশীলতা ও গভীরপ্রত্যয়সঞ্জাত ভাবপ্রেরণার সঙ্গে তাল মিলাইতে পারিবে না। সেইজন্যই মনে হয়, তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের প্রভাব অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাঁহার কাব্যের বহিরঙ্গ-মূলক সৌন্দর্যের প্রতি প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব—তাঁহার কবিচেতনার মূলে আমাদের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। তথাপি যেমন বৈষ্ণব ভাবাদর্শ অনুসরণ না করিয়াও আমরা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের চিরন্তন সৌন্দর্য আস্বাদন করি, তেমনি রবীন্দ্রভাববিমুখ ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরাও তাঁহার কাব্যে একটা অফুরন্ত রসাবেদন পাইবে। মানুষের ভবিষ্যৎ যদি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির পথ ধরিয়াই অগ্রসর হয়, তাঁহার কল্পনা ও আদর্শই যদি অনাগত যুগে মানবের বাস্তবজীবন-চর্চার রূপ পরিগ্রহ করে, তবে মহাকালের দীর্ঘদিন-বিলম্বিত রায়ে তিনি যে সর্বমানবের অন্তরতম অভীপ্সার মহাকবিরূপে স্বীকৃতিলাভ করিবেন, এরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী নিতান্ত অবিবেচনা-প্রসূত হইবে না

খ—ছোটগল্প ও উপন্যাস

(৫)

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের প্রথম স্রষ্টা ও উপন্যাসের দিক্‌পরিবর্তনের প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও উপন্যাসে প্রায় এক সঙ্গেই হাত দেন—কাব্যে স্বকীয় প্রেরণায় ও উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে। তাঁহার 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮২) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৫) 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) ও 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) ও 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সমকালীন এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। পদ্যগীতিতে ও গদ্য-আখ্যানে একই রকমের অস্ফুট কল্পনাপ্রবণতা ও ভাববিলাস, বাস্তব জীবনের প্রতি একইরূপ ঝাপসা স্বপ্নকুহেলিকা-মাখা দৃষ্টি, জীবনানুভূতিতে সেই একই আত্মমগ্ন অস্পষ্টতা। কবির সাহিত্যজীবনের সেই প্রথম পর্যায়ে কবি এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্‌টিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিবেন, তাহা যেন স্থির করিতে না পারিয়া দোলায়মান চিত্তে উহাদের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তথাপি মনে হয় যে, উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তাঁহার মনের অপেক্ষাকৃত পরিণত প্রকাশ ঘটিয়াছিল। তরুণ কবি বাস্তব জীবনের সংস্পর্শহীন, অনির্দেশ্য আকৃতি-আবর্তের মধ্যেই পাক খাইতে থাকেন; তরুণ ঔপন্যাসিককে নিজ অন্তরের ভাবাবিষ্টতাকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের পথ খুঁজিয়া লইতে হয় ও জীবনের খানিকটা সত্য পরিচয়ের প্রমাণ দিতে হয়।

বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষির চরিত্রসমূহ বিশুদ্ধ ভাব-কল্পনাজাত

প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বিভা, বসন্ত রায়, গোবিন্দমাণিক্য, রঘুপতি, জয়সিংহ, অপর্ণা প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টি ও উহাদের মধ্যে হৃদয়-সংঘাত, মূলত কবিকল্পনাপ্রসূত হইলেও, বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার কিছুটা পরিচয় বহন করে। এই চরিত্রগুলি যেন প্রত্যেকে এক-একটি মানস প্রবণতার মূর্ত প্রকাশ; বাস্তব জীবনে যে পরস্পর-বিরোধী জটিলভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে সে জটিলতার একান্ত অভাব। লেখক অবশ্য ইহাদিগের মধ্যে অনেককে ইতিহাস হইতে ও বাকিগুলিকে কল্পনার মায়ালোক হইতে আহরণ করিয়াছেন। কিন্তু কবিকল্পনার একমুখীনতা, একটি বিদেহী ভাবকে রূপ দিবার উদ্দেশ্যে উহার জন্য রক্ত-মাংসের রূপক-রচনা এই চরিত্রসমূহের প্রাণস্পন্দনের মূল উৎস। প্রতাপাদিত্য জীবনের অহেতুক, যান্ত্রিক ক্রূরতা; বসন্ত রায় উহার বিপদতুষার-

পাতে জমাট-বাঁধা আনন্দ-নির্ঝর; গোবিন্দমাণিক্য উহার বাস্তব সংগ্রামবিমুখ অন্তরলোকে স্থির, আদর্শবাদ; রঘুপতি ব্রাহ্মণ্যসংস্কারান্ধ আচারনিষ্ঠা। জয়সিংহই একমাত্র ব্যক্তি, যে জীবনের উভয়দিক সম্বন্ধে সচেতন ও অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত। সুতরাং এই নর-নারীগুলি সব বিশুদ্ধ ভাবরাজ্যের (Idea) অধিবাসী; ইতিহাস ইহাদের পাদপীঠ ও জীবন ইহাদের নেপথ্যগৃহ। আসলে ইহারা ইতিহাসের সিঁড়ি বাহিয়া ভাবলোকের গুহা হইতে জীবনের আলোকে প্রকাশিত হইয়াছে, ও রহস্যের আঁধারের সহিত আলোক-চূর্ণের কল্পিত রশ্মি মাখিয়া জীবনের সহিত সাধর্ম্যের অভিনয় করিয়াছে।

'রাজর্ষি-র (১৮৮৫) পরে প্রায় দীর্ঘ সতর বৎসরকাল রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-রচনা হইতে বিরত ছিলেন। 'চোখের বালি' (১৯০২) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) তাঁহার পরবর্তী উপন্যাস। এই অন্তর্বর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ কাব্যপরিণতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলেন ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি ভাবের প্রগাঢ়তা ও রূপের সুনির্দিষ্টতা লাভ করিতেছিল। এই সময়, ১৮৯১ খ্রীঃ অঃ, হইতে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের একটি শাখা ছোটগল্পে হাত দেন ও প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় ইহার অনুশীলন করিয়া ইহাকে অপরূপ সৌন্দর্য-সুষমায় ও অনবদ্য শিল্পরূপে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। এই নূতন অভিজ্ঞতা ও জীবনের বিচিত্র রূপ-রসের সহিত পরিচয়ের ফলে তিনি যখন উপন্যাসক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁহার জীবনসমস্যাবিচারের শক্তি পরিপক্ক পরিণতির স্তরে পৌঁছিয়াছে।

জীবনসমস্যামূলক উপন্যাস

'চোখের বালি' এক সম্পূর্ণ বাস্তব সংঘাতের চিত্র; ইহার মধ্যে যে কাব্যানুভূতি আছে, তাহা কোনরূপ অস্পষ্টতার কুজ্‌ঝটিকা রচনা না করিয়া চরিত্র-পরিকল্পনাকে স্বচ্ছতর ও প্রাণরহস্যদ্যোতক করিয়াছে। এই কাহিনীর নরনারী-গুলি শুধু একটিমাত্র ভাবের বাহন নহে; তাহাদের অন্তর্লোক নানা জটিল আত্মবিরোধে নিজেদের কাছেও দুর্বোধ্য। বিনোদিনীর মন যে স্তরে মহেন্দ্রকে জয় করিতে চাহে, তাহারও গভীরতর স্তরে বিহারীর প্রতি আকৃষ্ট ও সর্বনিম্ন স্তরে সে কাহাকেও না চাহিয়া প্রেমের আদর্শস্বপ্নেই পরিতৃপ্ত। রাজলক্ষ্মী বধূর প্রতি ঈর্ষায় ও পুত্রের উপর পূর্বতন অধিকারবোধ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভিতরে ভিতরে বিনোদিনীর অবৈধ প্রেমলালসার প্রশ্রয়দাত্রী। অন্নপূর্ণা ও আশা তাহাদের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারাই উপন্যাসের দ্বন্দ্বকে জটিলতর করিয়াছে; তাহারা পরিবার-জীবনে নিজ নিজ অংশ যথার্থ-

চোখের বালি

ভাবে অভিনয় করিলে যে শূন্যতার সুযোগে আকর্ষণের বায়ুপ্রবাহ দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই নিরেট-নীরন্ধ্রভাবে পূর্ণ হইত। বিহারীর হিতৈষণা আশার সহিত তাহার সম্পর্কের পূর্ব ইতিহাস দ্বারাই বিড়ম্বিত হইয়া সঙ্কুচিত ও নিষ্ফল হইয়াছে; বিশেষত মহেন্দ্রের ছায়া ও পরিপূরকরূপে তাহার ব্যক্তিত্বই অপরিস্ফুট রহিয়া গিয়াছে। সে গোরা সৈনিকের সহিত ঘুষি লড়িতে পারে, কিন্তু মহেন্দ্রের প্রতিযোদ্ধারূপে নিজেকে কল্পনা করিতে পারে না। মহেন্দ্রের অস্থিরমতিত্ব ও আত্মবিলাস উপন্যাসের জীবনবোধের মর্যাদাকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তাহাকে আশ্রয় করিয়া কোন সত্যিকার গভীর উপলব্ধির উদ্ভব হইতে পারে না। তাহার একমাত্র কাজ হইল বিনোদিনী-চিত্তের উদ্বোধন; হাঁটুজলে ক্রীড়াচ্ছলে সাঁতার দিতে দিতে বিনোদিনী স্রোতঃক্ষুব্ধতার গভীরে আত্মনিমজ্জন করিয়াছে। মহেন্দ্রের সত্য প্রয়োজন এইখানেই। সমস্ত উপন্যাসটিতে মোটের উপর, বিশেষতঃ বিনোদিনী-চরিত্রে, জীবনবোধের মহনীয়তা স্ফুরিত হইয়া ইহাকে মর্যাদা দিয়াছে।

'নৌকাডুবি'তে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনারই প্রাধান্য। মানুষের ভুল পরিচয়, হইতেই ঘটনাবলীর সমস্ত গতি ও মনের সমস্ত জটিল সম্পর্কবিরোধ উদ্ভূত হইয়াছে। যে ভুল এক মুহূর্তে ভাঙা উচিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে জীয়াইয়া রাখিয়া উপন্যাসের সমস্যাকে রূপ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে সাধারণ বাঙালী জীবনধারার ও ঐ জীবনসুলভ আদর্শনিষ্ঠার নিকট (close)-অনুসরণ করিয়াছে। উমেশ ও চক্রবর্তী খুড়া এই জীবনের প্রতিনিধি ও নলিনাক্ষের প্রতি কমলার সহজসংস্কারজাত আত্মনিবেদন বাঙালী নারীর সতীত্ব-আদর্শের জীবন-নিরপেক্ষ রূপ। লেখকের নিজের মনে নারীমহিমার যে ভাব-কল্পনা ছিল, হেমনলিনী তাহার প্রথম সার্থক মূর্ত বিকাশ; বাঙালীর ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার প্রথম সজীব দৃষ্টান্ত অক্ষয়। অন্য কাহারও চরিত্রবৈশিষ্ট্য তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। উপন্যাসটির যে মধুর মিলনে উপসংহার ঘটিয়াছে, তাহাতে জীবনের বাস্তব দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছনার উপর কবিমনের পেলব স্পর্শ অনুভব করা যায়। লেখক জীবনে অদৃষ্টের ফাঁস লইয়া খেলা করিয়াছেন; যদৃচ্ছাক্রমে ইহার বাঁধন শিথিল করিয়া দিয়া ইহাকে শ্বাসরোধকারী পরিণাম হইতে বাঁচাইয়াছেন; কমলাকে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত নলিনাক্ষের চরণে উপহার দিয়া, রমেশ ও হেমনলিনীর পূর্বতন প্রেমকে সার্থক হইবার সুযোগ দিয়াছেন। উপন্যাসের রূপকথায় পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

নৌকাডুবি

'গোরা' (১৯০৯) উপন্যাসে মহাকাব্যের স্বরূপ ও বিরাট পটভূমিকার প্রভাব লক্ষণীয়। স্বাজাত্যবোধ ও ধর্মবিরোধের প্রথম তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তখন বাঙালী-জীবন আন্দোলিত ও উহার ব্যক্তিত্বের অভিনব স্ফুরণ। গোরা একদিকে মুক্তিকামী ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসুক ভারতীয় আত্মার প্রতীক, সমস্ত প্রতিবেশ-প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত যুগযুগান্তের সাধনার মূর্তরূপ। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয়ের নীচে তাহার ব্যক্তিগত-অনুভবশীল, প্রেম ও বন্ধুত্বের প্রতি উন্মুখ আর একটি সত্তাও বর্তমান। এই দুই সত্তার মধ্যে বিরোধই উপন্যাসের কলেবর ও অন্তরলোককে গঠিত করিয়াছে। তাহার হিন্দুত্বের অভিমান, তাহার সুচরিতার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও বিনয়ের প্রতি আবাল্য বন্ধুত্বকে প্রতিহত করিয়াছে। কিন্তু যখন তাহার সর্বাপেক্ষা দৃঢ়মূল সংস্কার অমূল তরুর ন্যায় ধূলিসাৎ হইয়াছে, তখনই তাহার ব্যক্তিসত্তা সহজ হৃদয়াবেগের স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত রসধারায় স্নাত হইয়া পরিপূর্ণ আত্মপরিচয়ে বিকশিত হইয়াছে। আনন্দময়ীর

গোরা

জীবন এই ঘরে-বাইরের নীরব দ্বন্দ্বে চির-কুণ্ঠিত; গোরাকে কোলে লইয়া তিনি বাঙালী ঘরের মুগ্ধা জননী হইতে বিশ্বের অন্তরালবর্তিনী জগন্মাতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। এই রূপান্তরের ফলে তিনি পারিবারিক জীবনের মর্যাদা হারাইয়া, শতধারে উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহের অজস্রতাকে অন্তর-তলে নিরুদ্ধ করিয়া, নিজেকে কেবল নিষ্ক্রিয় সমবেদনা ও নির্লিপ্ত হিতৈষণায় আবদ্ধ রাখিয়াছেন। হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারে তাঁহার অসাধারণ স্বচ্ছ ও উদার অনুভূতির কোন কার্যকারিতা নাই; তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু আদেশ করিবার অধিকার হারাইয়াছেন। স্বামী-পুত্রের সমস্ত ব্যাপারে তিনি উদাসীন দর্শক। শেষ পর্যন্ত যখন গোরার ভুল ভাঙিয়াছে, তখনই তিনি বিনয়কে আমন্ত্রণ করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় লক্ষকোটি সন্তানের সুখে-দুঃখে উদাসীন, নিজ শক্তিহীনতায় মর্মপীড়িত, বিস্রস্তাঞ্চল বসুন্ধরার যে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারই মুখের আদল যেন আনন্দময়ীতে দেখা যায়।

পরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সাধক গৃহী; তাঁহার পরিবার-জীবনের ব্যর্থ, বেদনাময় অভিজ্ঞতা তাঁহার ধর্মজীবনকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর করিয়াছে। তিনি যতই বহির্জীবনে ব্যাহত হন, ততই অন্তরলোকে আপনাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত সমস্ত ধার্মিকই—তাঁহার গোবিন্দমাণিক্য ও পরেশবাবু—অন্তর্মুখিতার সাধক। তাঁহার হারাণ ও বরদাসুন্দরী একদিকে,

অপরদিকে হরিমোহিনী সঙ্কীর্ণ ও অতিশক্তিশালী ধর্মান্ধতার প্রতিমূর্তি—ধর্মের আত্মকেন্দ্রিকতা ও আঘাতশীলতার বাহন। সুচরিতা ও ললিতায় নবযুগের নারীর তেজস্বিতা, সুকুমার অন্তরানুভূতি ও দৃঢ় আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মসংযম রূপ পাইয়াছে। পরবর্তী উপন্যাসে নারীত্বের এই দিকটাই নানা অবস্থাসঙ্কটের মধ্যে আরও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। বিনয় ও মহিম সাধারণ বাঙালীর দুইপ্রকার মানসপ্রবণতার প্রতিনিধি—তাহাদের সত্তা নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ক্রিয়াশীল। 'গোরা'-তে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মত একটা সমগ্র সমাজের, দেশব্যাপী নানা ভাব-আন্দোলনের ব্যাপক চিত্র আঁকিয়াছেন। চরিত্রগুলি এই উন্মথিত জীবন-প্রতিবেশ হইতেই তাহাদের ব্যক্তিসত্তার পুষ্টির জন্য রস আহরণ করিয়াছে। ব্যক্তিজীবনের সহিত বৃহত্তর রাজনীতি ও ধর্মাদর্শের এমন নিবিড়, সুসমঞ্জস মিলন, ব্যক্তিমানসের শাখা-প্রশাখায় সমস্ত সমাজদেহে প্রবাহিত প্রাণধারার এরূপ স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের দৃষ্টান্ত 'গোরা'র পর বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গোরা উপন্যাস দেশের ভাব-আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি

(৬)

'গোরা'র পর বাঙালী জীবনের কেন্দ্রচ্যুতি ও পরিধিসঙ্কোচের ধারা অনুসরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত উপন্যাস রচনা করিলেন, তাহাদের মধ্যে সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবির পরিবর্তে আমরা খণ্ডচিত্র ও আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাই। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯১০), 'দুইবোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসগুলি এক নূতন রীতি, শিল্পকৌশল ও জীবন-সমীক্ষা-অবলম্বনে লিখিত। লেখক এগুলিতে এক-একটি স্বল্পপরিধি, অথচ উত্তেজনাময় ও সংঘাত-তাড়িত প্রতিবেশে কয়েকটি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা তীক্ষ্ণব্যঞ্জনাপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও শাণিত—সর্বদা যেন সঙীন উঁচাইয়া শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণে উন্মুখ। তাঁহার কাহিনী-বিন্যাস ধারাবাহিক নহে, কয়েকটি সুনির্বাচিত বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি; ইহাদের মধ্যে ফাঁকগুলি লেখক প্রত্যক্ষ বর্ণনার পরিবর্তে পরোক্ষ উল্লেখে ও আভাস-ইঙ্গিতে পূরণ করিয়াছেন। চরিত্রগুলির বেশির ভাগই সমাজনিরপেক্ষ, অত্যুগ্রব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাধারণ জীবন-

পরবর্তী উপন্যাস-গুলির বৈশিষ্ট্য

যাত্রার সহিত সংযোগহীন; তাহাদের মুখে চরিত্র ও অবস্থানুযায়ী সংলাপের পরিবর্তে epigram-কণ্টকিত তির্যক ভাষণ। কোন কোন চরিত্রে স্বকুমার কাব্যানুভূতি প্রধানরূপে বর্তমান থাকিলেও মোটের উপর চরিত্র-পরিকল্পনায় ও জীবন-বিশ্লেষণে মনন-প্রাধান্য। মনে হয় যে, বাঙালীর জীবনে যে ছন্দপরিবর্তন ঘটিতেছিল, আধুনিক কবিতায় যে শুষ্ক, আবেগহীন বুদ্ধিবাদ তাহার অভ্যস্ত ভাবালুতার ব্যঙ্গাত্মক অস্বীকৃতিতে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই পূর্বসূচনা রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের উপন্যাসে মিলে। আরও মনে হয় যে, জীবনের স্থির, নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণ অপেক্ষা কবির স্বতঃ অনুভব ও সমালোচকের উদ্দেশ্যপরতন্ত্র, সচেষ্ট উপস্থাপনার উপরই তিনি প্রাধানতঃ নির্ভর করিতেছেন।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মত্ত উত্তেজনার, সাময়িক ফললাভের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহে সনাতন নীতির বিপর্যয়ের, পটভূমিকায় একটি দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। নিখিলেশ আদর্শবাদী, স্বামী ও স্ত্রীর স্বাধীন নির্বাচনে আস্থাশীল ও নিজের দাম্পত্যজীবনে তাহার পরীক্ষায় উৎসুক। সন্দীপ তাহার রাজনৈতিক কর্মপন্থায় ও ব্যক্তিগত কামনার পূরণে সম্পূর্ণ নৈরাজ্যবাদী—তাহার আত্মসম্প্রসারণ কোন কল্যাণ-নীতির নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করে না। মাস্টারমহাশয় ও অমূল্য পার্শ্ব-চরিত্র; একজন আদর্শবাদের কক্ষপথে আবর্তনশীল নিখিল-গ্রহের উপগ্রহমাত্র; আর একজন বিমলার বিকার-তপ্ত উদ্‌ভ্রান্তির স্নিগ্ধ শান্তি-প্রলেপ। ইহাদের মধ্যে বিমলাই সম্পূর্ণ জীবন্ত সৃষ্টি, সে কোন মতবাদের প্রতীক নহে। তাহার রক্তাক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব, মোহাচ্ছন্নতা ও সুস্থ দৃষ্টিলাভ উপন্যাসের প্রধান সমস্যা। সন্দীপও মতবাদের গ্রাস হইতে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কিয়ৎপরিমাণে উদ্ধার করিয়াছে। সে বিপ্লবী নহে, প্রচণ্ডভাবে আত্মকেন্দ্রিক; তাহার বিপ্লবের সহিত যোগ তাহার উৎকট আত্মপ্রীতির চরিতার্থতার ছদ্ম উপায়মাত্র বলিয়াই মনে হয়। যে তত্ত্বপরীক্ষা উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যরূপে ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা কিন্তু অসংবরণীয় হৃদয়াবেগের দ্বারা অভিভূত হইয়া গৌণ হইয়া গিয়াছে। বিমলা ও নিখিল কাহারও এই পরীক্ষার উপযোগী নিরাসক্ত মনোভাব ছিল না। পরীক্ষা-চক্রের প্রথম আবর্তনই বঞ্চিত হৃদয়ের হাহাকারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উপন্যাসটিতে বাংলার সন্ত্রাসবাদের ও এই আন্দোলনের নাগপাশে জড়িত কয়েকটি ব্যথাদীর্ণ ব্যক্তি-হৃদয়ের, মননশীলতায় তীক্ষ্ণ ও আবেগবাষ্পে আবিল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

ঘরে বাইরে

'চার অধ্যায়'-এও এই বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'-র

সন্দীপের ন্যায় 'চার অধ্যায়'-এর এলা বিকারগ্রস্ত বিপ্লবী সমাজের মোহতিলক-চর্চিত হইয়া দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানেও প্রেমের সঙ্গে বিপ্লববাদের সংঘর্ষ। প্রেমই নর-নারীর সুস্থ বিকাশের প্রেরণা, সন্ত্রাসবাদ তাহাদের ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করিয়া তাহাদের যন্ত্রে পরিণত করে, ইহাই লেখকের অভিমত। এই মতবাদের সর্বজনগ্রাহ্যতা বিচারের বিষয় নহে; ইহাকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসে যে বেদনাময় পরিস্থিতি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই ইহার ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ। লেখক সর্বপ্রকার মোহের সহিত দেশপ্রেমের মোহ ও তজ্জনিত কৃত্রিম আদর্শবাদের ভাবস্ফীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনাকে আমল দেন নাই, সেইজন্য সন্ত্রাসবাদের নীতি ও কর্মপন্থা তিনি কখনই পুরোপুরি অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

চার-অধ্যায়

'চতুরঙ্গ'-ও মতবাদ-প্রভাবিত উপন্যাস। এখানে শচীশের মানস বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য তাহার নাস্তিক, অথচ মানবমহিমায় বিশ্বাসী জ্যাঠামহাশয়ের জীবনাদর্শ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বতন উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদের ন্যায় এখানে গুরুবাদের বিভ্রান্তিকর প্রভাব দামিনীর চরিত্রে উদাহৃত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাসের মধ্যে যে দুর্বোধ্য ও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল, মুহূর্তে মুহূর্তে আলো-ছায়ার লুকোচুরি-খেলায় রহস্যময় সম্পর্ক-জটিলতা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মাঝে মধ্যে গভীর অর্থপূর্ণ মন্তব্য থাকিলেও, মোটের উপর একটি ক্রমান্বয়হীন, খেয়ালী কল্পনার যদৃচ্ছবিচরণের দ্বারা সৃষ্ট আবহাওয়া আমাদিগকে যতখানি মুগ্ধ করে, তাহার অপেক্ষা বেশি বিড়ম্বিত করে। কবির বিশেষ অধিকার উপন্যাসক্ষেত্রে যে সর্বদা প্রযোজ্য হয় না, উপন্যাসটি তাহারই নিদর্শন। মনে হয়, যেন রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের বাস্তব-উপাদান-গঠিত ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলিত অবয়ব-বিন্যাস ও আলোচনারীতির উপর ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন।

চতুরঙ্গ

'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' উপন্যাসদ্বয়ের তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক বাস্তববোধ ও ধ্যানতন্ময় আদর্শানুভূতির এক খেয়ালখুশি-মাফিক, বিসদৃশ সম্মিলন ঘটিয়াছে। অমিট্ রে ও কেটি মিত্রের সমাজ ও চরিত্র-চিত্রণে লেখক তাঁহার অসাধারণ শ্লেষদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন; প্রতিটি উক্তি যেন শাণিত তীরের ন্যায় অভ্রান্ত লক্ষ্যে ইঙ্গ-বঙ্গসমাজের কৃত্রিম অনুকরণপ্রবণতা ও আন্তরিকতাহীন আদবকায়দা-চালের মর্মমূল বিদ্ধ ও ইহাদিগকে উপহাসের চরম লাঞ্ছনায় নাস্তানাবুদ করিয়াছে। ইহারই পাশাপাশি লাবণ্য-চরিত্র ও লাবণ্য ও অমিতের পরস্পরের সম্পর্ক

প্রেমের পেলব অনুভূতি ও আদর্শ-কল্পনার অপার্থিব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ কাব্যসৌন্দর্যের রাজ্যে লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চটুল, ফ্যাশান-কিঙ্করী কেটি মিত্রেরও অদ্ভুত ও আকস্মিক রূপান্তর ঘটিয়াছে, সে অমিতকে হারাইবার ভয়ে একনিষ্ঠ প্রণয়িনীতে পরিবর্তিত হইয়াছে। উপন্যাসের শেষ পরিণতি সম্পূর্ণরূপে কাব্যলোকের নিয়মানুবর্তী হইয়াছে। অমিত ও লাবণ্য স্বল্পকালের জন্য প্রেমাকাশে দুইটি রঙীন মেঘের ন্যায় বিচরণ করিয়া হঠাৎ অনুভব করিয়াছে যে, প্রেমলোক হইতে ধরণীর ধূলায় তাহাদের অবতরণ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তাহাদের কল্পলোক-বিহারী প্রেমকে ধূলিস্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহারা কবিতার মাধ্যমে পরস্পরের নিকট বিদায়-লিপি পাঠাইয়াছে। উপন্যাসে যাহার একেবারে আবির্ভাব হয় নাই ও যাহার সামান্যমাত্র উল্লেখ আছে, সেই শোভনলাল ও কেটি উহার নায়ক-নায়িকার অদৃষ্ট নিরূপণ করিয়াছে। লেখক যেন উপন্যাসের ভূমিকায় কাব্যের উপসংহার জুড়িয়া দিয়াছেন, উপন্যাসের সমতলভূমিতে কাব্যপ্লাবন বহাইয়া দিয়া উহার উঁচু-নীচুর ছোটখাট পার্থক্য, উহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঈষৎ-স্ফুট ইঙ্গিতগুলি সেই প্লাবনের নীচে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহার শেষ কথাটি বলিবার জন্য কবিতার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার ভিতরে কাব্যের টান যে কত প্রবল ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শেষের কবিতা

'যোগাযোগ'-এ একদিকে মধুসূদনের প্রখর ও সর্বগ্রাসী ব্যক্তিস্বাভিমান, অপর দিকে কুমুদিনীর ধ্যানে একাগ্র, সুকুমার অনুভূতির স্বপ্নসীমা-সংরক্ষিত বাস্তব-বিমুখতা; উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ যেন বায়ুর উপর লৌহমুষ্টির আঘাত। এই বিপরীত কোটিতে আসীন দম্পতির চারিদিকে যে মানবিক প্রতিবেশ রচিত হইয়াছে, তাহা যতই প্রাণোচ্ছল হউক না কেন, নায়ক-নায়িকার উপর কোন প্রভাব-বিস্তারে অসমর্থ। এই প্রতিবেশ উহাদের মধ্যে অনতিক্রমণীয় ব্যবধানকে পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু কোন সংযোগ-সেতু রচনা করে নাই। তথাপি মধুসূদন কুমুদিনীর চিত্ত জয় করিবার জন্য পর্যায়ক্রমে যে জোরজবরদস্তি ও আদর-আপ্যায়ন-নতিস্বীকারের নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া যথার্থ ও ঔপন্যাসিক রীতির অনুসারী। কুমুদিনীর মনে এই দ্বৈধনীতির বিহ্বল প্রতিক্রিয়াও মনস্তত্ত্বসম্মত। শ্যামার প্রতি প্রণয়িনীর মর্যাদার ক্ষণিক আরোপ মধুসূদনের আহত আত্মাভিমান-ব্যাধির উৎকট চিকিৎসা; উহা মধুসূদনের চরিত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। নবীন ও

যোগাযোগ

মতির মার উপন্যাসে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই—তাহারা কেবল মধুসূদনের আকাশচুম্বী শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মাপিবার গজ-ফিতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসাবলীর মধ্যে এই উপন্যাসটি সর্বাপেক্ষা বেশি ঔপন্যাসিক লক্ষণসম্পন্ন—ইহার ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনাবিন্যাস অনেকটা ঔপন্যাসিক-আদর্শ-প্রভাবিত। দুঃখের বিষয়, লেখক ইহাকে তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ও শেষের দিকে কিছু অবান্তর প্রসঙ্গ ও অনির্দিষ্ট পরিণতির সংশয় সংযোজনা করিয়া উহার উৎকর্ষ কতকটা খর্ব করিয়াছেন। তিনি সুনিপুণভাবে জাল ফেলিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত সূত্র সংগ্রহ করিয়া জাল টানিয়া তুলিবার ধৈর্য তাঁহার ছিল না।

'দুইবোন,' 'মালঞ্চ' প্রভৃতি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ যেন কতকটা অবহেলার সহিতই লিখিয়াছিলেন; তাঁহার পূর্ণ শক্তির প্রয়োগ ইহাদের মধ্যে নাই।

মালঞ্চ ও দুই বোন

'দুই নারী'-তত্ত্ব কবি-কল্পনায় অনুভব-বেদ্য, উপন্যাসের সম্প্রসারণে এই তত্ত্বের যথাযোগ্য রূপায়ণ হয় নাই। 'মালঞ্চ'-এর পিছনে কোন বৃহৎ জীবনবোধ নাই, আছে একটি ক্ষুদ্র ও তাৎপর্যহীন মনোবিকারের সংক্ষিপ্ত কল্পনা; রবীন্দ্র-প্রতিভা—মহাদেশের আশে-পাশে ছড়ানো দুই-একটা স্বল্পায়তন দ্বীপের ন্যায় ইহারা মহাদেশের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্তও নহে, উহার পরিধি-বিস্তারেও সহায়তা করে নাই।

(৭)

ছোটগল্প

উপন্যাস-রচনায় রবীন্দ্রনাথের উভচরত্বের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। তিনি পায়ে হাঁটিয়া, তথ্য-পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দিয়া যাহার আরম্ভ করিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরে কবি-কল্পনার পুষ্পক-রথে উধাও হইয়া সুদূর আকাশ হইতে তাহার পরিণতি-ক্রমের ইঙ্গিত দিয়াছেন। কোন একটি কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে তিনি কখন যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের হাতিয়ার পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ মন্ত্রপূত দিব্য ধনু ধারণ করিবেন, তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা দুঃসাধ্য। তাঁহার উপন্যাসে কোথাও মাটির রসের উচ্ছলতা, কোথাও বা আকাশ-নীলিমার জ্যোতির্ময়

উজ্জ্বলতা; কিন্তু এই আকাশ ও মৃত্তিকার যৌগিক সমন্বয় সাধিত হয় নাই। সেইজন্য মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিজ একক স্বাতন্ত্র্যে উপন্যাসের ক্রম-বিকাশধারার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' ও সম্ভবত 'যোগাযোগ' ছাড়া আর কোনও উপন্যাসে কোন বৃহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবন-সত্য, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণের অনিবার্য পরিণতিরূপে দেখানো হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের রচনারীতি শিথিল ও আকস্মিক

এই উপন্যাসগুলিতেও বাস্তব জীবনচর্যার মধ্যে কাব্যলোকের সূক্ষ্মতর ঔচিত্যবোধ ও ভাবসঙ্গতি মাঝে মধ্যে আরোপিত হইয়াছে। গঠনের শিথিলতা ও ভাব-পরিবর্তনের আকস্মিকতাও প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের আঙ্গিক সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না; উপন্যাসের গ্রন্থিচ্ছেদনের জন্য তিনি কেবলমাত্র কার্যকারণের মন্থর গতি ও অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যের উপর নির্ভরশীল না হইয়া তাঁহার কল্পনানুভূতির সহায়তাও অকৃপণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস তাঁহার বাম হস্তের লেখা—এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যে তাঁহার সমগ্র মনের প্রকাশ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-রচনা পরীক্ষা-মূলকভাবে ১৮৮৪-১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ আরম্ভ হইলেও, ইহার আসল সৃষ্টি-যুগের ব্যাপ্তি ১৮৯১ হইতে ১৯১৭-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই যুগের পর পূর্ণ আট বৎসরব্যাপী এক দীর্ঘ বিরতি ঘটে। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে গল্প লেখার ছিন্নসূত্র পুনর্যোজিত হইয়া নানা ফাঁসের মধ্য দিয়া ১৯৪০ পর্যন্ত তাহার জের টানিয়া চলে।

ছোটগল্পের রচনাসীমা

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ছোটগল্পের বিলম্বিত আবির্ভাব এইটুকু প্রমাণ করে যে, এই নূতন ধরনের শিল্পরূপ উদ্ভাবন করিতে রবীন্দ্রনাথকে পল্লীজীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ও উহার বিচিত্র রস-আস্বাদনের অনুকূল অবসরের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। কবির কাব্যকল্পনা যে উৎস হইতে উদ্ভূত, তাঁহার ছোটগল্প ঠিক সেই উৎস হইতে জন্মিবার প্রেরণা পায় নাই। তাঁহার কাব্যানুভূতি, নিবিড় প্রকৃতিপ্রীতি, ব্যঞ্জনাধর্মী জীবন-চিত্রণ, আভাস-ইঙ্গিতের মাধ্যমে অপূর্ব জীবনরসের প্রকাশ প্রভৃতি কবিসুলভ গুণগুলি তাঁহার ছোটগল্পের মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও ইহার অব্যবহিত উপলক্ষ আসিয়াছে বাংলার গ্রাম্যজীবনে ছায়ারৌদ্রের খেলার চকিত উপলব্ধি হইতে। ছন্দরচিত কল্পনার আধারে যে কাব্যানুভূতি

ছোটগল্পের মূল প্রেরণা পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতা

'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'-য় অতীন্দ্রিয় রহস্য ও প্রণয়াবেগের অধীর আকুলতার সন্ধান দিয়াছে, তাহাই পল্লীপরিবেশে বাস্তবজীবনের মৃৎপাত্রটিকে অনির্বচনীয় অমৃতরসে পূর্ণ করিয়াছে। মৃত্তিকার প্রাণরস ও কবিকল্পনার ঊর্ধ্বগামী চেতনা এই ছোটগল্পগুলিতে এক অপূর্ব সমন্বয়ে সংমিশ্রিত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যখন ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি-পরিদর্শনের ভার লইয়া উত্তরবঙ্গে গিয়াছেন ও পদ্মার চিরপ্রবহমান স্রোতোধারার সহিত নিজ মানবিক অনুভূতির ধারাকে মিশাইয়াছেন, ঠিক সেই বৎসর হইতেই তাঁহার ছোটগল্পের সৃষ্টিকার্য পূর্ণবেগে উৎসারিত হইয়াছে। তিনি পল্লীজীবনকে যে খুব কাছাকাছি হইতে দেখেন নাই, ইহার ছোটখাট ক্ষুদ্রতা ও মোহান্ধ সংস্কারকে তাঁহার অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, ইহাই তাঁহার ছোটগল্পের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। তিনি কল্পনার অন্তরাল হইতে, কবিদৃষ্টির রোমান্টিক অনুরঞ্জনের মাধ্যমে, পল্লবঘন প্রগাঢ় শান্তির পটভূমিকায়, নদীর অন্তহীন বিস্তার ও অসীমের অভিমুখী প্রাণচাঞ্চল্যের সহিত মিশাইয়া এই সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার নিগূঢ় সত্তাটিকে অনুভব করিয়াছেন ও ইহার তুচ্ছ বস্তু-পরিবেশের অন্তর্নিহিত জীবনরসটি তাঁহার সুমিত কারুকার্যখচিত ছোটগল্পের পেয়ালায় আমাদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন।

জীবনের অফুরন্ত বৈচিত্র্য এই ছোট পাত্রটিকে কানায় কানায় রসোচ্ছল করিয়াছে। কিছু গল্প পল্লীজীবনের জীবনযাত্রার সাধারণ রূপ ও পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা ও অসাধারণত্ব অবলম্বনে রচিত। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'শাস্তি', 'দিদি', 'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা', 'দান-প্রতিদান' প্রভৃতি গল্পগুলি এইজাতীয়। বাঙালী পরিবারের বিশিষ্ট গঠন, পরিবারস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা, বংশগৌরব, জ্ঞাতিত্ব, প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্দ্য-মনোমালিন্য ইহাদের উপজীব্য। এগুলিতে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ ও পরিবারের প্রভাবই বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই জীবনযাত্রার মধ্যে নানা কৌতুককর ও করুণ অসঙ্গতি, নানা অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের সহিত সংস্কার সংঘর্ষের বিবিধ রূপ অসাধারণ রসের সৃষ্টি করিয়াছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন,' 'সম্পত্তি-সমর্পণ', 'স্বর্ণমৃগ', 'গুপ্তধন', 'ঠাকুরদাদা', 'হালদার-গোষ্ঠী' প্রভৃতি গল্পগুলিতে পল্লীজীবনের খেয়ালী, ব্যতিক্রমমূলক উপজাত ভাবের (by-product) দিকটা উদাহৃত হইয়াছে। রাইচরণ তাহার নিজের ছেলেকে প্রভুর মৃতপুত্রের পুনর্জন্মের

ছোটগল্পের অফুরন্ত বিষয়বৈচিত্র্য

প্রতীক বলিয়া বিশ্বাস করে; গুপ্তধনের আকাঙ্ক্ষা ও অনুসন্ধান বাঙালীর অলৌকিক বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন অস্থিমজ্জাগত সংস্কার, বংশগৌরবের বড়াই শুধু বাংলা দেশে নয়, অভিজাততন্ত্র-শাসিত পৃথিবীর বহু দেশেই বর্তমান, কিন্তু বাংলার ধ্বংসোন্মুখ জমিদার-গোষ্ঠীর মধ্যে ইহার করুণ অথচ নির্দোষ আত্ম-বঞ্চনার দিকটি বিশেষভাবে দেখা যায়; বংশের সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ, বংশানুক্রমিক জীবননীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিদ্রোহ রক্ষণশীল বাংলা-সমাজেই মর্মান্তিক রূপ ধারণ করে। সমাজব্যবস্থার ফাটল হইতে নিঃসৃত এই রসধারা নাগরিক রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ধরা পড়িয়াছিল; ইহাতে তাঁহার প্রাচীন সমাজের মর্মের সহিত কত অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, তাহারই নিদর্শন মিলে।

বিচিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা

'মানভঞ্জন' ও 'প্রতিহিংসা' এই দুইটি গল্পে একটি নাগরিক ও অপরটি গ্রাম্য পরিবেশে, অবস্থার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই লেখকের প্রধান লক্ষ্য। গিরিবালার উপেক্ষিত রূপ-যৌবন-প্রণয়তৃষা তাহার সুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধের প্রখর জাগরণ ঘটাইয়া তাহাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছে ও এই উপায়ে সে ঘরের স্ত্রীকে ফেলিয়া রঙ্গালয়ের নটীর প্রতি মোহগ্রস্ত স্বামীর উপর এক নিগূঢ় প্রতিশোধ লইয়াছে। ইন্দ্রাণীও তাহার সমস্ত অলঙ্কার মনিবের দুর্দিনে দান করিয়া অহঙ্কৃতা মনিবপত্নী জমিদার-গৃহিণীর অপমানের উপযুক্ত জবাব দিয়াছে। শমীগর্ভস্থ অগ্নির ন্যায় জমিদার ও তাহার কর্মচারীর মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত আনুগত্য-মসৃণ, নির্বিচার আজ্ঞানুবর্তিতার শ্যাওলা-পড়া সম্পর্কে প্রখর আত্মসম্মানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছে—অথচ এই আগুন দাহ করে নাই, উজ্জ্বল করিয়াছে মাত্র। এরূপ অহঙ্কৃত বশ্যতা, এরূপ উদ্ধত প্রভুভক্তি, এরূপ জয়শ্রীদৃপ্ত পরাভব-স্বীকার জমিদারী প্রথারই একটা বিরল পরিণতি। যে পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্বকে অঙ্কুরেই দলিত করা হয়, সেখানে ব্যক্তিত্বের কি নীরব, অন্তর্গূঢ়, মহিমান্বিত প্রকাশ।

কাব্যানুভূতি ও মনস্তত্ত্বের সমন্বয়

কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পে কাব্যানুভূতির সহিত মনস্তত্ত্বজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। এইগুলিতে মনস্তত্ত্ব-কোবিদের জীবন-পর্যবেক্ষণের সহিত কবির সূক্ষ্মতর ভাবসত্য-ব্যঞ্জনা এক অদ্বয় সত্তায় মিলিত হইয়াছে। 'মধ্যবর্তিনী', 'সমাপ্তি', 'অতিথি,' 'দৃষ্টিদান' এই শ্রেণীর গল্প। নিবারণ, হরসুন্দরী, শৈলবালা—এই মধ্যবিত্ত ও স্থূলরুচি পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, প্রৌঢ় গৃহিণী হরসুন্দরীর আত্মত্যাগের

উদারতার মধ্যে সপত্নীসুলভ ঈর্ষ্যার আকস্মিক স্ফুরণ, শৈলবালার অপরিমিত সোহাগের দাবি ও নিবারণের অতি-বিলম্বে উচ্ছ্বসিত প্রেমমুগ্ধতা—যে কোন তথ্যনিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের চোখে পড়িত; কিন্তু অকালমৃতা শৈলবালার স্মৃতি যে পুনর্মিলিত প্রৌঢ় দম্পতির মধ্যে এক চিরন্তন ব্যবধান-বোধের ন্যায় জাগিয়া রহিল, ইহাই কবির মর্মজ্ঞ চেতনার আবিষ্কার। 'সমাপ্তি'তে মৃন্ময়ীর অর্ধস্ফুট প্রেমানুভূতি যে বিরহের বেদনায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, বন্য, দুরন্ত, খেলাধূলায় মত্ত গ্রাম্য বালিকা যে প্রণয়রহস্য-দীক্ষিত পরিণত নারীপ্রকৃতিতে বিকশিত হইয়াছে, এই চিত্তস্ফুরণের ইতিহাসটির মালমসলা সাধারণ জীবন হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহার শেষ অধ্যায়টি কবিচেতনা-প্রসূত। 'অতিথি' গল্পে তারাপদ প্রকৃতির উদার, নিরাসক্ত প্রাণচঞ্চলতার প্রতীক—এই তাপস-শিশুকে গার্হস্থ্য জীবনে বাঁধিবার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়া একদিন সে তাহার রক্তকণিকা-বাহিত এই প্রাকৃতিক জীবনাবেগের আহ্বানে জোয়ার-স্ফীত দুর্বার নদীর ন্যায়, রথযাত্রার গতিবেগ-চঞ্চল জগতের ন্যায়, এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় উধাও হইয়াছে। তাহার মানবিক জীবনের বর্ণনা জীবন-রসিক ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি; তাহার চরিত্রের মধ্যে প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাব, তাহার সাংসারিক মায়া-মমতার মধ্যে উদাস পথিকমনের ইঙ্গিত কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। 'দৃষ্টিদান' গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের এক সহজ-অনুভূতি-লব্ধ, দিব্যচেতনাত্মক সূক্ষ্ম ভাবরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; অন্ধ নারীর মধ্যে অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই প্রদীপ জ্বলাই গল্পের আসল ফলশ্রুতি—ইহার সুবিন্যস্ত আখ্যান-অংশ এই প্রদীপ জ্বালাইবার সমিধ-সংগ্রহ। ঔপন্যাসিকের বস্তু-সংযোজনা হইতে কবি ভাব-রস নিষ্কাশন করিয়াছেন। এই পর্যায়ের গল্পসমূহ বাংলা সাহিত্যে নহে, পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের সহিত তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

আর কয়েকটি গল্পে কবি ও ঔপন্যাসিকের এই দুর্লভ ঐকান্তিক মিলন টুটিয়া গিয়া কবিরই একাধিপত্য প্রকটিত হইয়াছে। এগুলিতে মায়াবরণের অন্তরালে ব্রহ্মানুভূতির ন্যায়, উপন্যাসের উদ্যোগ-আয়োজন ও তথ্য-বিন্যাসের পিছনে একটি শাশ্বত ভাবসত্যের একক বিন্দু স্থির হইয়া আছে। 'পোস্টমাস্টার', গল্পের আধারে, অক্ষিসঞ্চিত অশ্রুবিন্দুর ন্যায় একটি বেদনামথিত অস্বীকৃত হৃদয়াবেগের নিশ্বাস; 'কাবুলি-ওয়ালা'-য়ও অবস্থা-বৈচিত্র্যের মধ্যে এক শাশ্বত অপত্যস্নেহের সর্ব-অসমতা-নাশী বৃত্তির বিকাশ; পোস্টমাস্টার, রতন, কাবুলিওয়ালা, মিনি—সবই এক আলোক-

কাব্যরস ও উপন্যাস-বস্তুর মিলনে কাব্য-প্রাধান্য

বিন্দুর বিচিত্ররূপী ছায়াদেহ। 'একরাত্রি'—গল্পের অন্তরশায়ী গীতিমূর্ছনা; 'শুভা' ও 'মহামায়া' প্রকৃতির অন্তর-সত্তার মানবিক নাম ও পরিচয়-সংবলিত দীপ্তি-বিচ্ছুরণ; শুভা মূক, মৌন প্রকৃতির মানবিক রূপ, মহামায়া ইহার মেঘমন্দ্রিত, বিদ্যুৎ-বিলসিত, ম্লান জ্যোৎস্নার রহস্যমণ্ডিত, শ্রাবণ-নিশীথের দুর্নিরীক্ষ্য মহিমা। প্রকৃতির সঙ্গে মানব-জীবনের একক সংযোগ-বিন্দু ইহাদের মধ্যে ব্যঞ্জিত। 'মেঘ ও রৌদ্র'-এর কাহিনী-বিস্তারের মধ্যে একটিমাত্র বঞ্চিত হৃদয়ের করুণ বেদনা গীতি-কবিতার সুরে উচ্ছ্বসিত। 'দুরাশা' গল্পে এক সংস্কার-বিড়ম্বিত, মিলন-বুভুক্ষু মানবাত্মার ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনা-নিবিড়, পরিহাস-মর্মান্তিক কাহিনী রূপ পাইয়াছে। কিন্তু ইহার উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাস কাহিনীর তটভূমি ছাপাইয়া একক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বদায়ুনের নবাব-পুত্রী, রাজপুত সৈনিক কেশরলাল ও গল্পের শ্রোতা লেখক সবই এই আবেগ-তরঙ্গ-তাড়িত বুদ্‌বুদমাত্র; গল্প শেষ হইলে আমরা নদীর কথাই ভাবি, বুদ্‌বুদসমূহ নদীপ্রবাহের অগ্রগতির সঙ্গে বিস্মৃতির তলে মিলাইয়া যায়। এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ গীতিকবি; ঘটনা ও চরিত্র, ঔপন্যাসিক বস্তুবিন্যাস ও নরনারী-রূপায়ণ এই সুর ফুটাইবার অবলম্বন, কাব্য-নির্যাসের প্রস্তুতি ও আধারমাত্র। কথাবস্তু এখানে কাব্যরস-উৎসারণের নানাবিধ ছন্দের মধ্যে অন্যতম ছন্দ।

প্রকৃতির প্রাণলীলা যে সমস্ত নর-নারীর মধ্যে আংশিকভাবেও ছন্দায়িত হইয়াছে, তাহারা প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃতের সীমান্তপ্রদেশে অধিষ্ঠিত, কেননা, প্রকৃতির মধ্যেই অতিপ্রাকৃতের বীজ নিহিত। প্রকৃতির রহস্য-অন্তঃপুরে আর একটু গভীরভাবে প্রবেশ করিলেই অতিপ্রাকৃতের দ্বার ঐ এক চাবিতেই খুলিয়া যাইবে। শুভা, মহামায়া তাহাদের আচরণে ও জীবনস্বরূপে মানবিকতার গণ্ডী অতিক্রম না করিয়াই অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিতে রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ

অতিপ্রাকৃত রসসৃষ্টি

প্রেম ও সৌন্দর্যমোহ যখন অন্য সমস্ত বৃত্তিকে অভিভূত করিয়া মানস-বিভ্রান্তি ঘটায়, তখনই প্রেতলোকের অনুভূতি রূপ পরিগ্রহ করে। এই মানস-বিভ্রান্তি ঘটাইতে মৃত্যু-ব্যবধান-জনিত অতৃপ্ত হৃদয়াবেগ ও প্রবলবেগে আলোড়িত কল্পনা সহায়তা করে। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ অতীত যুগের বিলাস-বিভ্রম ও আত্যন্তিক রূপমোহ, এক অজ্ঞাত, রোমাঞ্চময় আশঙ্কার সূত্র অবলম্বন করিয়া, কল্পনাপ্রবণ, অবচেতন মনে প্রেমের রহস্যনিবিড় অনুভূতি-আস্বাদনে উন্মুখ, তরুণচিত্তে প্রত্যক্ষ-অভিনীত দৃশ্যবৎ প্রতিভাত হইয়াছে। ব্যাধি-জীবাণু-দুষ্ট গৃহের আবহাওয়ার ন্যায় মানবের সৌন্দর্য-পিপাসার এই বিকার-

গ্রস্ত আতিশয্য গৃহকক্ষের পাষাণভিত্তিতে অনপনেয় রেখায় মুদ্রিত হইয়াছে ও অধিবাসীর নিঃশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে এই মোহাবেশ তাহার অন্তর-সত্তায় সংক্রামিত হইয়াছে। এখানে ভৌতিক অনুভূতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে কোন অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্যে নহে, মনোবিকারের বাস্তব-বিভ্রমকারী, দৃঢ়বদ্ধ প্রতীতি-সংস্কারের মধ্য দিয়া। সুতরাং এখানে মনস্তত্ত্বের সীমারেখা লঙ্ঘিত হয় নাই। 'মণিহারা' ও 'নিশীথে' গল্প দুইটিতে গার্হস্থ্য প্রতিবেশের মধ্যে ভৌতিক রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হইয়াছে। 'মণিহারা' গল্পটির বিবক্তা (narrator) একজন তীক্ষ্ণধী, স্ত্রী ও পুরুষের মনস্তত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ও মৌলিক চিন্তাশীলতায় অতিমাত্রায় সচেতন পুরুষ। তাহার মুখে এই অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা আমাদিগকে ইহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় করে। এখানেও সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি, রূপমোহের অন্ধ নিবিড়তা যে আবেশঘন, প্রতীক্ষাস্তব্ধ প্রতিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই মধ্যে অলৌকিক আবির্ভাব প্রত্যাশিত ও কিছুটা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। দূর-শ্রুত যাত্রাগানের সুর প্রিয়া-বিরহ-কাতর মনে যে কল্পচেতনার উন্মেষ করিয়াছে, তাহাই বর্ষারজনীর অবিরল বর্ষণধারা ও ভেকের অশ্রান্ত কলরবে ঘনীভূত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়জগতের উপর এক মায়া-যবনিকা প্রক্ষেপ করিয়াছে এবং ইহারই পিছনে অশরীরী সত্তা, চেতনার যে একটিমাত্র রন্ধ্রপথ খোলা ছিল, তাহাকেই অধিকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

অতিপ্রাকৃতের মধ্যে বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ও অলৌকিক তত্ত্ব

'নিশীথে' গল্পে অচিরমৃতা প্রথমা পত্নীর প্রতি অবিচারবোধে আচ্ছন্ন চিত্ত তাহারই আর্ত, সংশয়তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাকে নিজ অবচেতন স্তরে ধরিয়া রাখিয়াছে। নবপরিণীতা দ্বিতীয়া পত্নীর সহিত প্রেমালাপের মধ্যে যে কোন স্মৃতির পিঞ্জর-দ্বার খোলার মুহূর্তে এই মগ্নচৈতন্যলীন ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়া আকাশ-বাতাসের শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে ও অনুতপ্ত স্বামীকে ডাক্তারের নিকট নিজের গোপন মনোবিকার বিবৃত করিতে অনিবার্যভাবে প্রণোদিত করিয়াছে। আবার এই ঘোর কাটিয়া গেলে বক্তা নিজ সম্ভ্রমবোধ ও সংযমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানেও বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রেতাবির্ভাব-রহস্য সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই গল্পগুলিতে লেখকের কল্পনাসমৃদ্ধ ও কবিসুলভ অন্তরঙ্গ অনুভূতি তাঁহাকে প্রেতলোকের বাতাবরণ-সৃজনে সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার 'কঙ্কাল' ও 'জীবিত ও মৃত' এই দুইটি গল্প অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা করিলেও ইহাদের মধ্যে

অলৌকিকত্বের হিমানী-শীতল স্পর্শটি নাই। প্রথমটিতে কঙ্কালে পরিণত, মৃত যুবতী নিজ অতীত জীবনের প্রণয়লালসার ইতিহাস খুব চটুল ভাষায় ও নিতান্ত অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছে; দ্বিতীয়টিতে শ্মশান-প্রত্যাগতা স্ত্রীলোক নিজে জীবিত কি মৃত স্থির করিতে না পারিয়া একপ্রকার বিমূঢ়, বাস্তবের সহিত শিথিল-সংপৃক্ত জীবন যাপন করিতেছে। ইহার মধ্যে অনিশ্চয়ের গোধূলি কোন অশরীরী উপস্থিতিতে রহস্যময় হইয়া উঠে নাই।

'সবুজপত্র'-এর যুগে লেখা গল্পগুলিতে রসসৃষ্টি অপেক্ষা সমাজ-সমালোচনার উদ্দেশ্যই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাইফোঁটা', 'পয়লা নম্বর', 'পাত্র ও পাত্রী,' 'নামঞ্জুর গল্প' প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথের উগ্র সমাজ-চেতনা তাঁহার অপক্ষপাত রসদৃষ্টিকে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়াছে। সমাজের দোষ-ত্রুটি-উদ্ঘাটন ও শ্লেষাত্মক আঘাতে উহাদের সংশোধন-প্রয়াস শিল্পিমনের যে স্তর হইতে উদ্ভূত, উহা তাহার গভীরতম চেতনার অন্তর্ভুক্ত নহে। স্রষ্টা-মন নিষ্ক্রিয় হইলে সমালোচক-মন জাগিয়া উঠে ও স্রস্টা-পরিত্যক্ত তুলি ও রঙ লইয়া একপ্রকার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যঙ্গ বা করুণ চিত্র আঁকিয়া সৃষ্টি-প্রেরণার একরূপ বিকৃত সার্থকতা অনুভব করে। বৃহত্তর উপন্যাসে হয়ত সকলরকম মনোভাব-প্রকাশের একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে। কিন্তু ছোটগল্পের পরিমিত আয়তনের পাত্রে রস-সাঙ্কর্য ঠিক শোভন মনে হয় না। লাঠি খেলিতে হইলে যে প্রশস্ত অঙ্গনের প্রয়োজন, ছোটগল্পের সুসজ্জিত কক্ষে তাহার অনুরূপ স্থান নাই—হয়ত ইহাতে সমাজমনের ভূত ছাড়িতে পারে, কিন্তু ঘরের আসবাবপত্রও কিছু কিছু ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা থাকে। ছোটগল্পে সত্য জীবন-চিত্রণের মধ্যে যে পরোক্ষ সমালোচনা ব্যঞ্জিত হয়, তাহাই যথেষ্ট। মহাভারতের যুদ্ধে যখন শ্রীকৃষ্ণকে রথচক্র হাতে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তখন তাঁহার নিরপেক্ষতার মর্যাদা নিশ্চয়ই অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। যদি ছোটগল্পের মাধ্যমে নিতান্তই সামাজিক দৃষ্টিবিকার সারাইতে হয়, তবে ইহা যেন পদ্মমধুর স্নিগ্ধ প্রলেপের অনুরূপ হয়, কোনরূপ উগ্রজ্বালাময় ভেষজের প্রক্ষেপ-জাতীয় না হয়। আমরা ইহাদের মধ্যে সব্যসাচীর শরসন্ধান-নৈপুণ্য, তাঁহার লিপিচাতুর্য উপভোগ করি, কিন্তু এই অস্ত্রক্ষেপের পিছনে মানবমনের কোন নিবিড় অনুভূতি আমাদিগকে রসাপ্লুত করে না। রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্পসংগ্রহ 'তিনসঙ্গী'-তে লেখক অদ্ভুত ধরনের চরিত্রকে অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া ও উহাদের অসম্ভব দ্রুত গতিবেগ ও পরিবর্তনশীলতার চরকিবাজির

সমাজ-আলোচনা-মূলক গল্প

সহিত তাল রাখিয়া কথার খই ফুটাইয়া আমাদিগকে যে পরিমাণে বিস্মিত করিয়াছেন, সে পরিমাণে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার আরও দুই-একটি গল্প আছে, যেগুলি ঠিক কোন পর্যায়ভুক্ত নহে। 'নষ্টনীড়' যে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি বিবৃত করিয়াছে, তাহা এত দীর্ঘসময়সাপেক্ষ ও আমূল-পরিবর্তনাত্মক যে, উহাকে ছোটগল্পের পরিধিতে ধরিয়া রাখা যায় না। উহার পরিণত শিল্পকৌশল ও ইঙ্গিতময় আলোচনা-পদ্ধতির জন্যই উহার সঙ্গে ছোটগল্পের কতকটা সাধর্ম্য আছে। কিন্তু মূলতঃ উহার সমস্যা এত গভীর ও সর্বাত্মক যে, উহা উপন্যাসেরই সহিত অধিকতর সাদৃশ্যবিশিষ্ট। কতকগুলি গল্পকে লেখক পরবর্তী কালে নাট্যরূপ দিয়া উহাদের মধ্যে নাট্যরসের প্রাধান্যকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কর্মফল' ও 'শেষের রাত্রি'—ইহাদের নাট্যরূপের নাম 'শোধবোধ' ও 'গৃহপ্রবেশ'। প্রথম গল্পটির ঘটনা-সংঘাত ও ভাগ্য-পরিবর্তন ইহার নাটকোপযোগিতারই পরিচয় বহন করে—বিশেষতঃ ইহার সংলাপ-প্রাধান্য ইহার সহিত নাটকের আত্মীয়তাকেই পরিস্ফুট করে। দ্বিতীয় গল্পে যতীনের রোগতপ্ত মনের বিকার, উহার স্ত্রীর ভালবাসায় অগাধ বিশ্বাস ও বেদনাময় রূঢ় সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে মাসীমার অপার ধৈর্য ও মিথ্যা আশ্বাস দিবার অসাধারণ উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল আমাদের সমস্ত মনকে একটি ব্যথিত করুণার রেশে পরিপূর্ণ করে। মৃত্যুপথ-যাত্রীর একটি ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, রুগ্‌ণমনের নানা অসুস্থ ও অবাস্তব কল্পনাজাল রোগকক্ষের ন্যায় সমস্ত নাটকটিকে একটি রুদ্ধ, ভারী গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; ইহার সমস্ত বস্তুরূপ যেন একটি ভাবনির্যাসের আধার। এইরূপ এককেন্দ্রিক বিষয়ের সহিত যদি কোন নাটকের সাদৃশ্য থাকে, তবে তাহা সাঙ্কেতিক নাটক। 'রাজা' নাটকে অদৃশ্য রাজার মত এখানে অন্তরালবর্তিনী মণি তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভাবে সমস্ত নাটকখানিকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

উপন্যাসধর্মী ও নাট্য-রস-প্রচ্ছন্ন গল্প

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ফর্ম বা অঙ্গবিন্যাসের দিক দিয়াও আলোচ্য। ইহার প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহার কলাকৌশলের দিক দিয়াও যেমন, বিষয় ও রসস্ফুরণের দিক দিয়াও সেইরূপ বিচিত্র। এই রচনারীতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন, তাহার অনুশীলন সম্প্রসারণের দ্বারাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারিরূপে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত

ছোটগল্পের আঙ্গিক

করিয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা এই ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যে এখনও সজীব আছে ও প্রতিভার স্বধর্ম-অনুযায়ী নব নব বিকাশের প্রেরণা যোগাইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ভবিষ্যৎ প্রভাবের দিক দিয়া অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়াছে, আমাদের আধুনিক গল্প-লেখকেরা ছোটগল্পের অর্ঘ্য সাজাইয়াই রবীন্দ্র-পূজার অধিকারী হইয়াছেন, এ দাবি নিঃসংশয়ে করা চলে।

গ—নাটক

(৮)

রবীন্দ্র-প্রতিভায় নাটক-রচনা তাঁহার কাব্যোচ্ছ্বাসের সমুদ্রের একটা স্থলানুপ্রবিষ্ট শাখানদী। এই সীমাহীন সমুদ্রকে নির্দিষ্ট-সীমাবেষ্টিত নদীতে রূপান্তরিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে জহ্নু মুনির মত তরঙ্গবিক্ষোভের খানিকটা নাকানি-চোবানি খাইতে হইয়াছে—তিনি সবসময় ইহাকে সুশৃঙ্খল বিন্যাসের মধ্যে আটকাইতে পারেন নাই। নাট্যকলা যে তাঁহার শিল্প-স্বধর্মরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ তাঁহার একই বিষয়ের উপর লেখা নাটকের মুহুর্মুহুঃ রূপ ও ভাবকেন্দ্রের পরিবর্তনে। যিনি স্বভাব-নাট্যকার তাঁহারও অবশ্য শিক্ষানবিসির যুগ আছে, কোনও বিষয়ের মূল নাট্য-তাৎপর্য হয়ত গোড়া হইতেই তাঁহার নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠে না। কিন্তু আত্মস্থতা-লাভের পর কবিতার রূপের ন্যায় নাটকের আঙ্গিক ও অন্তঃপ্রকৃতি তাঁহার নিকট চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হইয়া যায়—মূর্তি আঁকিয়া বা গড়িয়া উহাকে বারবার ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে নাট্যকার-সত্তা ছিল, সেই সর্বদাই পরীক্ষা-বিব্রত, শিল্পীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে অপ্রতিষ্ঠিত ও অনায়ত্ত রূপসুষমার অনুসন্ধানে অস্থির। এমন কি যে রূপক-নাট্য তাঁহার কবিপ্রকৃতির সাহিত সর্বাধিক একাত্ম, সেখানেও তিনি নূতন নূতন কল্পনার অঙ্কুশ-তাড়িত, নূতন ভাবকেন্দ্রে চারিদিকে আবর্তিত, নূতন ভাঙ্গা-গড়ার নেশায় রূপনির্মিতির পরিপূর্ণ সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত। তাঁহার মন্ময়তা এত প্রবল যে তিনি নাটক লিখিতে গিয়াও আত্মকেন্দ্রিকতার কক্ষাবর্তন হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই—তাঁহার নরনারী এক-একটি মূর্ত ভাববিগ্রহ, কবির বিদেহী চেতনার এক-একটি অর্ধ-পরিস্ফুট মানবিক প্রতীকে পর্যবসিত। অসম্পূর্ণ প্রয়াসের খণ্ডাংশ-বিকীর্ণ বাংলা নাটকের মন্দিরে রবীন্দ্র-

নাটকসৃষ্টিতে আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব ও মন্ময়তার প্রাচুর্য

নাথও তাঁহার প্রতিভা-দীপ্ত, কিন্তু রূপের দিক দিয়া অসমাপ্ত খণ্ডমূর্তিগুলি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার নাট্যরচনার মোটামুটি ছয়টি স্তর নির্দেশ করা যায়। প্রথম স্তরে গান ও সুর-প্রধান নাটক—'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১), 'কাল-মৃগয়া' (১৮৮২), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮); দ্বিতীয় স্তরে মনস্তত্ত্বানুবর্তী নাটক—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬)' 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), 'শোধবোধ' (১৯২৬), তপতী (১৯২৯); তৃতীয় স্তরে কাব্যপ্রধান নাটক—'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), বিদায়-অভিশাপ' (১৮৯৩), 'গান্ধারীর আবেদন' (১৮৯৭), 'সতী' (১৮৯৭), 'নরকবাস' (১৮৯৭), 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (১৮৯৭), 'কর্ণ ও কুন্তী' (১৯০০); চতুর্থ স্তরে রূপক-নাটক—'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬); 'গুরু' (১৯১৮), 'অরূপ রতন' (১৯২০), 'ঋণশোধ' ('শারদোৎসব') (১৯২১), 'মুক্তধারা' (১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২); পঞ্চম স্তরে নৃত্যকাব্য—'নটীর পূজা' (১৯২৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) ও 'তাসের দেশ' (১৯৩৩); নৃত্যনাট্য—'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮), 'শ্যামা' ১৯৩৯) ও ষষ্ঠ স্তরে প্রহসনজাতীয় কৌতুকরস-প্রধান কয়েকখানি নাটক—'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) (পরবর্তী সংস্করণ 'শেষরক্ষা (১৯২৮), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭); 'শোধবোধ' (১৯২৬) (কর্মফল-এর নাট্যরূপ), 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর (১৯০৮) নাট্যরূপ—'চিরকুমারসভা' (১৯২৬)।

রবীন্দ্র-নাট্যাবলীর স্তর-বিভাগ

এই তালিকা ও স্তরবিভাগ হইতে রবীন্দ্রনাথের নাটকের রীতি-বৈচিত্র্য ও বিবিধ রূপের আশ্রয়ে স্ফুরণ-প্রবণতার একটা ধারণা করা যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দ্বিতীয় স্তরে মনস্তত্ত্বানুবর্তী নাটক ছাড়া অপর সকল প্রকারের নাটক কোন না কোনরূপ নাটকাতিরিক্ত রচনাপ্রকরণ হইতে প্রেরণা আহরণ করিয়াছে। এমন কি, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকের কতকগুলি পূর্বলিখিত উপন্যাসের নাট্য-রূপ ও অন্য রীতিতে গ্রথিত কাহিনীর মধ্যে নাট্য-সম্ভাবনার বিলম্বিত আবিষ্কারের ফল। যে রূপক-নাটকগুলি রবীন্দ্র-জীবনবোধের বিশেষত্বমণ্ডিত, সেগুলিও প্রধানতঃ তত্ত্বাশ্রয়ী ও জীবনের প্রতি পরোক্ষদৃষ্টিসঞ্জাত। মনে হয়, যে দৃষ্টিতে জীবন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাট্যসংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করে, রবীন্দ্রনাথের সে দৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথের নাটক-সৃষ্টির প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত নহে, বিবর্তিত

ছিল না; তাঁহার বিষয়গুলি অপর কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া নাটকাকারে দানা বাঁধিয়াছে; মনের অনেক কক্ষ ঘুরিয়া, চিন্তা ও জীবনচেতনার নানা বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাটকীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে। তিনি ঠিক স্বভাব-নাট্যকার নহেন; কবি, ঔপন্যাসিক ও অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ হইতে ক্রমোত্তরণের ফলে, পূর্বসৃষ্ট রসকে নূতনভাবে চোলাই করিয়া, উহার মধ্যে আস্বাদন-বৈচিত্র্য-সঞ্চারের পরীক্ষামূলক প্রয়াসের ভিতর দিয়াই তিনি অবশেষে নাট্যকার-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন শান্তিনিকেতনের নির্জন তপশ্চর্যার আশ্রম প্রথমতঃ ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পরে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান-আহরণ ও মানবমনের বিচিত্র ভাব-বিনিময় ও আবেগ-সংঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গানের জগৎ, রূপবিলাসের জগৎ, তত্ত্বধ্যানের জগৎ, হৃদয়াবেগের ছন্দঃপ্রবাহময় জগৎ কোন কোন অংশে ধীরে ধীরে জমাট বাঁধিয়া, নাটকীয় মূর্তিভাস্কর্যের স্থির রেখার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে নিজ স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেও প্রয়াস পাইয়াছে।

(৯)

গীত হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যলীলাস্ফুরণ হইয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' গীতনির্ঝরের অজস্র ধারার উপরই নাটকের ভাব-বিগলিত, রস-বিহ্বল ভিত্তি রচনা করিয়াছে। সংলাপ, ভাবের পরিবর্তন, চরিত্রের ঈষৎ আভাস, ঘটনার পরিণতি ইত্যাদি সকল দিকেই নাটক-তরণী গীত-প্রবাহের উপর দিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। এখানে গান ও প্রেমই সর্বস্ব; ইহাদের মায়া-মুকুরে নাটকের ছায়ামাত্র আপনাকে প্রতিফলিত দেখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যদি কোন নাট্যরস লেখকের অজ্ঞাতসারে সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রেমমুগ্ধ চিত্তের অস্থিরতা ও আত্মবিভ্রম। গানের জালে প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া নাটক-হরিণকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা এখানে দেখি।

প্রথম স্তরের নাটকের গীত-সর্বস্বতা

দ্বিতীয় স্তরে রবীন্দ্রনাথ নাটকের প্রচলিত আঙ্গিক অনুসরণ করিয়া মানস-দ্বন্দ্বের একটা রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর উদ্দেশ্য তত্ত্ব-প্রতিপাদন; ইহার চরিত্রগুলি সবই রূপকধর্মী, তত্ত্বসমস্যার বিভিন্ন উপাদানের প্রতিচ্ছবি। এখানে সমস্ত মায়াবন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী জীবনমমতা-রূপিণী বালিকাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অনুশোচনা-পীড়িত। এই অন্তর্দ্বন্দ্বটি মানবিক; উহার রূপায়ণ-পদ্ধতি ঠিক নাট্যধর্মী না হইয়া অনেকটা আখ্যানধর্মী হইয়াছে। তথাপি তত্ত্ব-রূপকাশ্রিত

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' মানবিক দ্বন্দ্ব

অন্তর-সংঘাতেরও একটা বাস্তব ভিত্তি আছে; ইহা মানুষেরই কথা, তবে একটু তির্যক দৃষ্টিতে লক্ষিত ও একটু বাষ্পাবরণের ব্যবধান হইতে অনুভূত। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনসমস্যাকে নাট্যরূপ দিবার জন্য আগ্রহান্বিত, তাহারই প্রমাণ মিলে।

'রাজা ও রানী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাবয়ব পঞ্চাঙ্ক নাটক। এখানে নাটকের কয়েকটি অত্যাবশ্যক উপাদান দেখা যায়—দৃঢ়চরিত্র, সংকল্পে কঠোর নর ও নারী ও উহাদের মধ্যে প্রণয়ের অতৃপ্তি ও আদর্শের পার্থক্য লইয়া নিদারুণ সংঘাত। নাটকের পটভূমিকায় সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যশাসনপ্রণালী, রাজার যথেচ্ছাচার ও প্রজার দুঃখে নির্মম উপেক্ষা, রাজনৈতিক কূটনীতি ও ষড়যন্ত্র ও কতকগুলি পার্শ্বচরিত্রের সমাবেশ। বিক্রম ও সুমিত্রার আদর্শ-সংঘাতক্ষুব্ধ ও একদিকে হিংস্র জিঘাংসায় ও অন্যদিকে অনমনীয় বিমুখতায় রূপান্তরিত প্রেমের বিপরীত-রূপে কুমার ও ইলার সমপ্রাণতা-মধুর কিন্তু অদৃষ্টবিড়ম্বিত প্রেম এবং নরেশ ও বিপাশার বাইরের বাগ্-বিতণ্ডার অন্তরালে পারস্পরিক আকর্ষণ দেখান হইয়াছে। কিন্তু যে বৈপরীত্য নাটকের প্রাণ হইতে পারিত, তাহা কেবল বহিরঙ্গমূলক সংযোজনায় পর্যবসিত হইয়াছে; ইহা পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ, নাটকীয় তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে নাই। কুমার ও ইলা, নরেশ ও বিপাশা বিক্রম-সুমিত্রার সম্পর্ককে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনরূপেই প্রভাবিত করে নাই। আসল কথা, বিক্রমের কোন প্রতিনায়ক নাই; তাহার দুর্জয় অভিমান সুমিত্রার আত্মবিসর্জনে নির্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য কাহারও প্রভাবে ইহার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই। বিক্রমের অতিরঞ্জিত আত্মরতিকে নাটকীয় স্বাভাবিকতা দিতে গেলে উহার বিপরীতধর্মী কোন চরিত্রসৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল। এইখানেই নাটকীয় সংঘাত খানিকটা কৃত্রিম ও মাত্রাহীন হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পরবর্তী পরিবর্তিত সংস্করণ 'তপতী' হইতে কুমার ও ইলার অংশ বাদ দিয়াছেন এবং অতিরিক্ত ভাববিলাসকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও নাটকীয় ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। আসল কথা, বিক্রমের ন্যায় দুর্ধর্ষ চরিত্রের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নাটকীয় রসসিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক; সুমিত্রার নীরব প্রতিরোধ ও নৈতিক আত্ম-বলিতে নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। 'তপতী'তে সুমিত্রার দিব্যরূপটিকে প্রাধান্য দেওয়াতে এই পরিণতির সহিত নাটকের পূর্ববর্তী ঘটনাবিন্যাসের

'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী' নাটকে সংঘাতের কৃত্রিমতা

সংযোগ অনেকটা শিথিল হইয়াছে। 'রাজা ও রানী' আতিশয্য-বিড়ম্বিত নাটক; 'তপতী' অদ্বৈত ভাবের বাহনরূপে অনেকটা রূপক-লক্ষণান্বিত।

'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক—ইহা 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ। 'রাজা ও রানী'তে প্রকৃত নাটকীয় সংঘর্ষের যে অভাব ছিল, এখানে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য সক্রিয়তার দিক দিয়া রঘুপতির সমতুল্য নহেন; কিন্তু তিনি যে ন্যায় ও আদর্শের প্রতীক, তাহা কর্মে ব্যর্থ হইলেও সূক্ষ্মতর নীতিবিধানের মাধ্যমে রঘুপতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। এক অমোঘ ন্যায়-বিধির ফলে রঘুপতির নিজের অস্ত্র ফিরিয়া আসিয়া তাহাকেই নিদারুণ আঘাত হানিয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধ ও রক্তপাতে উত্তেজনা গোবিন্দমাণিক্যের যতটা পরাভব ঘটাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা রঘুপতির ক্ষেত্রে আরও মর্মভেদী পরাজয়ের হেতু হইয়াছে। নক্ষত্ররায় গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, রঘুপতিকেও নির্বাসনে পাঠাইয়াছে। জয়সিংহ রঘুপতিকে রাজরক্ত দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজের ও রঘুপতির বুকেই ছুরিকাঘাত করিয়াছে; অর্পণার সম্বন্ধে উচ্চারিত সাবধান-বাণী তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রঘুপতির শোকোচ্ছ্বাস নাটকীয় তীব্রতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, যদিও বর্ণনারীতি নাট্যধর্মী অপেক্ষা বেশী কাব্যধর্মী।

'বিসর্জন'-এর কাব্যধর্মিতা

'মালিনী' কোনও দিনই বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই—এক্ষেত্রে ট্রাজেডির যে প্রধান কারণ—হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে ধর্মবিরোধ—তাহা নাটকীয় সংহতি ও সংঘাততীব্রতা লাভ করে নাই। ক্ষেমঙ্কর, সুপ্রিয়, মালিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলি হয় দুর্বল, না হয় একপেশে হইয়া পড়িয়াছে। রঘুপতির সাহত তুলনায় ক্ষেমঙ্করের প্রতিহিংসা আরও ভয়াবহ ও অ-মানবিক হইয়াছে। রঘুপতির ধর্মান্ধতার প্রতি কতকটা সহানুভূতি দেখান যায়; কিন্তু 'মালিনী' নাটকে ধর্মান্ধতা কোন সর্বজনীন নীতিমূলক নহে, ষোল আনা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত। মালিনীর শান্তিপ্রিয়তা ও আপসমূলক মনোবৃত্তি ট্রাজিক সংঘর্ষ ঘটাইবার মত শক্তিশালী প্রভাবরূপে অনুভূত হয় না। এই নাটকের আপেক্ষিক অসাফল্যের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের গতি পরিবর্তিত করিলেন এবং প্রাচীন প্রথা পরিহার করিয়া নূতন নাটকীয় রীতি অবলম্বন করিলেন।

'মালিনী' জনপ্রিয় না হইবার কারণ

তৃতীয় স্তরে তিনি যে সমস্ত নাটক রচনা করিলেন, তাহা মূলতঃ কাব্যধর্মী

সংলাপ ও ইহার মধ্যে চরিত্রের ক্ষীণ আভাস দান। ইহাদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, তাহার প্রকাশ নাটকীয় নহে, তাহা কাব্যের দীর্ঘ পল্লবিত সৌন্দর্য-উচ্ছ্বাসের মধ্যে অভিব্যক্ত। 'চিত্রাঙ্গদা' মদনদেবের নিকট রূপ ঋণ লইয়া যে অর্জুনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার জন্য তাহার মনে অনুতাপ ও আত্মধিক্কার জাগিয়াছে। অর্জুনেরও চিত্রাঙ্গদার প্রতি ভাব-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উপস্থাপনা হইয়াছে নাটকীয় রীতিতে নহে, দীর্ঘ স্বগতোক্তি ও অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যের মাধ্যমে আত্মবিশ্লেষণ ও প্রেম-নিবেদনের দ্বারা। মনস্তত্ত্ব ও হৃদয়-সংঘাতের ইঙ্গিত এই কাব্য-প্লাবনের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার বহিরঙ্গ নাটকের, কিন্তু অন্তরাত্মা কাব্যের।

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যাকারে কাব্য

'গান্ধারীর আবেদন'-এ আখ্যান এবং গম্ভীর ও সমুন্নত নীতি-প্রতিষ্ঠার প্রাধান্য, নাটকীয়তা এখানে গৌণ। চরিত্রের এখানে কোন পরিবর্তন নাই, কেননা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে অটল। ইহাদের মধ্যে যে সংলাপ-বিনিময় ঘটিয়াছে, তাহাতে পরস্পরের মতবাদের মন্থরগতি উপস্থাপনা ও পরস্পরের যুক্তিখণ্ডনের দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ আয়োজন আছে, কিন্তু কোথাও নাটকীয় উত্তেজনা ও অন্তর্ভেদী অস্ত্রক্ষেপের নিদর্শন নাই। ইহার মধ্যে কেবল ধৃতরাষ্ট্রই উভয় আদর্শের মধ্যে দোলায়মান ও অস্থিরমতি বলিয়া খানিকটা নাটকীয় লক্ষণান্বিত। গান্ধারীর শেষ অভিশাপে তীব্র আবেগ আছে, কিন্তু ইহা নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণতি নহে, নিজের মনে যে সঞ্চিত উত্তাপ ছিল, অন্তরের আলোড়নে তাহারই বিস্ফোরক প্রকাশ।

'গান্ধারীর আবেদনে' নাটকীয়তা গৌণ

কাব্যধর্মী নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নাটকীয় পরিস্থিতি দেখা যায় 'কর্ণ ও কুন্তী'-তে। কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎ ও আলাপের উপলক্ষ নাট্য-সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ও উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে একদিকে বিস্ময়বোধ, অন্যদিকে অপরাধের ক্ষালন-চেষ্টা ও অস্বীকৃত সন্তানের নিকট কুণ্ঠিত প্রসাদ-ভিক্ষা এক তীব্র নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। সমস্ত সংলাপের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন সুর—মাতার প্রতি পুত্রের অভিমান-ক্ষুব্ধ অনুযোগ ও অপরাধিনী মাতার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়াও পুত্রের প্রতি করুণ কাতর আবেদন—দুই বিরুদ্ধ ভাব-সংঘর্ষের আগ্নেয় পরিবেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। উভয়ের বক্তৃতাই অপরের আগ্রহাতিশয্যে, আবেগের অধীর অনিবার্যতায় সংক্ষিপ্ত

'কর্ণ ও কুন্তী' শ্রেষ্ঠ কাব্যধর্মী নাটক

ও খণ্ডিত হইয়াছে—ইহা যেন কাব্যের একটানা প্রবাহ নহে, নাট্য-বিরোধের দুই বিপরীতমুখী ছন্দ যেন ইহার ভাবস্রোতকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে। কর্ণের উক্তিতে তীব্র শ্লেষ ঝলসিয়া উঠিয়াছে, কুন্তীর বাক্যে অসহায়ত্বের আক্ষেপ ধ্বনিত হইয়াছে; আবেগের এই দ্বিমুখী সংঘাতে অতীত স্মৃতি উথলিয়া উঠিয়াছে, আখ্যানের ধারাবাহিকতা কয়েকটি দ্রুত ভাবতরঙ্গের আনাগোনায় বিদীর্ণ হইয়া উহার অন্তর্নিহিত নাট্য-তাৎপর্যটি নূতন করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়াছে। আখ্যানের উপসংহারটিও শুধু অপরিবর্তনীয় পূর্বসিদ্ধান্তের পুনরুক্তি না হইয়া সংঘর্ষ হইতে সদ্যোজাত এক নূতন সংকল্পকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—কর্ণ যাহা শেষ পর্যন্ত স্থির করিয়াছে তাহা তাহার মাতার সহিত বোঝাপড়ার ফল। সুতরাং এই পরিসমাপ্তিও নাট্য-গুণাঢ্য হইয়াছে। এই রচনাটিতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাট্যধর্মের সার্থকতম সমন্বয় ঘটিয়াছে।

চতুর্থ স্তরে রূপক-নাটক-পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথের নাট্যকলার স্বকীয়তা উদাহৃত হইয়াছে। অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও ঐশ স্পর্শের জন্য উন্মুখ কবি যখন এই বিষয় লইয়াই নাটক লিখিয়াছেন, তখনই উহা তাঁহার বিশিষ্ট অনুভূতির বাহন হইয়া উঠিয়াছে। স্থূল রক্তাক্ত সংঘাত, বৈষয়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে, অন্তরের সূক্ষ্ম ভাব, অধ্যাত্ম-সাধনার ব্যাকুলতা হইতে উদ্ভূত বিভ্রান্তি ও আত্মদ্বন্দ্ব, গভীর, আত্মমগ্ন অনুভূতির ব্যঞ্জনা নাটকের বস্তুদেহ ও আন্তর প্রেরণা যোগাইয়াছে। ধর্মবোধ হইতে কবি ক্রমশঃ জান্তবের ও যন্ত্রশিল্প-নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থার মর্মমূলে যে আত্মঘাতী শক্তিমত্ততা ও শূন্যতাবোধ বাসা বাঁধিয়াছে, তাহাও তাঁহার রূপক-কল্পনা ও নাট্যকলার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই জাতীয় নাটক যে ধর্মপ্রাণ ও সূক্ষ্ম-অনুভূতি-সম্পন্ন বাঙালীর ঐতিহ্য ও সহজ জীবনযাত্রার অধিকতর উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কারণে অলৌকিকরসপূর্ণ যাত্রা ও যাত্রাধর্মী নাটক বাঙালীর অধিক প্রিয়, অনেকটা সেই কারণেই রূপক-নাটকের অন্তর্মুখী ভাবাবেদন তাহার অধিকতর মর্মানুসারী। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে 'রাজা' ও উহার রূপান্তরিত সংস্করণ 'অরূপ রতন' সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজার অন্তরালবর্তী, অথচ সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি, তাঁহার নিগূঢ় রহস্যময়, অথচ ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্নভাবে প্রতীয়মান সত্তা ও তাঁহার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী গুণের সমন্বয়, সুদর্শনার তাঁহাকে রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার আকূতি ও ইহার ব্যর্থতায় তাহার নানাবিধ মানস প্রতিক্রিয়া, কাঞ্চীরাজের তাঁহার সহিত শক্তি-প্রতিযোগিতার স্পর্ধা, ভগবান সম্বন্ধে সাধারণ

শ্রেষ্ঠ রূপক-নাটক 'রাজা'

লোকের নানা ভ্রান্ত ধারণা ও মেকি রাজার নিকট তাহাদের আনুগত্য-স্বীকার এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভ্রান্তির নিরসনে, সমস্ত অভিমান-অহঙ্কারের অবসানে ভগবৎ-স্বরূপের প্রকৃত উপলব্ধি ও তাঁহার উপর কোন দাবি-দাওয়া না রাখিয়া নিঃশর্ত আত্মনিবেদন—এই সমস্ত রূপকানুভূতির সমাবেশে, মানস ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল, অথচ শান্তরস-পরিপ্লুত একখানি চমৎকার নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। গানের মধ্যেও সেই ব্যঞ্জনা, মানস অনুভূতির সেই আলোড়ন, প্রতীতির সেই সুর নাট্যক্রিয়ার সমর্থন ও পরিপূরণের কাজ করিয়াছে। হয়ত প্রাকৃত জনসাধারণের সংলাপ কিংবা প্রতিযোগী রাজাদের ক্রিয়াকলাপ একটু মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে। কিন্তু এইটুকু বাদ দিলে নাটকের বহির্ঘটনা ও চরিত্রকল্পনা উহার অন্তরের অধ্যাত্ম-সত্যের এক সার্থক ও জ্যোতির্ময় দেহাবরণ রচনা করিয়াছে।

'ডাকঘর'

এক মৃত্যুপথযাত্রী বালকের মুক্তিপিপাসা, ভগবান-প্রেরিত চিঠি পাওয়া সম্বন্ধে তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে চিকিৎসার নানা বাধা-নিষেধ-মুক্ত অবারিত স্বাধীনতায় তাহার ভগবৎ-সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি 'ডাকঘর'-এর রূপক-আবরণ রচনা করিয়াছে। বালকের সরল বিশ্বাস, মুক্ত, বাধাহীন জীবন ও প্রকৃতির সুদূর আহ্বানের জন্য আকুতি, চিঠি পাইবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ—এ সবই মানবের জীবন-আস্বাদ ও ভগবৎ-উপলব্ধির জন্য অপ্রশমিত আবেগকে ব্যঞ্জিত করে। এই রূপক-নাটকের নাটকীয়তা আমলের রুগ্ণ মনের করুণ অভিলাষ, যাহা অপ্রাপনীয় তাহার জন্য তাহার অশান্ত আক্ষেপের মধ্যে নিহিত। গীতি-মূর্ছনার একটি সুর যেন নাটকীয় আবেগের মধ্যে এখানে মূর্ত হইয়াছে।

'ঋণশোধ' বা 'শারদোৎসব'

'ঋণশোধ' বা 'শারদোৎসব'-এ শরতের দিগন্ত-প্রসারিত, আলোকোজ্জ্বল আনন্দ যেন গানে, সংলাপে, পাত্র-পাত্রীর আত্মহারা হর্ষচাঞ্চল্যে, গীতিকবিতার অপেক্ষা আরও নিবিড়, বস্তু-ও-ভাবময় রূপ পাইয়াছে। এখানে নাটকীয় সংঘাত সূক্ষ্মতম ও স্বল্পতম আয়তনে সঙ্কুচিত হইয়াছে। যেমন শরতের অম্লান আলোক বদ্ধ গুহায় ও তরুলতাহীন গিরিশৃঙ্গে অনুপ্রবেশ করিয়া বিরোধী পদার্থের উপরও উহার জয়পতাকা উড়ায়, তেমনি এ নিখিলব্যাপ্ত আনন্দ কৃপণ ধনীর অন্ধকার কোষাগারে ও কর্তব্য-নিষ্ঠ বালকের পুঁথিপত্র-ঘেরা সাধনকক্ষেও উহার সর্বজয়ী হর্ষহিল্লোল প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। লক্ষেশ্বর বা উপানন্দ সত্যই আনন্দবিমুখ শক্তির প্রতীক নহে, বরং ইহারা আনন্দরস-শোষণের তৃষ্ণার্ত পাত্র; ইহাদের মধ্যেই আনন্দের

চরম শক্তির বিকাশ হইয়াছে। রাজা, ঠাকুরদাদা, বালকগণ—ইহারা মানব নহে, আলোক-রস-মত্ত, বাতাসে গা-ভাসান, বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি। এই বিশুদ্ধ ভাব-রসপুষ্ট, আত্মার দ্যুতিতে জ্যোতির্ময় নাটকটি লঘুতম বস্তু-উপাদানে গঠিত।

'অচলায়তন'

এই পর্যায়ের নাটকসমূহের মধ্যে 'অচলায়তন' ব্যঙ্গাত্মক ও বিশিষ্ট-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এখানে অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুভূতি অপেক্ষা প্রাণহীন প্রথা ও আচারের ভারে ক্লিষ্ট ধর্মসাধনা পদ্ধতির ব্যঙ্গচিত্র-অঙ্কনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। রূপকের প্রয়োগ-কল্পনার বিস্তার ও ইঙ্গিতময়তার পরিবর্তে বস্তু-প্রতিবস্তূপমার মত একটা অতিনির্দিষ্ট আক্ষরিক-সাদৃশ্যই এখানে প্রকট। ইহাতে নাটকীয় বিকাশ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধির সুস্পষ্ট আভাসের পরিবর্তে পাই প্রচলিত সাধনা-প্রক্রিয়া ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের ব্যর্থতা-প্রতিপাদন। আদিগুরুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা কোন নাটকীয় ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে না। সঙ্কেতময় নাটকে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের প্রখরতা আবহাওয়ার সঙ্গতি-বিরোধী।

'ফাল্গুনী'

'ফাল্গুনী'-তে রবীন্দ্র-কাব্যে যে জীবন-দর্শন পুনঃ পুনঃ উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, তাহারই নাট্যরূপ পাই। এই নাটকে যৌবন ও জরামৃত্যুজয়ী, নব নব জন্মে নূতনরূপে আবির্ভাবশীল মানবাত্মার জয়গান করা হইয়াছে। ইহাতে নাট্যবস্তুর বিশেষ কিছু নাই—কবির অনুভূত জীবন-সত্যকে কয়েকটি ভাব-বিগ্রহরূপী মানুষের গান ও সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই সত্যের বাহন হওয়া ছাড়া তাহাদের আর কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, রক্তমাংসময় অস্তিত্ব কিছু নাই। আনন্দ-নির্ঝর-প্রপাতের শীকরবিন্দুগঠিত ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় তাহারা আমাদের চোখের সামনে একটা রঙীন উচ্ছ্বাসের মত মুহূর্তের জন্য প্রতিভাত হয়। উদ্বেলিত, বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দ যেন নিজ আতিশয্যের বাষ্পেই মানবমূর্তি ধারণ করিয়াছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গীতি-নাট্যেরই পরিণত প্রজ্ঞা ও জীবনদর্শনের গভীরতর প্রত্যয়সমন্বিত প্রত্যাবর্তন।

'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'

'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' মানবজীবনের আধুনিক সমস্যা-কণ্টকিত, বিস্তৃততর ক্ষেত্রে রূপককল্পনার সম্প্রসারণ। ইহাতে সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। প্রথমতঃ ধর্মজীবনের সূক্ষ্মতত্ত্বের পরিবর্তে আমরা এখানে সমসাময়িক বাস্তব জীবনযাত্রার তীক্ষ্ণতর আবেদনসম্পন্ন ছবি প্রত্যক্ষ করি। জাতি-বিদ্বেষ ও যন্ত্রসভ্যতা এই দুইটি অতিপরিচিত জীবনসত্য রূপকের কল্পনারঞ্জিত

ছদ্মবেশে আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়া আমাদের কৌতূহল ও রসগ্রাহিতাকে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করে। সুতরাং ইহাদের মানবিক আবেদন আরও বেশী হইবে—এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এইজাতীয় বিষয়ের যে গুরুতর অসুবিধা তাহা এই যে, ইহাদের নানামুখী ও অতিপ্রত্যক্ষ বস্তুসত্তাকে রূপক-প্রয়োগের উপযোগী সূক্ষ্মতর ভাবরূপ দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। ভগবান অবাঙ্‌মনসোগোচর হইলেও সুদীর্ঘ ধর্মসাধনার ফলে আমাদের তাঁহার সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট বোধ আছে; এবং এই বোধকে রূপকের ইঙ্গিতের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যায়। কিন্তু আধুনিক যুগের রাজনীতি ও অর্থনীতি শতবাহু বিস্তার করিয়া আমাদিগকে এরূপ আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টিত করিয়াছে যে, ইহাদিগকে একটা কাল্পনিক ভাবসত্তায় সংহত করা যায় না। আবার একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বস্বীকৃত ভাবসত্তা না পাইলে রূপক-কল্পনা প্রয়োগ করা অসম্ভব। বরং যন্ত্রসভ্যতায় পিষ্ট মানবাত্মার একটা শূন্যতাবোধক্লিষ্ট, অনির্দেশ্য-অতৃপ্তিবেদনাজড়িত পরিচয় আমাদের নিকট এক অখণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট, অতিবাস্তব সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহাকে সাঙ্কেতিকতার ভাবচ্ছটাময় পরিধিতে সুবিন্যস্ত করার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে। সেইজন্য 'মুক্তধারা'য় রূপকানুরঞ্জন অনেকটা ব্যর্থ। কুমার অভিজিৎ যে মন্ত্রে রুদ্ধ ঝরনার উৎসমুখ খুলিয়া দিলেন তাহার ভাবস্বরূপ ও গুরুতর ব্যঞ্জনা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। মহাকালের মন্দিরচূড়া ও যন্ত্ররাজ বিভূতির অস্তসূর্যরশ্মির রক্তিল-মদিরাপায়ী, গর্বোদ্ধত যন্ত্রদানব দুই বিপরীত প্রতীকরূপে কল্পিত হইলেও আমাদের মানস সংস্কারের নিকট অপরিচিত থাকিয়াই যায়। কবির সচেতন আলঙ্কারিক নির্মিত আমাদের সহজ বোধের অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ পায় না। ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে একটা বিশেষ দেশের রাজনৈতিক আদর্শবাদ ও কর্মপদ্ধতির ছায়াপাত হইয়া তাহার সার্বভৌম প্রতীকরূপকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ইহার আকাশ কোথাও বাস্তবের কোলাহলে মুখর, কোথাও সুলভ আদর্শবাদের প্রচুরোৎসারিত ধূমে আবিল, কোথাও বা সার্থক সংকেতের আভায় রঙ্গীন—সমস্ত মিলিয়া এক নিবিড় ভাবসংহতি গড়িয়া উঠে নাই।

'মুক্তধারা'র সহিত তুলনায় 'রক্তকরবী'র সাঙ্কেতিক তাৎপর্য অনেক সুষ্ঠুতর ভাবে অভিব্যঞ্জিত। এখানে অন্তত তিনটি চরিত্র আছে, যাঁহারা রূপক-প্রভায় ভাস্বর ও সার্বভৌম সত্তায় উন্নীত—লৌহজালের অন্তরালস্থ রাজা, নন্দিনী ও রঞ্জন। রাজা তাহার প্রচণ্ড শক্তির ব্যর্থ প্রয়োগে আত্মদ্বন্দ্বজর্জর—তাহার সৃষ্টি-

প্রতিভা শুধু বস্তুপুঞ্জসঞ্চয়ে বিড়ম্বিত। নন্দিনী প্রাণময় সত্তা—অতৃপ্তিপীড়িত সংঘর্ষ-ক্ষুব্ধ সুস্থ-আত্মবিকাশবঞ্চিত জগতে সে আশা ও আনন্দের চকিত আভাস বহন করে। রাজার সঙ্গে তাহার কোথাও যেন একটা মিল আছে; দুর্বার শক্তির, আনন্দলোকে উত্তরণের প্রতি যে একটা সহজ প্রবণতা আছে তাহাই নন্দিনীর সহিত রাজার যোগসূত্র। এই পথে যে অনতিক্রম্য বাধা আছে তাহাই রাজাকে একটা দুর্বোধ্য আত্মপীড়নের চক্রে ঘূর্ণিত করিয়াছে। রঞ্জন ব্যক্তিসত্তাবর্জিত, বিশুদ্ধ আনন্দসার। তাহার আসন্ন আবির্ভাব সমস্ত আকাশ-বাতাসে এক পুলক-প্রত্যাশার বসন্তবায়ুরূপে হিল্লোলিত হইয়াছে; রক্তকরবীর শিরোভূষণে তাহার আরক্ত সঙ্কেত। প্রাণসত্তা, নিখিলের মর্মকোষ-ক্ষরিত এই আনন্দরস হইতে, উহার আত্মবিকাশের সমস্ত প্রেরণা, উহার অদম্য আশাবিকিরণের সমস্ত উৎসার-শক্তি আহরণ করে। রঞ্জন ছাড়া নন্দিনী অসম্পূর্ণ; সেইজন্য রঞ্জন-নন্দিনীর মিলন-আভাসে সমস্ত নাটকটি পরিপূর্ণ। রাজা রঞ্জনকে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে এক আত্মঘাতী, মূঢ় রোষোচ্ছ্বাসে হত্যা করিয়া সমস্ত পৃথিবীর আলোককে নির্বাপিত করিয়াছে, সমস্ত প্রাণচঞ্চল জীবনলীলার উপর সমাধির নিশ্চল স্তব্ধতার আবরণ টানিয়া দিয়াছে। এই পর্যন্ত রূপককল্পনার সার্থক, সাবলীল, সৃষ্টিরহস্যভেদী প্রসার। বাকী অংশ, কলকারখানার মজুরশ্রেণীর জীবন ও তদুপযোগী প্রতিবেশসৃষ্টি কবিকল্পনা নহে, সচেতন মননশীলতার নির্মিতি। এখানে আমরা পাই বুদ্ধিগ্রাহ্য, নির্দিষ্ট অর্থে সীমাবদ্ধ, তীক্ষ্ণবাচনভঙ্গী-গঠিত রূপক (allegory); সাঙ্কেতিকতার রহস্যময় দ্যুতি এখানে উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতার ঘেরাটোপে আবৃত।

মুক্তধারা ও রক্তকরবীর সাংকেতিক তাৎপর্যের তুলনা

নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে নৃত্যকলার সাহায্যে ভাব-পরিস্ফুটনের নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। কাজেই সংলাপ-রচিত হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র এই জাতীয় নাটকে গৌণ স্থান অধিকার করে। গান ও অর্থনিবিড় নৃত্যভঙ্গীর মাধ্যমে নাট্যরস-পরিবেশনের আয়োজন নাটকের সাধারণ আঙ্গিকে অনেকটা ফাঁক রাখিয়াছে ও ঠিক সাহিত্যিক নাটকের মানদণ্ডে ইহাদের বিচার চলে না। এই নব পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের পরে আর বিশেষ অনুসৃত হয় নাই ও ইহাদের উপস্থাপনা যে বিশেষ দৃশ্যপট, আলোক-সজ্জা ও নৃত্যনৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল তাহার বিচার ও মূল্যায়ন অনেকটা সাহিত্যনিরপেক্ষ। সুতরাং এগুলির বিশেষ আলোচনা না করিয়া ইহাদিগকে

নৃত্যনাট্য সাহিত্য-বিচারের বহির্ভূত

রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্যের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করাই বিধেয়। নাটকের মধ্যে এক নূতন কলার প্রবর্তন যে নূতন প্রত্যাশা জাগায় ও নূতন তৃপ্তি প্রদান করে তাহার ওজন ঠিক সাহিত্যিক তুলাদণ্ডে নির্ণীত হইবার নহে।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকময়, হাস্যরসপ্রধান নাটক বা প্রহসনগুলির আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার নাট্যসৃষ্টির সম্পূর্ণ মণ্ডলটি প্রদক্ষিণ করিব।

কৌতুকনাট্য

স্ফূর্তির হিল্লোলে ভরা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে মনোরম, নানা ভ্রান্তি, কৌতুককর ঘটনা ও খেয়ালী চরিত্রের সমাবেশ অফুরন্ত হাসির নির্ঝর এই নাটকগুলি আমাদের মনে একটি অবিমিশ্র হর্ষলোকের সৃষ্টি করে। কবির কল্পনাগুণে কলিকাতা শহর যেন একটি প্রেম ও যৌবনোচ্ছ্বাসের মায়াপুরীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখানে প্রেমিক যুবক পথে পথে প্রেমিকার অনুসন্ধান করিয়া ফেরে, নানা ভুলচুকের ও হাস্যকর অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার সত্য পরিচয় লাভ করে ও গুরুজনের মনে নানা বিস্ময়-কৌতুকের ও সময় সময় বিরাগের সৃষ্টি করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার সহিত মিলিত হয়। এখানে চিরকৌমার্য-ব্রতের অসম্ভব প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত দুইটি তরুণ বন্ধু একটি তরুণী শ্যালিকা-পরিবৃত পরিবারে আমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে দুই তরুণীর প্রেমে পড়িয়া যায় ও তাহাদের সমস্ত কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া রঙ্গীন যৌবনস্বপ্নে, প্রেমের বিচিত্র কল্পনা-রোমন্থনে বিভোর হইয়া পড়ে। এখানে নারী-পুরুষের ছদ্মবেশে দুশ্চর ব্রতে যোগ দিয়া পুরুষ ব্রতধারীদের সংকল্প শিথিল করে ও প্রেমের মধুর মায়ালোকে প্রবেশ-ব্যাপারে তাহাদের পথ-প্রদর্শিকা হয়। এখানে শকুন্তলার আশ্রমে সখীদের ন্যায় সকলেই স্ত্রী-পুরুষ ও যুবক-প্রৌঢ়-নির্বিশেষে প্রেমের দৌত্যকার্যে স্বয়ংবৃত হইয়া এই মন-নেওয়া-দেওয়ার খেলায় যোগদান করে ও ইহাকে বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে লইয়া যায়। আবার কোথায়ও কোথায়ও কোন কল্পনাপ্রবণ যুবক প্রেমের আদর্শস্বপ্নের অনুধ্যান করিতে করিতে নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হয় ও খানিকটা যৌবনসুলভ হা-হুতাশ করিয়া, কল্পিত দুঃখে তাহার সমস্ত প্রতিবেশকে বিষাদমন্থর করিয়া তাহার ছদ্মবেশিনী স্ত্রীর নিকটই প্রেম নিবেদন করে ও পুনর্মিলনের লজ্জা-কুণ্ঠিত আনন্দে তাহার পূর্বকৃত অপরাধের ক্ষালন করে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় একজন সরল ও উদারহৃদয় বৃদ্ধের সাহিত্যিক দুরাকাঙ্ক্ষা, তাহার নিকট যে আসে তাহাকেই তাহার খাতা পড়িয়া শুনাইবার দুর্দম খেয়াল নানা কৌতুককর অবস্থার সহিত স্থানে স্থানে করুণ পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করিয়াছে; এই প্রহসনে প্রেমের উপস্থিতি পরোক্ষ ও গৌণ। প্রভুভক্ত দুর্মুখ ভৃত্য ঈশান ও

অন্তরালবর্তিনী অশ্রুমুখী বিধবা কন্যা নীরা ইহার হাস্যরসের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত গভীর সুরের প্রবর্তন করিয়াছে। এই নাটকসমূহে চরিত্রের স্বকীয়তা অপেক্ষা ঘটনাসন্নিবেশই প্রধান; প্রত্যেকটি চরিত্র ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। বৈকুণ্ঠ বা চন্দ্রকান্তের ন্যায় যে দুই-একজনের একটু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহারাও উদ্ভট খেয়ালপ্রবণতার জন্য হাস্যরসের স্রোতকে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাদের কথার জৌলুস, সংলাপের তীক্ষ্ণ, শাণিত রসিকতার অজস্র প্রবাহ আমাদিগকে এতই মুগ্ধ করে যে, আমরা ঘটনার সম্ভাব্যতা ও চরিত্রসঙ্গতি সম্বন্ধে কোন গভীর চিন্তাকে মনে স্থান দিতেই সময় পাই না। রবীন্দ্রনাথের পরিণত যৌবন ও প্রথম প্রৌঢ় বয়সে ঊনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশের ঠিক প্রারম্ভে, রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনীভূত হইবার অব্যবহিত পূর্বে, বাঙালীর মনে যে ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য আসিয়াছিল, জীবনকে সর্বসমস্যামুক্ত ও হাস্যকৌতুকে অনুরঞ্জিত করিয়া উহার পরিপূর্ণ রসোপভোগের যে ক্ষণিক প্রেরণা জাগিয়াছিল, সেই দক্ষিণপবন-বীজিত, প্রসন্নহাস্য-উদ্ভাসিত, মধুরকল্পনানন্দিত শুভলগ্নটি রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলির মধ্যে শিশিরোৎফুল্ল পুষ্পের পেলব সৌন্দর্যে চির-বিধৃত হইয়া রহিল।

ঘ—গদ্যরচনা

(১)

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার উপরও সেই অপরিমেয় বৈচিত্র্যের ছাপ আছে। তাঁহার প্রবন্ধগুচ্ছ, পত্রাবলী, ভ্রমণ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সংগ্রহের মধ্যে এই বৈচিত্র্যের পরিচয় নিহিত। তাঁহার গদ্যরচনা ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে 'রামমোহন রায়' হইতে আরম্ভ; 'চিঠি-পত্র-এ'র প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭তে ও সমালোচনার প্রথম আবির্ভাব ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে। তাঁহার প্রথম ভ্রমণ-কাহিনী 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' দুইখণ্ডে ১৮৯১ ও ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর মাঝে মধ্যে স্বল্প বিরতির পর এই গদ্য তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিরল ধারায় প্রবাহিত। 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'স্বদেশী-সমাজ' (১৯০৪), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রভৃতি সমালোচনাগ্রন্থ (সবই ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে রচিত), ১৪ খণ্ডে লেখা 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধসমষ্টি, 'জীবন-

গদ্যরচনার পরিধি

স্মৃতি' (১৯১২), 'ছিন্নপত্র' (১৯১২), 'জাপান যাত্রী' (১৯১৯), 'যাত্রী' (১৯২৯), 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'জাপানে-পারস্যে' (১৯৩৬), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'পত্রধারা' (১৯৩৮), 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪১)—এই সুদীর্ঘ তালিকা হইতে তাঁহার পরিধি-বিস্তার সহজেই অনুমান করা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যই তাঁহার গদ্যরচনার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। এই নানাবিষয়ক প্রবন্ধসম্ভারে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিচিত্র বিকাশ দেখা যায়। শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের গভীর মননশীলতা, উচ্ছ্বসিত আবেগ, কল্পনাদীপ্তি ও ভাষা-প্রয়োগের অদ্ভুত নিপুণতার পরিচয় মিলে। সাধারণতঃ তথ্যপ্রধান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যুক্তিধর্মী, তীক্ষ্ণ ও স্মরণীয় বাক্যসন্নিবেশে তৎপর, শ্লেষ ও ব্যঙ্গের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ও আলোচনার দীর্ঘ বিস্তার ও নিঃশেষ সমাপ্তির প্রতি আগ্রহশীল। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে লঘুস্পর্শ বা কল্পনার ক্রীড়াশীলতা বিশেষ দেখা যায় না—লেখকের অতিরিক্ত গুরুত্ববোধ (seriousness) ও উদ্দেশ্যের অতন্দ্র অনুবর্তন সময় সময় ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ-গুলিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগধর্মী ব্যাখ্যার প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও প্রগাঢ়তা অধ্যাত্ম-অনুভব ইহাদিগকে উচ্চতর সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। ঐশ স্পর্শলাভের জন্য লেখকের আবেগময় আকুতি, লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের পিছনকার মূলধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও কাব্যসৌন্দর্যময় প্রকাশ-রীতি ইহাদিগকে একাধারে সাহিত্যরসিক ও ধর্মপিপাসু উভয় শ্রেণীর পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখকের উদার মানস মুক্তি ও আদর্শনিষ্ঠা এবং বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির যান্ত্রিকতা ও অন্যান্য প্রকারের অপূর্ণতা যতটা ধরা পড়িয়াছে, গঠনমূলক পরিকল্পনার ততটা পরিচয় নাই। কবি তাঁহার বিশ্বভারতী-তে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত মাঝে মধ্যে পাওয়া গেলেও ইহার দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রয়োগ-সফলতার কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। মনে হয় যে; লেখক এইজাতীয় প্রবন্ধে জাতীয় মনের সাধারণ অসন্তোষকেই তাঁহার নিজস্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ও পূর্ণতাকামী কবি-মনের গূঢ় অতৃপ্তিবোধের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন ; সমস্যার রূপ যতটা পরিস্ফুট করিয়াছেন সে পরিমাণে সমাধানের ইঙ্গিত দেন নাই।

প্রবন্ধ সাহিত্য

তাঁহার ভ্রমণকাহিনীগুলিতে তাঁহার মানস পরিণতি ও সূক্ষ্মদর্শিতার ক্রমবিকাশ সুপরিস্ফুট। তাঁহার প্রথম রচনা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' অনেকটা সুখপাঠ্য তথ্যবিবৃতি; অপরিচিত জীবনযাত্রার বাহ্য অভিনবত্বই প্রধানতঃ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সমাজমনের গভীরে তিনি এখনও প্রবেশ করেন নাই। তার পর 'জাপানযাত্রী', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি,' 'জাপানে-পারস্যে' প্রভৃতি পরিণত বয়সের ভ্রমণ-কাহিনীতে একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমুদ্রের অসীম রহস্যের অপরূপ অনুভূতি, অপর দিকে বিচিত্র প্রথাআচার-কর্মোদ্যম-আতিথেয়তা-শিষ্টাচার প্রভৃতির ভিতর দিয়া জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও জীবননিষ্ঠার মর্মোদ্‌ঘাটন—কাব্যময় ও সমাজতাত্ত্বিক উভয়বিধ দৃষ্টিভঙ্গীই একযোগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পারস্যের প্রণয়-গুঞ্জন-মুখর ও সৌজন্যরস-পরিপ্লুত কাব্যকুঞ্জে কবিরূপে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার ছিল; কাজেই এখানে তিনি রাজনৈতিক শাসন-প্রথার কথা বিশেষ কিছু না বলিয়া দেশের কাব্যপরিবেশেই নিজ কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। জাপানের সঙ্গে তাঁহার ধর্মাদর্শের দিক দিয়া সহানুভূতি ও রাজনৈতিক আচরণের দিক দিয়া অ-সমর্থন ছিল। উহার শান্তি ও অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত সংস্কৃতি, উহার শিল্পসৌন্দর্যবোধ, কলাছন্দে নিয়মিত জীবনযাত্রার বর্ণনা ও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি-রহস্য-প্রণোদিত গভীর দার্শনিক মনন 'জাপান যাত্রী'তে অনবদ্য রসরূপ ও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যধর্মী গদ্যরচনার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রাশিয়া সম্বন্ধে তিনি পূর্ব হইতে কোন অনুকূল ধারণা লইয়া যান নাই; রুশ-বিপ্লবের রক্তাক্ত নির্মমতার কাহিনী, উহার ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্পূর্ণ উন্মূলনের প্রচলিত ধারণা, উহার ধর্মহীনতা ও জড়বাদপ্রবণতা অন্যান্য অনেকের ন্যায় তাঁহার মনেও যে একটা সংশয়জাল বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানে গিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি আহরণ করিলেন তাহার সাক্ষ্যকে যথাযোগ্য মূল্য দিবার মত তাঁহার উদারতা ও ন্যায়নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রধানতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার বিপুল কর্মোদ্যমের প্রাণচাঞ্চল্য ও সামাজিক বৈষম্য দূর করিবার নির্ভীক আদর্শনিষ্ঠা ও আপ্রাণ প্রয়াস—জীবনের এই দুইটি বিকাশকেই তাঁহার আন্তরিক ও অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তাহারা যে আলোকিত-শীর্ষ পিলসুজের ঠিক নীচেই অন্ধকারকে প্রশ্রয় না দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে ও এই সংকল্পসিদ্ধির পথে আশ্চর্যরূপে অগ্রসর হইয়াছে, ভারতীয় সামাজিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত এই চিত্র সংস্কারকামী লেখককে মুগ্ধ ও প্রশংসামুখর করিয়াছে।

ভ্রমণকাহিনী

রাশিয়ার চিত্রে আমরা লেখকের কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির পরিবর্তে পাই অপক্ষপাত সংস্কারমুক্ত ন্যায়বোধ—যে গাছে এমন আস্বাদনীয় ও উপভোগ্য ফল ফলিয়াছে তাহার মূল না খুঁড়িয়াই ও তাহার রসগ্রহণের ভূমিগর্ভস্থ আয়োজনের খবর না লইয়াই তাহার সতেজ জীবনীশক্তি ও পত্রপল্লববহুল ছায়ানিবিড়তাকেই লেখক প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির ভোগলোলুপতা, আধিপত্যস্পৃহা ও শোষণবৃত্তিকে, বিশেষত ভারতে ইংরেজশাসনের কলঙ্কিত অধ্যায়কে তিনি বরাবরই ধিক্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরে, অন্তিমশ্বাসগ্রহণের সহিত তিনি 'সভ্যতার সঙ্কট' নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষির ন্যায় তিনি আপাত-সমৃদ্ধ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মৃত্যুজীর্ণ এই দস্যুসভ্যতার প্রতি চরম অভিশাপ উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মুখ দিয়া ভারতীয় অধ্যাত্মবোধ ও জীবননীতি এই শক্তিমত্ত ও ব্যভিচারবিকৃত সভ্যতার উপর নিজ ধ্যানলব্ধ পূর্বানুভূতির বলে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিয়াছে।

(২০)

ইহার পর আসে সমালোচনা-সাহিত্য। 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে' এই গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মূলতত্ত্ববিশ্লেষণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যে ঐ মূলনীতির সার্থক প্রয়োগ পর্যন্ত সাহিত্যবিচারের সব কয়টি স্তরই উদাহৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-বিচার পূর্বসূরীদের সূত্র অনুসরণ করিলেও নিজ মৌলিক গূঢ়সঞ্চারী অনুভূতির আলোকে সমুজ্জ্বল। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির মূলে, সর্বজনের মনে সঞ্চরণশীল ভাবের কবি কর্তৃক স্বীকরণ ও নিজ অনুভূতির সাহায্যে উহাকে রূপান্তরিত করিয়া নবসৃষ্টিরূপে বিশ্বমানসের নিকট পুনঃ উপস্থাপন এই উভয়বিধ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। আবার সাহিত্যের মূল প্রেরণা প্রয়োজনাতিরিক্ত, খণ্ডিত দৃষ্টির দ্বারা অ-ব্যবচ্ছিন্ন আনন্দরসে নিহিত ইহাই তাঁহার অভিমত। উপনিষদ-প্রোক্ত যে আনন্দ হইতে নিখিল বিশ্বের উদ্ভব, সেই আনন্দই রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের আদর্শলোক-সৃষ্টিরও মূল কারণ। তিনিই বোধ হয় শেষ সমালোচক, যিনি বস্তুজগতের সর্বগ্রাসী অভিভবের অব্যবহিত পূর্বে, আদর্শকল্পনা ও আনন্দানুভূতি হইতে জাত কাব্য-সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়াছেন। অতি-আধুনিক কাব্যের বস্তুভার-পরিকীর্ণ, তথ্যনিষ্ঠার অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে সৌন্দর্যবিমুখ রূপকৃতিকে তিনি তাঁহার

সমালোচনা-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিয়া খানিকটা বিহ্বলতার বেদনা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু যে সত্য তাঁহার সমগ্র জীবানুভূতি ও শিল্পবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার মূল তত্ত্বকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সমালোচনা-তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ শুধু বিচার-বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ না হইয়া নূতন সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের ভাব—প্রতিবেশটি তিনি তাদাত্ম্যমূলক কল্পনাবলে একবারে নূতন করিয়া অনুভব ও গঠন করিয়াছেন। কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও কাদম্বরীর রসাস্বাদন-ব্যাপারে তিনি যে কেবল উহাদের কাব্যসৌন্দর্যের মূলপ্রস্রবণ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাহা নহে, যে জীবনদর্শনের গভীর চেতনাশ্রয়ী, অটল ভিত্তির উপর এই কাব্যকলা প্রতিষ্ঠিত, তাহারও প্রাসঙ্গিক প্রভাবটি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কালিদাসের প্রকৃত মাহাত্ম্য যে তাঁহার যৌবনসুলভ, ভোগাসক্ত প্রেমের বর্ণাঢ্য চিত্রণে নহে, পরন্তু তপশ্চর্যাপূত, আত্মসংযমে মহীয়ান, কল্যাণধর্মী প্রেমের শান্ত, নিরুচ্ছ্বাস পরিণতিতে—এই সত্যই রবীন্দ্রনাথ উক্ত কাব্যদ্বয় হইতে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহারই সঙ্গে আধুনিক বিচারবুদ্ধি প্রাচীন কাব্যে যে অমীমাংসিত সমস্যার দ্বারা পীড়িত হয় তাহারও সন্ধান তিনি দিয়াছেন। 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে তিনি উর্মিলার প্রতি কবিগুরুর উপেক্ষার কাহিনী বিবৃত করিয়া, বাণভট্টের হাতে পত্রলেখার আতপ্ত যৌবনের অবমাননা অনুভব করিয়া আমাদের কল্পনা ও সহানুভূতিকে এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার অসপত্ন মর্যাদা ও নীতির একচ্ছত্র আধিপত্যরক্ষার জন্য সমস্ত পার্শ্ব-চরিত্রকে নির্বিচারে বলি দেওয়া প্রাচীন কাব্যের একটা চিরানুসৃত রীতি ছিল। সীতার সহিত উর্মিলার, কাদম্বরীর সহিত পত্রলেখার গণতান্ত্রিক অধিকার-সমতা রক্ষা করিতে গেলে রামায়ণের নাম পরিবর্তন করিয়া রঘুবংশ রাখিতে হইত ও কাদম্বরীরও অনুরূপ নাম-পরিবর্তনের প্রয়োজন হইত। মহাকাব্য ও অভিজাত আখ্যান-কাব্য গণতান্ত্রিক সহানুভূতি দেখাইবার ক্ষেত্র নহে, কিন্তু ব্যক্তিমর্যাদার যুগে বর্ধিত সমালোচক এই উপেক্ষিত পাত্রীদের জন্য একটা সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছেন ও আমাদের ভাববিলাসপুষ্ট মনে তাহাদের জন্য করুণ বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' পড়িলে বিস্ময় জাগে যে, যে কবি পরিণত ও অভ্রান্ত শিল্পবোধের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—তিনি কেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে শিল্পরূপহীন, নিরর্থক, ছন্দ-কাকলীমুখর ও বিচ্ছিন্নচিত্র-পরম্পরা-সমন্বিত 'ছেলে ভুলান ছড়া'-র

অন্তরলোকে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রেরণার মূল ও আবেগ-প্রবাহের গোপন যোগসূত্রটি এমন সুষ্ঠুভাবে আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিতে মানবশৈশবের আদিম, অস্ফুট-বাক্ কল্পনাস্ফুরণ হইতে তাহার পরিণততম কাব্যপ্রেরণা পর্যন্ত সব কয়টি স্তরেরই সহাবস্থান ছিল—তাই তিনি শিশুর অশ্রান্ত ও অসংবদ্ধ সুরগুঞ্জন ও ছবির প্রতি অহেতুক আকর্ষণ, তাহার 'ছবি ও গান'-প্রবণতা হইতে শ্রেষ্ঠ মনন-সংস্কৃতির গভীর আবেদন পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশদক্ষতার সমান পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবের বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত, কল্পনার বাষ্পপরিবেশ ও আবেগের ছন্দদোলার মধ্যে বিধৃত হইয়া, শিশুর মনে যে মায়ালোক সৃষ্টি করে, ছেলে-ভুলান ছড়াগুলি নৈঃশব্দ্য-রহস্যের গভীর তলদেশ হইতে উত্থিত তাহারই বাণী-বুদ্‌বুদ। শিশুর মাতাই আদিম ছড়া-রচয়িত্রী ; শিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়া, স্নেহের সোনার চাবিতে শিশুর মনোরহস্যের দুয়ার খুলিয়া তিনি তাহার পরিবেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়বোধ, তাহার বিকাশোন্মুখ, নির্দিষ্ট সত্তায় অপরিণত চেতনার রূপক্ষুধা ও ছন্দোলালসাটিকে এই ছড়াগুলির মধ্যে এক স্বপ্নাবিষ্ট বাণীরূপ দান করেন। শিশুর জগতের ন্যায় শিশুর ছড়াও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গানের সুর ও রূপের ঝলক : প্রৌঢ় জগতের নিয়মকানুনবদ্ধ, অর্থসীমিত অন্তঃ-সঙ্গতি যেমন শিশুর মনেও নাই, তেমনি তাহার ছড়াতেও নাই। এই ছড়াগুলির মধ্যে সময় সময় এমন সমস্ত ঘটনার ছায়ারূপ দেখা যায় যাহাদের হয়ত এককালে সুসংবদ্ধ কায়া ছিল, যাহাদের এককালীন সুস্পষ্ট অর্থ এখন মুছিয়া ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, যাহারা বস্তু হইতে সঙ্কেতমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। শিশুমহলে সুপরিচিত 'আগাডুম বাগাডুম ঘোড়াডুম সাজে' শীর্ষক ছড়াটি এই ইতিহাসের রূপকথায় পরিবর্তনের স্মারক। এ যেন মহাদেশ-প্রান্ত-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডের সমুদ্র-বেষ্টিত, নিঃসঙ্গ দ্বীপে রূপান্তরিত হওয়ার মত ব্যাপার। এই দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে, ছড়াগুলির জন্ম কেবল প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগে নয়, বিলুপ্ত ইতিহাসের খণ্ডস্মৃতি-সমাকীর্ণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও বটে। ইহাদের মধ্যে ভাষার যে রূপময় চমক দেখা যায় ও পরিণত সমাজজীবনের—যথা বিবাহ, শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা, সাজসজ্জা প্রভৃতির—যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাদের পিছনে যে বহুযুগের সাহিত্যচর্চা ও সামাজিক বিবর্তনের প্রচ্ছন্ন পরিচয় আছে তাহা স্বীকার করিতেই হয়। আদিমতার যে ছাপ ইহাদের উপর মুদ্রিত তাহা সব সময় অকৃত্রিম নহে ; যেন মনে হয় অনুশীলিত শিল্পবোধ স্বেচ্ছায় পিছু হটিয়া এক কল্পনাসৃষ্ট আদিমতার

লোকসাহিত্য

রূপছন্দের অনুসরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' সাহিত্যসীমা-বহির্ভূত, লোকচিত্তের খেয়ালখুশিনির্ভর কল্পনার বাঙ্‌ময় প্রকাশ সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

'আধুনিক সাহিত্য'-এর প্রবন্ধগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসোপভোগের প্রায় একই প্রকারের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে 'প্রাচীন সাহিত্য' এ তাঁহার সমালোচনা যতটা সৃষ্টিধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, 'আধুনিক সাহিত্য'-এ ততখানি হয় নাই। তাহার একটা কারণ এই যে, আধুনিক যুগ প্রাচীন যুগের সহিত তুলনায় আরও অজস্র, বিশৃঙ্খল, কেন্দ্রসংহতিহীন ও নানা বিচিত্র ধারায় প্রসারিত; ইহার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বোঝা যায়, কিন্তু ইহার একক সত্তাপ্রতিষ্ঠা দুরূহতর। কালিদাস, বাণভট্ট যে অর্থে প্রাচীন যুগের প্রতিনিধি, সে অর্থে আধুনিক যুগের কোন সর্বসম্মত প্রতিনিধি-নির্বাচন সম্ভব নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলাল-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দুইটিতে সমালোচকের সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শনের অভাব নাই; তথাপি মনে হয় যে, ইহারা যেন বহিরঙ্গমূলক, কবির ব্যক্তিপরিচয়ের, ব্যক্তিগত অনুভূতিরই মুখ্য প্রকাশ। প্রতিভা-বিশ্লেষণ যতটুকু আছে তাহা নিশ্চয়ই বোধশক্তির সহায়ক; কিন্তু মনে হয়, সমালোচক খুব গভীরে অনুপ্রবেশ করেন নাই। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ'-এর সমালোচনা খুব উচ্চস্তরের। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধু-সম্বন্ধীয় সমালোচনার সহিত তুলনায় ইহাকে অনুপ্রবেশ-গভীরতায় কিছুটা ন্যূন মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের আত্ম-সমালোচনা কিন্তু কবিহৃদয়রহস্যকে আশ্চর্যভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—তাঁহাকে প্রকৃতভাবে বুঝিবার ইঙ্গিত ইহাদের মধ্যে যেরূপ পাওয়া যায় অন্যত্র তাহা দুর্লভ। বিশেষত তাঁহার চিন্তাধারার পরিবর্তন, নব নব প্রেরণার স্বীকরণ, তাঁহার রহস্যময় ভাবানুভূতির স্বরূপনির্ণয় ও সীমানির্দেশ-বিষয়ে তাঁহার আত্মসমালেচনার মূল্য অপরিসীম।

আধুনিক সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য তাঁহার ভ্রমণসাহিত্যের সহিত মিশিয়া গিয়া উহার প্রকৃত মূল্যনির্ধারণে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। উহাদের পত্রসাহিত্য বা ভ্রমণসাহিত্য কোন আদর্শে বিচার করা উচিত সে বিষয়ে কিছু সংশয় জাগে। পত্রসাহিত্যের আদর্শ হইল একটি সহজ, অন্তরঙ্গ সুর, লেখকের পরিবারস্থ ব্যক্তি ও বন্ধুবান্ধবের নিকট তাঁহার মনের এমন একটি অকপট প্রকাশ, তাঁহার রুচি, অভ্যাস, আত্মীয়মণ্ডলীর প্রতি প্রীতি-ভালবাসা-কৌতুকরসের, এক কথায় তাঁহার লৌকিক জীবনের, এমন একটি স্বচ্ছ প্রতিফলন

পত্রসাহিত্য

যাহা অন্য কোনরূপ সাহিত্যিক ভঙ্গীতে অ-লভ্য। পত্রসাহিত্যে লেখকের অন্যান্য পরিচয়, তাঁহার কবি-খ্যাতি, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, দার্শনিক গূঢ়তত্ত্বের আলোচনা, তাঁহার জীবনাদর্শের বিশিষ্ট মতবাদ যতটা চাপা থাকে ততই ভাল। এখানে আমরা তাঁহার রাজবেশ অপেক্ষা রাখালবেশদর্শনেরই অধিকতর প্রত্যাশী। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে প্রকৃতি-লীলার যে অপরূপ কবিত্বময় বর্ণনা, অসীমের অনুভূতি, জীবন সম্বন্ধে গভীর মন্তব্য, তাঁহার নিজ কাব্যবিষয়ে আলোচনা আছে, তাহা আমাদের গদ্যসাহিত্যের পরম সম্পদ্; কিন্তু পত্রসাহিত্যের রসের সহিত এই সমস্ত গুরু-গম্ভীর বিষয় ও উচ্চচিন্তামূলক মনোভাব যে কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ তাহা সন্দেহস্থল। অনেকেই জানেন না যে, বার্কের ফরাসী-বিপ্লবের উপর যে বিপুলকায় রচনা, তাহার পত্র-সম্বোধনে আরম্ভ, কিন্তু এই আকৃতি-সাদৃশ্য সত্ত্বেও কেহই ইহাকে পত্রের পর্যায়ে ফেলিবেন না। তেমনি রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে চিঠিপত্রের অন্তরঙ্গ আত্ম-উদ্ঘাটন ও ক্ষুদ্র, খুঁটিনাটি খবরের ভিতর দিয়া একটা ঘরোয়া আবহাওয়াসৃষ্টি কতদূর সাধিত হইয়াছে তাহা বিবেচ্য। শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকই যে শ্রেষ্ঠ পত্রলেখক হইবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। বরং প্রতিভাশালী কবির আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁহার পত্র-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠতালাভের বিরোধী হইতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যে হোরেশ ওয়ালপোল, লেডি মেরি ওয়ার্টলি মণ্টাগু, কুপার প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক ও ল্যাম্বের মত খেয়ালী মেজাজের লোকই শ্রেষ্ঠ পত্রলেখক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটসের মত কবি সে সম্মান হইতে বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'-এ যে ব্যক্তিগত অংশ-টুকু ছেঁড়া গিয়াছে, হয়ত সেইটুকুর মধ্যেই আসল পত্ররস নিহিত ছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দুইটি ছোট মেয়েকে লেখা 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' এবং ছাপার উদ্দেশ্যে লেখা নয় এমন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট লেখা পত্র-সমূহই হয়ত তাঁহার ঘরোয়া রূপটি আরও স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলে। তবে রবীন্দ্রনাথের জীবন এমন অসাধারণ ছিল যে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। তাঁহার ব্যক্তিজীবন তাঁহার কাব্যজীবনের দিব্য-জ্যোতিতে এতটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, ঘরোয়া কথা অপেক্ষা কাব্যরহস্যমূলক অসীমতত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই তাঁহার জীবনের সত্যতার পরিচয় বহন করে। তাঁহার 'আত্ম-জীবনী' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার ব্যক্তিজীবনের বহির্ঘটনা অপেক্ষা তাঁহার অন্তররহস্যলীলা-দ্যোতনার প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে; অন্তর্লোকের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই বাহিরের ঘটনাগুলির যত-কিছু তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ সংগৃহীত এমন কতকগুলি রচনা আছে, যথা 'কেকাধ্বনি', 'নববর্ষা' 'শ্রাবণসন্ধ্যা', 'পাগল' প্রভৃতি—যেগুলিতে যুক্তিবাদ ও তথ্যালোচনার পরিবর্তে কবির একটি বিশেষ ভাবানুভূতি, ধ্যান-দৃষ্টির একটি অতর্কিত উৎক্ষেপ, স্বপ্নাতুর কল্পনার একটি বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই রচনাগুলি সম্পূর্ণ-রূপে মন্ময় ও আবেগধর্মী। ইহাদের ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্যের সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তেমনি 'লিপিকা' (১৯২২) ও 'পত্রপুট-এ (১৯৩৫) ও 'বনবাণী'-র গদ্যভূমিকায় আবেগ ও মননের যে মিশ্রিত রূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গদ্য বা কাব্য কাহার পরিমাণ বেশী তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গদ্যরীতি একেবারে সম্পূর্ণ কাব্যে রূপান্তরিত না হইয়া, কাব্যের ছন্দ-প্রবাহ, উচ্ছ্বসিত প্রকাশভঙ্গী ও কল্পনা-লীলার সংযোগে যে কাব্য-ধর্মিতার একেবারে শেষসীমা স্পর্শ করিতে পারে ও কাব্যের সম্পূর্ণ সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব-বাহনরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এই জাতীয় রচনা তাহারই নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ই প্রধান হইলেও, গদ্যশিল্পিরূপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রায় তুল্যমূল্য স্থানের অধিকারী। এই দ্বিবিধ মুকুট আর কোন সাহিত্যিকের শিরে সমান মর্যাদার সহিত পরানো যায় কি না সন্দেহ

আবেগমূলক গদ্যরচনা

সপ্তম অধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর কাব্য

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ও তাঁহার তিরোধানের পর বাংলা কাব্যের বিকাশ-ধারায় মোটামুটি তিনটি শাখা লক্ষ্য করা যায়—(ক) রবীন্দ্রানুসারী কাব্য; (খ) রবীন্দ্রপ্রভাবনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কাব্য; (গ) বিশেষ উদ্দেশ্য ও রচনারীতিসমন্বিত অতি-আধুনিক কাব্য। বর্তমান অধ্যায়ে এই তিনটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইবে ও জীবিত কবিসম্প্রদায়কে যথাসম্ভব বর্জন করিয়া পরলোকগত কবিদের রচনা-অবলম্বনেই কাব্যের গতি-প্রকৃতির স্বরূপ-নির্ধারণের চেষ্টা করা হইবে।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের তিনটি শাখা

ক—রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠী

(১)

এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫); যতীন্দ্র-মোহন বাগচি (১৮৭৭-১৯৪৮)—পরলোকগত কবিদের মধ্যে ইঁহাদের দুইজনকেই স্থান দেওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ নহে, যদিও রবীন্দ্র-আনুগত্য বিশেষভাবে প্রকট। ইঁহাদের কাহারও রবীন্দ্র-কল্পনার গভীরতা ও বিস্তার, রবীন্দ্র-মননের সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশশীলতা ও সর্বগামিত্ব ও রবীন্দ্র-শিল্পের অনবদ্য চারুতা দেখা যায় না। তথাপি মোটের উপর রবীন্দ্র-কাব্যের গাঢ় আবেশ, নিবিড় কল্পনানুভূতি অনেকটা ফিকে হইয়া ইঁহাদের মানসলোক ও ছন্দপ্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের বিরাট ক্ষেত্র ইঁহাদের রচনায় সঙ্কুচিত হইয়া গার্হস্থ্য জীবনের শান্তরসাস্পদ বর্ণনা ও হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যগৌরব-প্রচারণায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে। কল্পনায় যে প্রকার আন্তরিকতা আছে, সে প্রকার মহিমা নাই; সাধারণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইহা কচিৎ অসাধারণত্বের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। আবেগ প্রায়শই মৃদু ও শান্ত, কোথাও অসংবরণীয় উচ্ছ্বাস ও উদ্দাম গতিবেগে উধাও হয় নাই। ইহা ভক্তিতে মধুর, প্রেমে নিরুচ্ছ্বাস, আত্মনিবেদনে অকৃত্রিম, বাঙালীর সাধারণ জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। যেখানে ভাবোচ্ছ্বাস মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে,

করুণানিধান ও যতীন্দ্র বাগচির রবীন্দ্রানুগত্য

সেখানে কল্পনা-সমুন্নতির মধ্যে সচেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধনের লক্ষণ পরিস্ফুট। ছন্দ রবীন্দ্রানুকারী, কিন্তু ভাবের অনুবর্তনে স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত নহে। ইঁহারা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ঐতিহ্যানুগত মনোভাব ও পারিবারিক জীবনরসকে রবীন্দ্রকল্পনার দিব্যানুরঞ্জনের সুদূর অনুসরণে নূতনভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতিসৌন্দর্যমুগ্ধতা, স্বপ্নাবিষ্টতা, ভগবদ্-ভক্তি ও শান্ত-সংযত, আচারনিষ্ঠ, আদর্শপরায়ণ ও মমতাস্নিগ্ধ জীবনযাত্রার প্রতি একটা নিবিড় প্রীতি ইঁহাদের রচনার মূল সুর ও কবিধর্মের সার্থক বিকাশক্ষেত্র। ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন প্রবণতা রবীন্দ্রপ্রভাবজাত হইলেও ইহাতেই ইঁহাদের মৌলিক অনুভূতি ও প্রগাঢ় আবেগ রূপ পাইয়াছে। ভাষাভঙ্গীর অসমতা, সুন্দরের সঙ্গে সাধারণ ও সময় সময় উদ্ভটের মিলন এই জাতীয় কল্পনা-শক্তির ক্ষীণপ্রাণতা ও দৃঢ়তার অভাবের পরিচয়।

করুণানিধান

করুণানিধানের কবিতার মধ্যে কালিদাস রায় স্বপ্নমাধুরী ও মোহিতলাল রূপোল্লাসের অনুভব করিয়াছেন। উভয় উপাদানই তাঁহার কবিতায় বর্তমান, কিন্তু ইহাদের ভাব-নিবিড়তা ও গ্রন্থন-নৈপুণ্য সব সময়ে যে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধের উপর তাঁহার কল্পনা যে মায়াবরণ নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার বুনন খুব জমাট নহে; উহার শিথিল বয়নের ফাঁকে ফাঁকে ছদ্মবেশী যুক্তিশৃঙ্খলা ও বাস্তব জগতের স্থূল পরিবেশ লক্ষ্যগোচর হয়। এই দিকে স্বপ্নরসে চোখের উপর বাস্তব-বিস্মৃতির নিবিড় আবেশ নামিয়া আসে না, জাগ্রত চৈতন্য একেবারে ঘুমাইয়া পড়ে না। তাঁহার রূপের সূক্ষ্ম কারুকার্য সচেতন ইন্দ্রিয়বোধের নিদর্শন; কিন্তু এই রূপানুভূতি যেন কবির একটা বিচ্ছিন্ন কল্পনাবিলাস, ইহা একটা সর্বব্যাপী জীবনদর্শনের মর্যাদা লাভ করে নাই। মাঝে মধ্যে রেখায় ও রংয়ে অঙ্কিত ছায়াভরা ছবি আছে, কিন্তু এই চিত্রধর্মিতা কোন উন্নততর তাৎপর্যের বাহন হয় নাই। কখনও কখনও ছন্দের ঐশ্বর্যলীলার মধ্যে তাঁহার রূপোল্লাসের সঞ্চরণধ্বনি শোনা যায়; কিন্তু এখানেও একটা স্থির ও অভ্রান্ত শিল্পকুশলতার অভাব উল্লাসের অনিয়মিত মাত্রাহীনতাই সূচিত করে। সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় লঘু কল্পনা ও ছন্দ-চটুলতাও মাঝে মাঝে তাঁহাকে এক খেয়ালী, অবাস্তব সৌন্দর্যের প্রতি উন্মুখ করিয়াছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছন্দ হইতে ভাব অনুমিত হয়, ভাবের অনিবার্য প্রকাশরূপে ছন্দ প্রতিভাত হয় না। তাঁহার কাব্য-কুম্ভ তাঁহার হৃদয়-যমুনার নীরেই যে পূর্ণ হইয়াছে তাহা মনে হয় না; বরং তিনি যে নানা তীর্থের জলধারা

ইহাতে সংগ্রহ করিয়াছেন এই ধারণাই বলবৎ হয়। তাঁহার মনে কবির অনুভূতি আছে প্রচুর; শিল্পবোধ ও সিদ্ধি সে অনুপাতে কম।

যতীন্দ্রমোহন বাগচির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুগত্যের সঙ্গে তাঁহার কবিস্বভাবের একটি সহজ মিল ঘটিয়াছে; সুতরাং তাঁহার কবিতা নানামুখী প্রয়োগের বিভিন্ন পথে উৎক্ষিপ্ত না হইয়া একই ভাবকেন্দ্রে স্থির সংহত হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের বহু কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও তাঁহার রচনাভঙ্গীর মধ্যে একটি দৃঢ় নিজস্বতা ছিল, সুতরাং তাঁহার কল্পনায় ঊর্ধ্বগামিতার দুঃসাহস না থাকিলেও এবং উহা পরিচিত পরিবেশের মধ্যে সীমিত হইলেও ব্যর্থ অনুকরণের অসাফল্য ও শূন্যগর্ভ স্ফীতি তাঁহার কবিতায় বিশেষ দেখা যায় না। তাঁহার বিষয় সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ-মমতা-ভালবাসা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিসমূহকেই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রকাশরীতির ঋজুতা ও ভাবসন্নিবেশের সুসঙ্গতি ও স্বাভাবিকতা তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। আমরা সব সময় কবিদের নিকট মননের স্বকীয়তা, জীবনের মৌলিক অনুভূতির প্রত্যাশা করিতে পারি না। এক এক যুগের আবহে প্রতিভাবান কবির রচনা হইতে বিচ্ছুরিত এক সাধারণ ভাব-সমবায় পরিব্যাপ্ত থাকে ও প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী এই ভাবগুলিকে রূপ দেন। সুতরাং ভাবে মৌলিকতার অভাব, সাধারণ ভাণ্ডার হইতে সংগ্রহশীলতা কবির পক্ষে মারাত্মক দোষ নহে। ভাবস্বীকরণের মধ্যে সঙ্গতি ও প্রকাশসুষমা ও অনুভূতির অকৃত্রিমতা থাকিলে সে কাব্য প্রথম শ্রেণীর না হইলেও আদরণীয় হইবে। যতীন্দ্রমোহনের প্রেম ও নারীসৌন্দর্যবিষয়ক কবিতাসমূহে যুগোচিত ভাবোচ্ছ্বাস থাকিলেও স্বাভাবিক পরিমিতিবোধ ও অকৃত্রিম অনুভবের অভাব নাই—ইহাদের মধ্যে ভাবমত্ততার পদস্খলন ও মুখরভাষণ বিশেষ শ্রুত হয় না। তাঁহার পল্লীজীবন ও গার্হস্থ্য রসের কবিতাগুলিতেও অনুরূপ সংযম ও মিতভাষিতা দেখা যায়। এমন কি তাঁহার 'সাকি ও সরাব'-এ হাফিজের ভাবানুবর্তনের মধ্যেও ঋজু ও বলিষ্ঠ অনুভূতির পরিচয় মিলে। তাঁহার শেষ কাব্য 'মহাভারতী'-র (১৯৩৬) উপর রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র প্রভাব সহজে লক্ষ্যগোচর হইলেও ইহাদের কবিতাগুলির মধ্যে—যথা 'কর্ণ', 'দুর্যোধন', বিশেষত 'শবরীর প্রতীক্ষা'-য় চরিত্রসৃষ্টি ও সুকুমার ভাব-স্ফুরণের যে সার্থক নিদর্শন মিলে তাহা তাঁহার কল্পনা স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে পথের সন্ধান দিয়াছিলেন, কিন্তু পদক্ষেপের ছন্দটি তাঁহার নিজস্ব।

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২—) ও কালিদাস রায় (১৮৮৯—) এই কাব্যধারার শেষ দুই প্রতিনিধি। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় পল্লীপ্রীতি, বৈষ্ণবরসভাবুকতা ও নিরাভরণ ও সময় সময় নিরাবরণ কাব্যভাষাপ্রয়োগে সরল নীতিতত্ত্বপ্রবণতা এবং কালিদাসের কাব্যে প্রাচীন ভাবাদর্শের মর্মোৎসারিত সার্বভৌম মানবিক রসের উদ্বোধন ও সময় সময় শব্দৈশ্বর্যভারাক্রান্ত, অলংকারবহুল ভাষায় অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন মুখ্য সুররূপে অনুভূত হয়। তাঁহাদের কাব্য ভক্তিরসাপ্লুত, পূর্বস্মৃতিরোমন্থনাকুল পল্লীসংস্কৃতির শেষ আশ্রয়স্থলরূপে কাব্যাবেদনের অতিরিক্ত এক করুণ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া থাকিবে।

কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়

খ—রবীন্দ্রানুরাগী, অথচ কল্পনাস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট কবিগোষ্ঠী

(২)

এই শ্রেণীর কবির মধ্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—) প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত সমস্ত কবিই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের কবিতায় তাঁহারা রবীন্দ্র-প্রভাবিত না হইয়া স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবেরই প্রাধান্য—তিনি আবেগ ও ভাবালুতার চির-বিরোধী ও তীক্ষ্ণ মননশীল শ্লেষের কশাঘাতে বাংলাকাব্যে প্রচলিত রসার্দ্রতার উপহাস্য দিকটারই উদ্ঘাটন-প্রয়াসী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এমন কি সাহিত্যিক সহযোগিতা যতই ঘনিষ্ঠ হউক, রুচি ও কল্পনার দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রমথ চৌধুরী বিশেষ গীতিকবিতা লেখেন নাই; তিনি সনেট-রচয়িতারূপেই বাংলা কাব্যে স্থান পাইয়াছেন। সনেট এক ব্যঙ্গকবিতা ছাড়া অন্যান্য-জাতীয় কবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মননধর্মী; ইহার আঁট-সাট গড়ন, উচ্ছ্বাসাধিক্যের বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও স্বল্প পরিসরে ভাব-পরিণতির সম্পাদন সমস্তই সদা-সক্রিয় মননশীলতার মুদ্রাঙ্কিত। প্রমথ চৌধুরী আমাদের মুগ্ধ বা ভাববিহ্বল করতে চাহেন না, করিতে চাহেন তীক্ষ্ণ ভাষণে ও অপ্রত্যাশিত ভাবসন্নিবেশে চমকিত। তাঁহার

প্রমথ চৌধুরী

মনোঘুড়ি কবি-কল্পনার লাটাই-এ দৃঢ়বদ্ধ থাকিয়া কবির হস্তধৃত সূত্রের আকর্ষণে উচ্চতর ভাবাকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্বাধীনতা হইতে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে ও কল্পনার অতিরিক্ত আবেশে বুঁদ হইবার কোন সুযোগ পায় নাই। সুতরাং তাঁহার 'সনেট-পঞ্চাশৎ' রবীন্দ্রকল্পলোক হইতে স্বতন্ত্র ও উহারই পরিপূরক এক নূতন মনোরাজ্যের সন্ধান দেয়। বরং ভাবের দিক দিয়া রবীন্দ্র-বিরোধী ও কাব্যে অস্পষ্টতার প্রতিবাদকারী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাঁহার খানিকটা মিল আছে, যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের লঘু হাস্যচপলতার সহিত তুলনায় তাঁহার পরিহাসের মধ্যে গভীরতর মননিষ্ঠতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা বৈপরীত্যমূলক মৌলিকতার ছাপ পরিস্ফুট।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে গভীর রবীন্দ্রপ্রীতির সহিত বিবিধ নূতন পরীক্ষারত মানস কৌতূহলের বিরল সমন্বয় দেখা যায়। তাঁহার এই নানা প্রকারের কাব্য-কৃতির সংযোগবিন্দু ছিল ছন্দ-আবেগের সর্বাতিশায়ী মোহ। অনেক সময় মনে হয় যে ছন্দ তাঁহার কবি-কল্পনাকে অনুসরণ না করিয়া, কবিকল্পনাই ছন্দের দোলার বশবর্তী হইয়াছে। 'পালকির গান', 'ঝরনার গান', 'চরকার গান' প্রভৃতি লৌকিক ও প্রাকৃতিক জীবনের নানা স্বতঃউদ্ভূত ও অভ্যস্ত ছন্দ তাঁহার কাব্য-বীণায় ধৃত হইয়া তাঁহার কল্পনা ও অনুভূতিকে উত্তেজিত করিয়াছে, একটা ক্ষীণ সঙ্গীতরেশের সূত্রে বিবিধ রূপকল্প, জীবনের নানা ক্ষণ-চিত্র আকৃষ্ট হইয়া এক বিমিশ্র সত্তায় মূর্ত হইয়াছে। 'পালকির গান' ও 'দূরের পাল্লা' কবিতায় কবি ছন্দের জাদুশক্তিতে এক সূক্ষ্ম-অনুভূতি-গম্য, স্বপ্নমায়ামণ্ডিত রূপজগতের যবনিকা তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমরা যেন পরিচিত জগৎ ও কাব্যলোক হইতে বহুদূরে এক আদিম শৈশব-কল্পনার রাজ্যে, রূপকথার এক রহস্যপুরীর মধ্যে নীত হইয়াছি। এই গোধূলিছায়াচ্ছন্ন, রূপের চমকে মুহুর্মুহু চকিত, স্বপ্নাবিষ্ট প্রদেশই সত্যেন্দ্র-কল্পনা-বিকাশের সর্বাপেক্ষা অনুকূল প্রতিবেশ।

সত্যেন্দ্রকাব্যে কল্পনার লঘুলীলা

কবিকল্পনার যে দুইটি প্রকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ইংরাজীতে যাহাদিগকে Fancy ও Imagination বলে ও যাহাদিগকে কল্পনা-বিলাস ও কল্পনা-নিষ্ঠা এই দুই বাংলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে Fancy বা কল্পনার লঘু লীলাই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছড়ার ঝোঁকে, ছন্দের নৃত্যহিল্লোলে, অনভিজাত ও বিদেশ হইতে আহৃত চটুল শব্দের ধ্বনিময় প্রয়োগে, রং ও তুলির লঘু টানে, সৌন্দর্যের অনায়াসসিদ্ধ চিত্রাঙ্কনে, সর্বোপরি মানস উল্লাস ও

উত্তেজনার উপচাইয়া-পড়া উচ্ছলতায় তিনি তাঁহার কবিতায় এই কল্পনালীলাকে মনোহর, সহজ-অনুভব-বেদ্য রূপ দিয়াছেন। অলংকৃত, মন্থরগতি, অভিজাত ভীষণ ও গভীরতর কল্পনার অতন্দ্র নিয়ন্ত্রণ হইতে কবিতাকে মুক্তি দিয়া তিনি ইহাকে চলমান জীবনস্রোত, প্রাণের সহজ গতিবেগের সহিত এক ছন্দে গাঁথিয়াছেন—সৌন্দর্যের গন্ধমন্থর কুঞ্জবন হইতে বাহির করিয়া বাস্তব জীবনের ছুটিয়া-চলা, হোঁচট-খাওয়া, মৃত্তিকাস্পর্শে অশালীন উদ্দামতার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার হাতে কবিতার উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধির মান কিছুটা হ্রাস পাইলেও, কাব্যপরিধি যে অনেক বাড়িয়াছে জীবনের সহিত কাব্যের সংসক্তি যে আরও বহুমুখী ও নিবিড় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক যুগের রুচিবৈচিত্র্য ও তীব্রতর জীবন-কৌতূহলের দাবি মিটাইতে যে এই কবিতা আরও অধিক পরিমাণে সক্ষম হইয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য। শিশুচিত্তের অবাধ, তরল প্রবহমানতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচিত্র আবেদনের প্রতি ইহার নিবিড় মোহের সঙ্গে যদি কবিত্বশক্তির অতি-সহজে উত্তেজিত, উল্লাস-উন্মুখতার যোগ হয়, তবে সেই যোগফল কবি সত্যেন্দ্রনাথ।

সত্যেন্দ্রকাব্যে কল্পনা-সমুন্নতির অভাব

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে উচ্চতর কল্পনানিষ্ঠার (imagination) খুব বেশী সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় না। কল্পনার উচ্চ শৃঙ্গে তিনি অস্খলিত পদচারণা করিতে পারিতেন না—উচ্চগ্রামে সুর চড়াইতে গিয়া তাঁহার বারে বারেই ভাবের পদস্খলন ও ভাষার কৃত্রিম স্ফীতি ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার একদা-বহু-প্রশংসিত 'মহাসরস্বতী'-র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের যে কোন ভাবসমুন্নতিমূলক কবিতার তুলনা করিলে ইহার কষ্টকল্পনা, উল্লেখের (allusion) আতিশয্য, মননের পরিচ্ছন্ন ঋজুতার অভাব, এমন কি তাঁহার ছন্দেরও পারুষ্য ও সূক্ষ্ম অনুরণনের অপ্রাচুর্য সুস্পষ্ট হইবে। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্র, বংশীরবে উৎকর্ণ, নৃত্যপর হরিণকে দিয়া ভাবমহিমার রাজরথ টানাইলে হরিণের সঞ্চরণ-স্বাচ্ছন্দ্য ও রথের মসৃণ অগ্রগতি দুইই যে কতকটা ব্যাহত হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকালে বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে সমস্ত কৃতিত্বের জন্য কবি-সভায় তাঁহার সম্মানিত স্থান নির্দিষ্ট হইত, বর্তমান কালে উহাদের অনেকটা মূল্যহ্রাস হইয়াছে। তাঁহার রাজনৈতিক কবিতা, সাময়িক ঘটনা উপলক্ষে রচিত কবিতা, তাঁহার অভিনব ছন্দোবৈচিত্র্য-পরীক্ষামূলক কবিতা, তাঁহার মনন-প্রধান কবিতা এবং সর্বোপরি তাঁহার বিভিন্ন তীর্থের পূতবারিপূর্ণ কলসের ন্যায়

অনুবাদ-কবিতার সমকালীন প্রতিষ্ঠা এখন অনেকটা ম্লানরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে সাময়িকতার মধ্যে চিরন্তনতাকে আবিষ্কার করা সম্ভব, সদ্যোঢালা সোডার বোতলের ফেনা-স্ফীতির মধ্যে বিলম্বলব্ধ, স্থায়ী গুণবিশিষ্ট, রুচিকর স্বাদ অনুভব করা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের সেই গভীর-অনুপ্রবেশী কল্পনা ছিল না। যেমন গজে গজে মৌক্তিক নাই, তেমনি প্রতি বিষয়ে কাব্যসম্ভাবনা আশা করা যায় না। প্রথম কামড়ে কাঁচা ফলের যে অংশ রসাল বলিয়া মনে হয়, পূর্ণ পরিপক্কতায় পরিণত মিষ্টতা সব সময় সে অংশে নিহিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময় প্রথম কামড়ের, সদ্য-উচ্ছ্বসিত কাব্য-কোলাহলের ও ভাব-তারল্যের কবি; 'অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান'—সেখান পর্যন্ত তাঁহার কবিদৃষ্টি পৌঁছে নাই। তাঁহার দেশপ্রীতিমূলক কবিতার মধ্যে উচ্ছ্বাস যতটা, প্রজ্ঞার স্থিরতা ও বিচারের যাথার্থ্য ততটা নাই। দেশের অতীত গৌরবের প্রশস্তিরচনার মধ্যে সাম্প্রতিক অধঃপতনের কি সান্ত্বনা আছে তাহা বোঝা যায় না। আজকাল মানব-সমস্যার গভীরতর উপলব্ধির ফলে দেশপ্রেমের সমস্ত কবিতার মধ্যেই একটা তরল উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, তরুণসুলভ ভাববিলাস ও সার্বভৌম নৈতিক ভিত্তির অভাব অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত, ইংলণ্ডের Rule Britannia ও ফ্রান্সের বিপ্লব-প্রশস্তি এখন যেন কৈশোর-স্বপ্নের একটা বর্ণাঢ্য ভাব-মরীচিকার মতই মনে হয়; এ যেন সুদূর অতীতের একটা ছেলে-ভোলানো গান, যাহার শব্দ ও সুরের অজস্রতার মধ্যে অর্থ-দ্যোতনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে! সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই তাৎপর্যরিক্ততা যেন আরও প্রকট হইয়াছে। যে যুগে ব্রাউনিং-এরও মননশীলতা অস্বীকৃত, সে যুগে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানবিজ্ঞানমগ্নতা যে বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে না তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাঁহার অনুবাদ-কবিতার মধ্যেও মূলের ভাবানুসরণ যে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, মূল কবিতার সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা ও আবহ-সৃষ্টি ভাষান্তরের বাধা অতিক্রম করিয়া যে অক্ষুণ্ণ থাকে না, তাহা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃত কবিতা অনুবাদযোগ্য নহে, প্লেটোর এই নন্দনতত্ত্বের উক্তি ক্রমশই অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। তথাপি এই সমস্ত বিষয়ে প্রথম পথিকৃতের প্রশংসা তাঁহার অবশ্য-প্রাপ্য; তিনি বাংলা কবিতার অবিমিশ্র সৌন্দর্যচর্চাক্লিষ্ট শিল্পশালার বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সচল বায়ুপ্রবাহ-প্রবেশের জন্য যে নূতন নূতন জানালা খুলিয়া দিয়াছেন, সেই জানালাগুলির কারুকার্য খুব উন্নত রীতির না হইলেও, তাহাই তাঁহার স্থায়ী কীর্তিরূপে গণ্য হইবে।

সত্যেন্দ্র-কাব্যের মূল্য বিচার

সত্যেন্দ্রনাথ শুধু কবি হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নহেন, বাংলা কাব্যে একটা বিশিষ্ট প্রভাবরূপেও তিনি স্মরণীয়। রবীন্দ্র-কাব্য হইতে অতি-আধুনিক যুগের কাব্যের যে সুরপরিবর্তন, তাহার মূলে অনেকটা তাঁহারই প্রভাব। কাব্যে চলতি ভাষা ও কথ্য ভঙ্গী, হাল্‌কা সুর, দেশ-বিদেশ হইতে আহৃত নানা অপরিচিত শব্দের সুষ্ঠু ও নির্ভীক প্রয়োগ, নূতন নূতন ছন্দরীতির মাধ্যমে ভাবের সাবলীল, উল্লসিত প্রকাশ, জীবনের বহু নূতন বিভাগে, অনুভূতির বহু নূতন ক্ষেত্রে কাব্যসীমার প্রসার—আধুনিক কাব্যের এই সমস্ত প্রবণতা বহুলাংশে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তপ্রভাবিত। তাঁহার প্রকৃতি ও ঋতু-বিষয়ক কবিতার মধ্যে কোন বিশিষ্ট দর্শনের অনুভব-গভীরতা অপেক্ষা বর্ণধ্বনিময় জগতের প্রতি অতি-উন্মুখ রূপাকুলতা ও কল্পনা-বিলাসের রমণীয় লীলা বেশী দেখা যায়। এদিকেও সমকালীন কবিতা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সত্যেন্দ্রনাথেরই অধিক অনুগামী হইয়াছে। আধুনিক কবিতার যে প্রধান লক্ষণ ভাবগভীরতার পরিবর্তে কৌতূহল-বিস্তৃতি, কাব্যানুরঞ্জনের স্থলে জীবনরসের আস্বাদনবৈচিত্র্য, স্তব্ধ ধ্যানতন্ময়তার স্থলে গতিবেগের উন্মাদনা, প্রথাগত কাব্যরীতির পরিবর্তে সংলাপভঙ্গীর দ্রুতসঞ্চারী ভাবানুগামিতা—তাহা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপরীক্ষা হইতেই প্রধানতঃ উদ্ভূত। সুতরাং তাঁহার নিজের কবিতার যে শাশ্বত মূল্য তাহা ছাড়াও ভবিষ্যৎ কাব্যের রুচি ও মেজাজের প্রথম প্রবর্তকরূপেও বাংলা কাব্যে তাঁহার একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান থাকিবে।

সত্যেন্দ্রনাথে ভাবী বাংলা কবিতার আভাস

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষাও ব্যতিক্রমধর্মী কবি। তাঁহার ব্যতিক্রম সমসাময়িক রীতি ও ভাবাদর্শের এত সুস্পষ্ট ও নিঃসঙ্কোচ অস্বীকৃতি যে তাঁহার একক স্বাতন্ত্র্য কোন সমধর্মী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথের মেজাজ ও কবিদৃষ্টি এতই নিজস্ব ও অসাধারণ যে, ইহার অনুকারকরূপে বিশেষ কাহাকেও দেখা যায় না। কাব্যের বহুপ্রচলিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধকে তিনি সাধারণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও নিপুণ যুক্তিশৃঙ্খলার সাহায্যে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়াছেন। যে ভগবানের মঙ্গলময়তার উপর কবির উপজীব্য বিশ্ববিধান প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে তিনি বন্ধু বলিয়া ছদ্ম-অন্তরঙ্গতাপূর্ণ সম্বোধন করিয়া তাঁহার তথাকথিত ন্যায়নিষ্ঠা ও নীতি-নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি ক্ষুব্ধ অভিমান ও অনুযোগে নিজ অন্তরের অনির্বাণ জ্বালাকে মুক্তি দিয়াছেন। জীবনের আনন্দ, প্রকৃতির সৌন্দর্য-সুষমা, মানবের স্বাধীন

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বৈতমনোধর্মী কবি

মর্যাদা, তথাকথিত কোমল হৃদয়বৃত্তিসমূহের অকৃত্রিমতা—এক কথায় মানবজীবনে যাহা কিছু আদর্শস্থানীয় ও কাম্য, সমস্তই তাঁহার ব্যঙ্গের বিস্ফোরক আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রথম জীবনের তিনখানি কাব্যের—'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭) ও 'মরুমায়া'র (১৯৩০) মধ্য দিয়া যেন মরুবালুকার তীক্ষ্ণ সূচিসমাকীর্ণ, উত্তপ্ত, সর্বধ্বংসী বায়ুপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দুঃখবাদ ও নাস্তিকতার সর্বরিক্ত, অগ্নিবর্ষী রৌদ্রদহনের মধ্যেও যেন আমরা কবির অন্তরশায়ী গোপন ছায়াকুঞ্জের পরোক্ষ সন্ধান পাই। তাঁহার প্রতিবাদের মুখর অতিভাষণের মধ্যেই যেন আনুগত্য ও অনুরাগের একটা অস্বীকৃত নিদর্শন মিলে। যে কবি ভগবানকে সত্যসত্যই নস্যাৎ করিতে চাহে, সে তাহার সহিত এত কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে বসে না। নিন্দার আতিশয্য যে প্রণয়েরই ছদ্মবেশী রূপ, বিরাগ যে অনুরাগেরই উল্টা পিঠ, ঐকান্তিক মিলনাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাই যে রূঢ়তম প্রত্যাখ্যানের ছলনা আশ্রয় করে—এই মনস্তাত্ত্বিক সত্য যতীন্দ্রনাথের কবিতায় উদাহৃত হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণবসাধনার রসলীলাকে আপাততঃ প্রত্যাখ্যান করিলেও উহার অভিমান-তত্ত্বটি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আদি-রচনার মরুমত্ততা যে আসলে বাংলার অন্তর-লোকের চিরন্তন শ্যামলিমাকে আহ্বানের একটা কৌশলমাত্র, ইহা প্রথম প্রথম বোঝা না গেলেও পরে স্ফটিক-স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনোধর্ম ও কবিধর্ম উভয়ত্রই এই দ্বৈতভাব পরিস্ফুট।

সাধারণতঃ যে সমস্ত কবি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের মধ্যে উচ্চতর কাব্য-কল্পনা ও সৌন্দর্যানুরাগের অভাব দেখা যায়। ইংরেজী কাব্যে ড্রাইডেন, পোপ ও বাংলা কাব্যে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা হাস্য-পরিহাসে, আঘাত-প্রত্যাঘাতে যতটা নিপুণ ছিলেন, সূক্ষ্ম ভাবের উদ্বোধনে ও আদর্শ সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ততটা প্রবণতা দেখান নাই। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এই সাধারণ কাব্যনিয়মের ব্যতিক্রম। শ্লেষাত্মক মন্তব্য ও যুক্তিপরম্পরা-সন্নিবেশেও তিনি এমন অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যপিপাসী মনের পরিচয় দেন যে, সৌন্দর্যানুভূতির অভাবই যে তাঁহাকে ব্যঙ্গ-বিরূপতার দিকে পরিচালিত করিয়াছে এরূপ ধারণা আমাদের জন্মে না। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছাই-চাপা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে ছড়াইতেই তিনি আমাদের সম্মুখে রূপানুরাগের রংমশাল প্রজ্বালিত করিয়াছেন। যাঁহার শ্লেষাভিঘাত হইতে

চেরাপুঞ্জীর থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ?

অথবা

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যু-মদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।

অথবা

রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙীন বারাঙ্গনা

ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন পংক্তির কল্পনারাগরঞ্জিত মণিদীপ্তি বিকীর্ণ হয়, তিনি যে রূপান্ধতার ও আদর্শবিমুখ মনোভাবের জন্য ব্যঙ্গের উগ্র ঝাঁঝকে বরণ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। আবার সৌন্দর্যের ছবি আঁকিতে আঁকিতে, ভাবোচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া, হঠাৎ এক তুলির টানে, বিপরীত এক সুরের রেশে কবি সমস্ত কবিতারই আবেদন বদলাইয়া দিয়াছেন—রূপমুগ্ধতায় যাহার আরম্ভ হইয়াছিল তির্যক ব্যঞ্জনার বক্র হাসিতে তাহা অতর্কিত কৌতুকরসে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সৌন্দর্যের খোলসে ব্যঙ্গের শাঁস অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এক অভিনব মিশ্ররস উৎপন্ন হইয়াছে। এ সমস্তই প্রমাণ করে যে, যে কোন কারণেই হউক—সম্ভবতঃ বিদ্রোহের উগ্র নেশায়, প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণার অত্যুৎসাহে, নিজ বিদ্রূপদক্ষতা-প্রকাশের তীব্র প্রেরণায়, হয়ত বা কোন বিরূপ অভিজ্ঞতার অন্তর্গূঢ় প্রভাবে—যতীন্দ্রনাথের সহজাত সৌন্দর্যানুরাগ ও আদর্শপ্রীতি জীবন-অস্বীকৃতি ও নেতিবাদের জ্বালাময় বিরাগে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই মরুচারণার মধ্যেও যে তিনি সময় সময় শ্যামলের স্বপ্ন দেখিতেন তাহারও ইঙ্গিত একেবারে অপ্রাপ্য নহে। তাঁহার প্রখররৌদ্রদগ্ধ জীবন-দিগন্তে মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ মেঘমায়ার ক্ষণিক আবির্ভাব অনুভব করা যায়। জীবনে আদর্শানুভূতির দুই প্রধান উৎসকেই—প্রেম ও প্রকৃতিসৌন্দর্য—তিনি তাঁহার সমস্ত বোধশক্তি দিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে এমন একটা আবেগের আতিশয্য আছে, ব্যঙ্গের সুরের মধ্যে এমন এক উচ্চকণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ উদ্ঘোষিত প্রত্যয়-দৃঢ়তা অনুভব হয়, যাহাতে কবির অন্তরের আত্মদ্বন্দ্বের আভাস মিলে। এ যেন শুধু ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নহে, কবি মনে-প্রাণে যাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন, সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও অনলোদ্গার। অনুরাগ অভিমানের মধ্যস্থতায় বিরাগে রূপান্তরিত না হইলে প্রতিবাদের ভাষা এত তীক্ষ্ণ ও মুখর হইয়া উঠে না।

যতীন্দ্রনাথের আত্মদ্বন্দ্ব

প্রথম পর্বের রচনায় যাহা অস্ফুট আভাসরূপে বর্তমান ছিল, দ্বিতীয় পর্বে তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। 'সায়ম্' (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮) ও 'নিশান্তিকা'য়-

(১৯৫৭) যতীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় এমন একটা বিপরীতমুখী রূপান্তর ঘটিয়াছে যাহা সকলের নিকটই দিবালোকের মত পরিষ্কার। অভিমানের ঘন মেঘ সরিয়া গিয়া ঈষৎ অনুতাপ-ম্লান বিশ্বাসের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা কবিচিত্তকে সজল মায়ায় অভিষিক্ত করিয়াছে। যে প্রেম ও যৌবনাবেশকে কবি প্রথম জীবনে সরাসরি অস্বীকার করিয়াছিলেন, এখন তাহাকে ঘিরিয়াই কত মধুর পূর্বস্মৃতিরোমন্থন, কি অপরূপ কল্পনাবিলাস, অনুশোচনা ও ভ্রান্তিস্বীকারের কি করুণ গুঞ্জন, ফিরিয়া পাইবার কি ব্যাকুল আকৃতি উচ্ছ্বসিত হইয়াছে! যে বন্ধুকে তিনি তীক্ষ্ণ ও অবিরাম শ্লেষে জর্জরিত করিয়াছিলেন, দুরন্ত অভিমানে তিনি যাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়াছিলেন, এখন তাহার সহিত অন্তরঙ্গতা লাভ করিতে কি প্রাণঢালা আগ্রহ, তাহার স্বরূপ-উপলব্ধিতে কি কুণ্ঠিত আনন্দ!

যতীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের কবিতা রোমাণ্টিক ধর্মী

শেষের এই তিনখানি কাব্যে তাঁহার ও তাঁহার প্রিয়ার অপগত যৌবন ও তিরোহিত দেহ-সৌন্দর্যের জন্য কি মর্মান্তিক আক্ষেপ প্রায় প্রতি কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তাঁহার পূর্বজীবনের বিরক্তি ও বিশ্ববিধানের প্রতি অনাস্থার প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রেম ও যৌবনের প্রতি অতি-অনুরাগই তাঁহাকে তাহাদের ক্ষণিকতার জন্য এরূপ নেতিবাদী করিয়া তুলিয়াছিল। এই অনুভূতিই নানা রূপে, নানা ছন্দে, রোমন্থনের নানা ভঙ্গীতে তাঁহার শেষের কাব্যগুলিকে এক সর্বব্যাপী বিলাপ ও হাহাকারের গুঞ্জনে অনুরণিত করিয়াছে। এইগুলিতেই তাঁহার সমস্ত ছদ্মবেশ দূর হইয়া তাঁহার কবিস্বরূপ ও ব্যক্তিস্বরূপ উন্মোচিত হইয়াছে। বিলাপের অশ্রুবাষ্প কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটায় বিচিত্র বর্ণে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। 'বকুলতলীর ঘাটে', 'মনোরমা,' 'প্রত্যাবর্তন,' 'শপথভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় কবির যে পরিচয় ফুটিয়াছে তাহা একান্ত রোমাণ্টিকধর্মী ও রূপবিহ্বল। তাঁহার অতৃপ্ত রূপপিপাসা এই কবিতাগুলিতে মুদিত পদ্মের নিকট ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় একই প্রশ্নেরই অশ্রান্ত পুনরাবৃত্তিতে, একই আক্ষেপের বিচিত্র কল্পনাময় রূপান্তরে ধ্বনিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'বকুলতলীর ঘাটে' কবিতায় কবি প্রেমের যে স্মৃতিসমাকুল, অনায়ত্ত সাধনার রূপক-কল্পনাকে রূপ দিয়াছেন তাহা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রেমানুভূতির সমগোত্রীয়। এখানে তিনি রবীন্দ্রানুসারী কবিরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন; কেবল তাঁহার পূর্বতন সংশয়ের জন্য যে খেদ, প্রেম ও সৌন্দর্যের বিলম্বিত উপলব্ধির জন্য আঁকড়াইয়া ধরিবার যে আকুলতা, ভ্রান্তি-

নিরসনের অনুবর্তী যে আত্মধিক্কার, তাহাই রবীন্দ্রনাথের স্থির দার্শনিক প্রত্যয়ের সহিত তুলনায় তাঁহার এই জাতীয় কবিতাকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ এক দিক দিয়া মোহিতলালের সমধর্মী; উগ্র দেহাত্মবাদ, তীব্র যৌবন-ভোগলালসা মোহিতলালের ন্যায় তাঁহার কবিতারও একটি মূল সুর। অবশ্য কাব্যকলার ইঙ্গিতধর্মী প্রয়োগে, স্মৃতিচারণা ও বিরহদুঃখের ভাবতন্ময়তার জন্য যতীন্দ্রনাথের কাব্যের এই স্থূল উপাদানটি অনেকটা সূক্ষ্মতর রূপে উদ্বর্তিত হইলেও ইহার মৌলিক প্রকৃতিটি সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হয় নাই। তাঁহার অবরুদ্ধ প্রেমাবেগ ও যৌবন-কামনা যে কত তীব্র ও নিঃসঙ্কোচ ছিল তাহা তাঁহার শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির শতধারে উৎসারিত খেদোচ্ছ্বাসের মধ্যেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কবিতায় ফিরিয়া ফিরিয়া দেহসৌন্দর্যের স্তব-স্তুতি উদ্‌গীত হইয়াছে; যৌবন-লালসার অতৃপ্তি আদর্শ-কল্পনার সমস্ত স্তোক-সান্ত্বনাকে বিদীর্ণ করিয়া গিরিনদীর দুর্বার বেগে নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার উপমার আতিশয্য-স্ফীতি, যৌবনাতিক্রান্ত দেহের বাস্তব জীর্ণতাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কল্পনা ও মোহের নিবিড় জালবয়ন, যৌবনকে ফিরিয়া আসিবার জন্য অশ্রুবিহ্বল আহ্বান ও শেষ পর্যন্ত পুত্র-কন্যার যৌবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এই নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতিতে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভের করুণ প্রয়াস—সবই নিঃসংশয়িতভাবে তাঁহার কবি-মানসের দেহাকুলতার পরিচয় বহন করে। মোহিতলালের কবিতায় যে দেহবোধ একটি দার্শনিক প্রত্যয়ের স্থির, নিরুচ্ছ্বাস সূত্র-সংক্ষিপ্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, যতীন্দ্রনাথে তাহাই সমগ্র প্রকৃতিমথিত এক ভূমিকম্পের বিপর্যয়ে, কল্পনা ও আবেগের এক দুরন্ত অথচ শিল্পশাসিত উচ্ছ্বাসে, বুকফাটা হাহাকারের এক ছন্দসুষমাগ্রথিত ধ্বনিদেহে রূপ লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ হয়ত যতীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ভ্রান্তির জন্য অনুশোচনা। মোহিতলালে যাহা জীবনের স্বরূপতত্ত্ব, আত্মিক চেতন-অভিমানের চিরন্তন আধাররূপ অমৃতকলস, যতীন্দ্রনাথে তাহাই উপেক্ষিত, অনাদৃত সত্যের অতি-বিলম্বিত আবিষ্কার, মূঢ় অন্ধতা ও অভিমানের ব্যর্থ প্রায়শ্চিত্ত। মোহিতলালের নিকট যাহা রূপময়, মূর্তিদেউলে অধিষ্ঠিত, পৃথিবীর বাস্তব ও কবিচেতনাসমর্থিত সত্য, যাহাকে তিনি চোখ মেলিয়া ও সহজ অনুভূতির বলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যতীন্দ্রনাথ তাহাকেই দেখিয়াছেন অনুতাপ-আবিল দৃষ্টিতে, অশ্রু-পারাবারের সমস্ত অশান্ত আলোড়নের ব্যবধানবাধা কাটাইয়া।

যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের দেহাত্মবাদের তুলনা

উপমার মুকুরে কবিমানসের এই আবেগমত্ততা অতিরিক্ত বর্ণোচ্ছলতায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রিয়ার যৌবনলালিত্যচ্যুত তনু তাঁহাকে স্মৃতিময় কানুহীন বৃন্দাবনের উপমা স্মরণ করাইয়াছে। যে বৃন্দাবন বৈষ্ণবরসলীলার দিব্য আধার, যাহার অধ্যাত্মসত্তা সমস্ত ভৌগোলিক সীমার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ ভাবলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রিয়ার রূপহীন, জরালুলিত দেহের উপমানরূপে তাহার প্রয়োগ—প্রমাণ করে যে পার্থিব প্রেম ও প্রেয়সীর অঙ্গকান্তি তাঁহার অনুভূতিতে কি অসাধারণ মূল্য-গরিমায় প্রতিভাত হইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কল্পনার ঊর্ধ্বায়নের, বস্তুর ভাবরূপে উন্নয়ন ব্যতীতই দৈহিক রূপযৌবন কবির চক্ষে কি অধ্যাত্মকল্প মোহাঞ্জন লেপন করিয়াছে! 'মনোরমা' কবিতায় কবি অধীর আগ্রহে বার্ধক্যের ত্রিবলী-অংকিত, লোলচর্ম প্রিয়াদেহে কেবল যে শাশ্বত প্রেয়সীর বিদেহী ভাবসত্তা আবিষ্কার করিতে উন্মুখ তাহা নহে, তাহার লুপ্ত যৌবনলাবণ্য প্রত্যক্ষ করিতেও সমভাবে ব্যগ্র। বস্তুত আদর্শানুভব এখানে গৌণ; পলায়িত যৌবনের রূপের ঝলকই তাঁহার প্রত্যক্ষভাবে ও উগ্রভাবে কাম্য। উহার অপ্রাপনীয়তাই তাঁহাকে আদর্শৈষণার ছলনার আশ্রয়গ্রহণে প্রণোদিত করিয়াছে। এখানে আদর্শ কোন উচ্চতর ভাবপ্রেরণা নহে, ইন্দ্রিয়স্পর্শবঞ্চিত কামনার স্মৃতি-অনুধ্যান। 'সায়ম্' কাব্যের 'মন্ত্রহীন' কবিতায় কবি ভাবাতিরেকের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন। এখানে তিনি প্রিয়াকে মন্ত্রগুরুর আসনে বসাইয়া তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠতম জীবন-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বিরহ-খিন্না রাধিকার মদনের প্রতি অনুযোগ, হরভ্রমে তাহার প্রতি অস্ত্রক্ষেপ না করিবার আবেদন যে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানতন্ত্রে দীক্ষিত, সংশয়বাদে শ্লেষতীক্ষ্ণ কবির কণ্ঠে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে ইহা অপেক্ষা ভাবোন্মত্ততার আর কি প্রকৃষ্টতর পরিচয় কল্পনা করা যাইতে পারে? বৈষ্ণবভাবতন্ময় চণ্ডীদাসের কণ্ঠে রামীর প্রতি যে অপরূপ স্তব—"তুমি বেদমাতা গায়ত্রী" ধ্বনিত হইয়াছিল, প্রতিবেশ-আনুকূল্য-রহিত, ধর্মসাধনার অমোঘ প্রত্যয়হীন আধুনিক কবির রচনায় তাহারই প্রতিধ্বনি এক অভিনব তান্ত্রিক সহজিয়াবাদের প্রবর্তন, এক অভাবনীয় অধ্যাত্ম-আবেগের মুক্তি বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং যতীন্দ্রনাথের শ্লেষাত্মক সংশয়বাদ যে তাঁহার সুকোমল-অনুভূতি-আর্দ্র অন্তরের নির্মোক মাত্র, তরণী সেনের কাটা মুণ্ডের রামনাম করার মত তাঁহার যৌবনোত্তীর্ণ অনুভব-কোষ যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রেম-যৌবনের মহিমাকীর্তনে বিভোর তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত। সংশয়বাদী, ছদ্মাভিনয়নিপুণ কবির

যতীন্দ্রনাথের শ্লেষ ও সংশয়বাদের অন্তরালে প্রেম ও ভোগবাদের ফল্গুধারা

সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা সংশয়-নিরসন ঘটিলেও তাঁহার কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার সুবিধা হইবে।

(৩)

মোহিতলাল মজুমদার কবি ও সাহিত্য-সমালোচক এই উভয়রূপেই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। 'স্বপন-পসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্তগোধূলি' (১৯৪১) ও 'ছন্দ-চতুর্দশী' (১৯৫১) এই কয়খানি কাব্যগ্রন্থে তাঁহার প্রায় সমুদয় কবিতাই সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার কবিতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত স্বল্প, কিন্তু এই সংখ্যাল্পতা প্রেরণাধারার ক্ষীণতা সম্বন্ধে যে সংশয় জাগায়, তাহা তাঁহার পরিণত শিল্প-কৌশল, রচনারীতির ব্যক্তিময় বৈশিষ্ট্য ও মননের প্রসার ও গভীরতার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হয়। তিনি শেষজীবনে কাব্য অপেক্ষা সমালোচনার প্রতিই অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। মনে হয় যে, কাব্যে তাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ উৎকর্ষের পরিচয় সত্ত্বেও তাঁহার অতিরিক্ত ব্যক্তিকতা ও বিশিষ্ট জীবনবাদের জন্য ইহা বাংলা কাব্যের উপর স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার সমালোচনা, তাঁহার রুচি ও অনুরাগ-বিরাগের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হইলেও এবং নৈতিক ও সামাজিক ফলাফলের প্রতি অতি-সচেতনতার জন্য তাঁহার গ্রহণশীলতার উদারতাকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিলেও, চিরন্তন মূল্যে অধিষ্ঠিত হইয়া সাহিত্য-বিচারের ভবিষ্যৎ মানদণ্ড ও নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিবে এই অভিমতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহের কারণ নাই।

কবি অপেক্ষা সমালোচক মোহিত-লালের শ্রেষ্ঠত্ব

মোহিতলালের কাব্যে দেহবাদপ্রবণতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা যতীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পার্থক্যনির্ণয়প্রসঙ্গে পূর্বেই করা হইয়াছে। তিনিই বোধ হয় আধুনিক বাংলা কাব্যে ক্লাসিকাল বা শ্রেষ্ঠ-ঐতিহ্যপন্থী ও নির্মাণকুশলী রীতির প্রধান উদাহরণ। তাঁহার কবিতায় শিথিলতা বা অনিয়ন্ত্রিত ভাবোৎসারের বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। প্রতিটি পংক্তির বিন্যাস ও স্তবক-সমাবেশে অতিযত্নশীল শিল্পীর অখণ্ড মনোযোগ সর্বত্র পরিস্ফুট—কবিতা-নির্মিতির মধ্যে ভাস্কর্যরীতির দৃঢ়তা ও সংহতি সুস্পষ্ট। মনে হয় যেন প্রতিটি পংক্তি তরল কালিতে কলম ডুবাইয়া, দ্রুতহস্তে, সহজস্ফূর্ত প্রেরণার বশে লেখা নহে, বাটালির দ্বারা পাথর

মোহিতলালে ক্লাসিকাল-ভঙ্গী ও রোমান্টিক ভাবের সমন্বয়

কুঁদিয়া বর্ণমালার অক্ষরের ন্যায় একক স্বাতন্ত্র্যে ক্ষোদিত। লেখকের শিল্পসাধনার বিপুল প্রয়াসের সঙ্গে পাঠকের ভাবতাৎপর্য-গ্রহণের জন্য মস্তিষ্ক-চালনার পরিমাণ প্রায় সমমাত্রিক। অথচ এই আয়াস-সাধ্য রচনার মধ্যে ভাবের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, ছন্দের ধীর-মন্থর পদবিন্যাস, কবির অন্তরানুভূতির শৃঙ্খলাবদ্ধ গভীরতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রোমাণ্টিক ভাবের অভিনবত্ব ও মৃদু উত্তেজনার সহিত ক্লাসিকাল প্রকাশরীতির সংযম ও অর্থবহতার সার্থক সমন্বয় মোহিতলালের কাব্যে উদাহৃত হইয়াছে।

মোহিতলালের কবিতায় লঘু কল্পনাবিলাসের বিশেষ নিদর্শন নাই। তাঁহার মনোভঙ্গী এমনই অটুট গাম্ভীর্য ও গভীর মনন-কল্পনার বর্মাবৃত যে, সত্যেন্দ্রনাথ বা করুণানিধানের ন্যায় লঘু বা চটুল সুর ঠিক তাঁহার কবিপ্রকৃতির স্বধর্ম নহে। মাঝে মধ্যে 'সিউলির বিয়ে' বা 'নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর' প্রভৃতি কবিতায় তিনি খানিকটা হাল্‌কা চাল ও খেয়ালখুশি-মাফিক মুসলমানী শব্দ-সম্ভারের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ফল সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক হয় নাই। তাঁহার মত সদাজাগ্রত কবিমানস স্বপ্নাবেশের ক্ষণবিস্মৃতিতে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারে না। তাঁহার এই জাতীয় প্রচেষ্টা আমাদিগকে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের আক্ষরিক অর্থের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার ক্লাসিকাল সংযম ও বাহুল্যবর্জন-চেষ্টা সত্ত্বেও সময় সময় তিনি অতি-ভাষণের দোষ এড়াইতে পারেন নাই। শোপেনহওয়ারের উদ্দেশ্যে লিখিত 'পান্থ' প্রভৃতি অতিমননশীল কবিতা উহাদের অর্থগাঢ়ত্ব ও অতি-পল্লবিত বিস্তারের জন্য মাঝে মধ্যে ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। তাঁহার ছন্দোগ্রথিত গাম্ভীর্যপূর্ণ শব্দপরম্পরা ও সুদীর্ঘ স্তবকশ্রেণী আমাদিগকে প্রাচীন রাজন্যবর্গের হস্তিযূথসমন্বিত, বর্ণবহুল-ধ্বজদণ্ডশোভিত বিরাট শোভাযাত্রা-সমারোহের মন্থর গতির কথা মনে পড়ায়। এখানে শক্তির অবিসংবাদিত পরিচয় আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শক্তিমত্তার অতিসচেতন শ্রেষ্ঠত্ববোধও আমাদের মনে কিছুটা অস্বস্তি জাগায়; কবির প্রতি সম্ভ্রমবোধ তাঁহার সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গতাস্থাপনের অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাঁহার শব্দাড়ম্বরপীড়িত ভাবধারা উপলব্যাহতগতি শীর্ণ নদীর ন্যায় ধীরে ধীরে বহিয়া যায়, অনুকূল স্রোতোবেগে আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। আমরা তাঁহার শঙ্খধ্বনিবৎ গভীর ছন্দ-স্বননে অভিভূত হই, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাঁহার কবিতার জাদুর নিকট আপনাদিগকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না।

মোহিতলালের নিবিড় মনন-কল্পনায় প্রগাঢ় গাম্ভীর্য

মোহিতলালের বলিষ্ঠ মনন ও ভাস্কর্যোপম আঙ্গিকগঠন এক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী সার্থক হইয়াছে—তাহা সনেট-রচনার ক্ষেত্র। এই সনেটের পদ-বিন্যাসে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। গীতকবিতাতে যে মননভারক্লিষ্ট মন্থরতা পীড়া দেয়, সনেটে তাহাই স্বাভাবিক ভাবছন্দরূপে পাঠকের অবিমিশ্র প্রশংসা ও রসোপভোগের অভিনন্দন লাভ করে। বস্তুত মোহিতলালের ক্লাসিকাল গঠনশিল্প, সুবিন্যস্ত ভাবসজ্জা, জীবন-সত্যপ্রকাশের বলিষ্ঠ ভঙ্গী ও ছন্দের ভাবনা-নিয়ন্ত্রিত, অলক্ষ্যপ্রায় প্রবাহ এই যুগের অন্যান্য কবির আঙ্গিকশিথিলতা, ভাবের অজস্র উৎসার ও ছন্দোবিলাসের আতিশয্যের একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম ও মননদৃপ্ত প্রতিবাদ। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাতেই হীরকের উপাদান-দৃঢ়তা ও দ্যুতি উভয় গুণই বর্তমান। জনপ্রিয়তার মোহে, সমকালীন রুচির অনুবর্তনে, রাজনৈতিক উত্তেজনায়, কবি-সুলভ ভাবানুরঞ্জনের সুলভ প্রয়োগে, ছন্দের আবেশময় ঝংকারে জীবনপ্রজ্ঞার নিমজ্জনে, শ্লেষাত্মক আক্রমণের উগ্র ঝাঁঝে আমাদের বাঞ্ছিত ক্ষোভের তৃপ্তিসাধনে তিনি কাব্যের যথার্থ আদর্শ, নিরপেক্ষ জীবনানুভূতি ও সৌন্দর্যসৃষ্টি হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই আক্রমণাত্মক উগ্রতা তাঁহার সমালোচনায় আছে, কিন্তু কবিতায় নাই। তাঁহার প্রকৃত সমধর্মিতা ইংরেজ কবিদের মধ্যে ম্যাথিউ আর্নল্ডের সঙ্গে; সুইনবার্নের সহিত দেহবাদের মহিমা-খ্যাপনে খানিকটা ভাবগত মিল থাকিলেও, কাব্যরীতির দিক দিয়া কোন মিল নাই। মোহিতলালের কবিতার সহিত তাহার বিশিষ্ট জীবনবাদ ও গভীর মননপুষ্ট মানস গঠনের, অভিজাত-চিত্তের অতি-দুর্লভ রসরুচি-সমর্থনের এত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে তাঁহার প্রভাব-স্বীকরণ ভবিষ্যৎ কবির পক্ষে মোটেই সুসাধ্য নহে। তাঁহার ভঙ্গীর অনুকরণ হয়ত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সামগ্রিক মানস সংস্থা অননুকরণীয়।

মোহিতলালের সনেটের শ্রেষ্ঠত্ব

মোহিতলালের সমালোচনার মধ্যেও এই মানস আভিজাত্য, সহানুভূতির কঠোর-বেড়া-দেওয়া স্বল্পপরিসরতা ও অনুকূল ক্ষেত্রে নিগূঢ় মর্মানুপ্রবেশের ছাপ সুস্পষ্ট। উনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যে যাঁহারা নবজাগরণের প্রতীক, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের নূতন ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়া নবযুগের কবিতার স্রষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিত, মোহিতলালের রসবিচার ও মূল্যায়ন প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অনুশীলিত হইয়াছে। তাঁহার মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সমালোচনা এই দুইজন যুগন্ধর সাহিত্যিকের ভাবপ্রেরণার

সমালোচক মোহিতলালের মধুসূদন ও বঙ্কিম-মানস বিশ্লেষণের অন্তর্দৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য

উপর যুগমানসের প্রতিফলনের অভিনব আবিষ্কারমূলক আলোকপাত করিয়াছে। তাঁহার কৌতূহল প্রধানতঃ আরোপিত হইয়াছে রচনাশিল্পের উপর নহে, যে মানস অনুভূতি এই শিল্পরূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে তাহারই উপর। রচনার শিল্পোৎকর্ষ-বিচারে নহে, ভাবের নিগূঢ় উৎস-অনুসন্ধানেই তাঁহার মুখ্য আগ্রহ। রাবণ ও মেঘনাদ-চরিত্র-পরিকল্পনায় মধুসূদনের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা, যুগপ্রতিবেশ-প্রভাবিত আত্মভাবের উৎক্ষেপ কিরূপ ক্রিয়াশীল, রাবণের ও সাধারণত রাক্ষসগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার নিয়তিবাদের কিরূপ পরোক্ষ পরিচয় উদ্ঘাটিত, তাহাই তাঁহার বিশেষ জিজ্ঞাসার বিষয়। রাবণ মধুসূদনের ব্যক্তিসত্তারই প্রতিচ্ছবি, তাঁহার আত্মারই দ্বিতীয় প্রকাশ। রাবণ শিশুর ন্যায় সরল, ঋজুপ্রকৃতি, শিশুর ন্যায়ই পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে উদাসীন, শিশুর ন্যায়ই হাত বাড়াইয়া সমস্ত ভোগ্য বস্তুকে লাভ করিতে চাহে; কামনা পূর্ণ না হইলে শিশুর মতই নির্বিচারে অভিমানপ্রবণ ও ক্রন্দনশীল। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মানুসন্ধান যাহাকে নিয়তির নিষ্করুণ আঘাতের জন্য প্রস্তুত করে নাই, তাহার উপর সেই আঘাত অপ্রত্যাশিত বলিয়াই যে কত মর্মান্তিক তাহা রাবণের চরিত্রে উদাহৃত। মধুসূদন ও রাবণ উভয়েই সমপ্রকৃতি, উভয়েই ভাগ্যের অবিচ্ছিন্ন দাক্ষিণ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, উভয়েই অদৃষ্টের বিরূপতার জন্য একেবারে অপ্রস্তুত। যখন জীবনব্যাপী আশাবাদকে চূর্ণ করিয়া দৈবের নিদারুণ আঘাত আসিয়া পড়ে, তখন উভয়েই প্রায় এক সুরে কাঁদে; মধুসূদন বলেন "আশার ছলনে ভুলি", আর রাবণ বলে "কি পাপে, দারুণ বিধি, লিখিলা এ দুঃখ তুমি রাবণের ভালে।" মহাকাব্যের বিশাল নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরালে ব্যক্তিচিত্তের এই নিগূঢ় ক্রন্দন, পৌরাণিক শোকসমুদ্রে কবির নিজের চোখের দুইফোঁটা অশ্রুজল-সংযোজনার রহস্য মোহিতলাল অনাবৃত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও তাঁহার জিজ্ঞাসা একই প্রকারের। তাঁহার উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসে, তাঁহার পাত্র-পাত্রীর আচরণে ও চরিত্র-বিকাশে বঙ্কিমমানস কোন্ জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছিল, নারী-পুরুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে সনাতন পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পর-নির্ভর রহস্যলীলার কোন অধ্যায় আভাসিত—এই নিগূঢ় জীবন-জিজ্ঞাসাই সমালোচকের বিশেষভাবে কাম্য। বঙ্কিমের উপন্যাসের বহিরবয়বের পিছনে তাঁহার অন্তরপ্রেরণার এক সূক্ষ্ম মানচিত্র-অঙ্কনই মোহিত-লালের উদ্দেশ্য। ইহাতে সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে কিছু বিপদও মিশ্রিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একটা দার্শনিক জীবনবোধ আরোপ করিয়া সেই মানদণ্ডে

তাঁহার সমস্ত উপন্যাসাবলীর উৎকর্ষ-অপকর্ষের মূল্যায়ন হয়ত উপন্যাসগুলির গুণবিচারের নির্ভুল পন্থা না হইতেও পারে। লেখকের মনোরহস্য যে এমন সম্পূর্ণভাবে সমালোচনের নিকট ধরা দিতে পারে, তাহা কল্পনা করাও হয়ত অতিমাত্রিক দুঃসাহসিকতা। মধুসূদনের ক্ষেত্রে যে অনুমান ঠিক, বঙ্কিমের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য না হইতেও পারে।

মোহিতলালের সমালোচনা-পরিধি ও বৈশিষ্ট্য

মোহিতলাল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রায় সমস্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের তাঁহার সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন কি নজরুল ইসলামের প্রথম দিককার রচনা-সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির আশ্চর্য পরিচয় মিলে। অবশ্য কোন কোন স্থানে পরবর্তী সমালোচনা তাঁহার অভিমতকে সমর্থন করে নাই। সত্যেন্দ্রনাথের ক্লাসিকাল মহিমা বা করুণা-নিধানের "অমোঘ সৌষ্ঠব", "নির্মাণকৌশল" প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা বন্ধুবৎসলতা বা সহধর্মী কবির প্রতি সহানুভূতির আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। নজরুল সম্বন্ধে তাঁহার প্রারম্ভিক প্রশংসা পরে তীব্র বিমুখতায় পরিণত হইয়াছিল—তাঁহার সুরুচি ও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আদর্শনিষ্ঠা নজরুলের আবেগ-আবিল, দুর্বার বন্যার ন্যায় অজস্র-উৎসারিত, সূক্ষ্মশিল্পবোধহীন রচনাকে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার সহানুভূতি অতি-আধুনিক যুগের সীমান্তে পৌঁছিয়াই নিঃশেষিত হইয়াছে —তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ কবিগোষ্ঠীর নৈরাশ্যপীড়িত, নানাবিধ হেঁয়ালিপূর্ণ, বৈদেশিক ভাব ও ভাষার প্রয়োগে দুর্বোধ্য, বাঙালী-ঐতিহ্যবিচ্যুত ও আন্তর্জাতিকতার দুরাশায় অভিভূত রচনার সহিত তিনি আপসহীন সংগ্রাম চালাইয়াছেন; তাহাদের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সম্ভাবনাও তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহিত্যবিচারের অবিচল মানদণ্ড নবযুগের নূতন কাব্যানুভূতিকে প্রশ্রয় দিবার জন্য বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। তাঁহার মধ্যে শেষ পর্যন্ত সমালোচকের উদার আতিথেয়তা, শাশ্বত মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন আবির্ভাবের অভিনন্দন-প্রবণতা নীতিবিদ ও সমাজকল্যাণকামীর অত্যুৎসাহের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। বাঙালী-সংস্কৃতি ও জীবনবোধের অবলুপ্তির ভয়ে তিনি এরূপ বিচলিত হইয়াছেন যে নূতন পরীক্ষার প্রতি তাঁহার গ্রহণশীলতা ও ঔৎসুক্যই

ক্ষুণ্ন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার নিকট শেষ খাঁটি বাঙালী কবি; এবং বঙ্কিমের প্রতি আধুনিক যুগের অনাস্থা তাঁহার চক্ষে বাঙালী-সংস্কৃতি ও স্বধর্মের প্রতি বিশ্বাসহীনতারূপে গণ্য হইয়াছে। তিনি যেন অনাগতদর্শী প্রাচীন হিব্রু ঋষিদের ন্যায় বা উনবিংশ শতকের ইংরাজ সাহিত্যিক কার্লাইলের ন্যায় এই বিধর্মী, ঐতিহ্যভ্রষ্ট সাহিত্যকে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া উহার প্রতি জ্বলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনমনীয় প্রতিকূলতার যে কোন কারণ ছিল না তাহা বলিতেছি না; কিন্তু ইহা আর যাহাই হউক, আদর্শ সমালোচক-কৃত্য নহে। ইহা ছাড়া, মোহিতলাল সাহিত্যবিচারের কতকগুলি মূলসূত্র—যথা ফর্ম বা রূপবন্ধ, স্টাইলের সংজ্ঞা ও উহার মধ্যে ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন প্রভৃতি সম্বন্ধে মননশীল ও গভীর সাহিত্যবোধপূর্ণ আলোচনা করিয়া আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বাংলা সমালোচনাকে উৎকর্ষের যে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্যৎ সমালোচক-গোষ্ঠী পুরাতন সাহিত্যের মূল্যনির্ণয় ও নূতন সাহিত্যের রস-আস্বাদনের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবে।

(৪)

নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯) যদিও এখনও জীবিত, তথাপি তাঁহার কাব্য-পরমায়ু বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে যে গভীর ও বহুমুখী প্রত্যাশা জাগিয়াছিল, দৈবচক্রান্তে তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে; তাঁহার কাব্যচক্রের আবর্তন মধ্য-পথে স্থির হইয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটি সমগ্র বৃত্তমণ্ডল রচনা করিয়াছে। আজ কাব্যকৃতির দিক দিয়াই তাঁহার একটি সামগ্রিক পরিচয়ের সমাপ্তিরেখা টানা সমালোচকের বেদনাক্ষুব্ধ, অথচ অপরিহার্য কর্তব্যরূপেই দেখা দিয়াছে।

প্রাক্-নজরুল কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কাব্যের স্বরূপ

বাংলার কাব্যজগতে নজরুলের অতর্কিত আবির্ভাব যেন একটা ধূমকেতু বা ঝঞ্ঝার মতই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর্যায়ভুক্ত। কাব্যের পদ্ম-শোভিত, নীলাকাশ-প্রতিবিম্বিত স্থির সরোবরের বুকে তাঁহার কবিতা যেন একটা দুর্বার, আবিল নদীস্রোতের মতই শক্তির উচ্ছ্বাস ও ফেনিল উন্মত্ততার কলরোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। সৌন্দর্য-তট-ভূমিতে সুরক্ষিত, শান্ত-নিয়ন্ত্রিত ছন্দপ্রবাহে মৃদুসঞ্চারী, পরিস্রুত জীবনাবেগবাহী কাব্যদেহের উপর যেন একটা প্রলয়প্লাবন বহিয়া

গিয়াছে। নজরুলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রাজনৈতিকবোধ ও সমাজচেতনার উত্তাপ ক্রমশঃ উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল ইহা সত্য। সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের রূপপিপাসার পানপাত্রে সাময়িক উত্তেজনার আসব মিশাইয়া, সৌন্দর্যাবেশকে উগ্রতর নেশায় রূপান্তরিত করিয়া সমস্যার তীক্ষ্ণ কণ্টকবোধ কতকটা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা মুখ্যতঃ কবি ও গৌণভাবে পরিবেশস্পর্শাতুর; তাঁহাদের কবিধর্মের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, কাব্যানুভূতির আতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষের তাপমাত্রা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই, তাঁহারা সুর চড়াইয়াছিলেন বা উত্তেজনামুখর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা রণাঙ্গনে যদি অবতীর্ণ হইয়াই থাকেন তবে তাহা অর্ধ-শৌখীন অভিনেতারূপে; গোপবালক শ্রীদামচন্দ্রের ন্যায় মাথায় রঙীন পাগড়ি বাঁধিয়াও তাঁহারা গোচারণভূমির আসল কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

নজরুলের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার অন্তরের অনির্বাণ বহ্নিজ্বালাই তাঁহার প্রধান, এমন কি সর্বগ্রাসী অনুভূতি; তাঁহার রক্তে, তাঁহার গভীরতম চেতনায় যে রোষ, ক্ষোভ, রিক্ত বঞ্চিতের প্রতি নিবিড় একাত্মতাবোধ বজ্রাগ্নির মত অসহনীয় উত্তাপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করার তীব্র আকুতিই তাঁহার কাব্যপ্রেরণার মূল কারণ। তিনি প্রথমে সৈনিক, পরে কবি; তাঁহার চরম ও সর্বস্বপণ দেশপ্রেম ও শোষণবিরোধিতার সহিত কবিত্বশক্তির সংযোগ বাংলা সাহিত্যের একটা আকস্মিক সৌভাগ্য। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে স্থূল প্রহরণের সহিত কাব্য-প্রতিভার দিব্য অস্ত্র যুক্ত হইয়া রণোন্মাদকে আরও দীপ্ত ও বহুমুখী করিয়াছে। যুদ্ধের এই উগ্র উন্মাদনার মধ্যেই তিনি আপনার কবিস্বরূপকে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন। আবেগের অসংবরণীয় আতিশয্যে যেমন সাধারণ লোক অঙ্গসঞ্চালন করে, তিনি সেইরূপ তাঁহার শব্দছন্দ-কল্পনার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ-শক্তিকে বদ্ধমুষ্টির ন্যায় উঁচাইয়া ধরিয়াছেন, চাবুকের ন্যায় বায়ুস্তরে আছড়াইয়াছেন, অস্ত্রের ন্যায় রক্তলোলুপ অভিপ্রায়ের সহিত নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি স্বভাব-কবি বলিয়াই এই সমস্ত মারাত্মক প্রচেষ্টা কাব্যনিয়মের বশবর্তী হইয়া উন্মত্ততার মধ্যেও সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়াছে। যেখানে তাহা হয় নাই; সেখানেও তাঁহার কাব্যবিবেক তাঁহাকে কোনওরূপ পীড়া দেয় নাই; তাঁহার অস্ত্রে শত্রুর চর্মভেদ হইলেই তিনি কৃত-কৃতার্থ, পাঠকের মর্মভেদ না করিলেও তিনি

নজরুল প্রথমে সৈনিক তারপর কবি

বিশেষ অনুতপ্ত হন নাই। নিয়াগ্রার জলপ্রপাতের পাহাড় চূর্ণ করার দিকেই প্রধান লক্ষ্য, উহার পতনবেগের মধ্যে জ্যামিতিক সৌষম্য না থাকিলেও উহার বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।

উন্মত্ত আত্মহারা প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের কবি নজরুল

নজরুল যেন যজ্ঞকুণ্ড-উত্থিত সহজাত-কবচকুণ্ডলধারী দিব্য আবির্ভাব। আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা-উৎসারের ন্যায় তিনি তাঁহার অন্তঃসঞ্চিত জ্বালাকে, যে ভাষা তাঁহার মুখে আসিয়াছে, যে ছন্দ তাঁহার উত্তপ্ত আবেগের স্বাভাবিক ধ্বনিচিত্র, কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই তাহারই মাধ্যমে মুক্তি দিয়াছেন। এই ভাষা ও ছন্দ যে সত্যই উচ্চাঙ্গের কবিতা হইয়াছে, ইহা কবির শিল্পবোধের জন্য নহে, তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভার জন্য। তাঁহার এই প্রতিভার উন্মেষ-রহস্য বিস্ময়কর ও ব্যাখ্যার অতীত। কৈশোরে লেটো গান ও যৌবনে মেসোপটেমিয়া-রণাঙ্গনের বাস্তব অভিজ্ঞতা—এই দুইয়ের রাসায়নিক সংযোগে কেমন করিয়া যে তাঁহার প্রতিভার যৌগিক পদার্থ উদ্ভূত হইল, পরীক্ষাগারের কোন বিশ্লেষণপদ্ধতির দ্বারা তাহার রহস্য ভেদ করা যায় না। এই দুই প্রান্তিক ঘটনার ব্যবধানটি যে কেমন করিয়া একদিকে আশ্চর্য কবিত্বশক্তি ও অন্যদিকে অসন্তোষের তীব্র বিস্ফোরক বারুদ-সঞ্চয়ে পূর্ণ হইল তাহারও কোন পূর্বাভাস মিলে না। কিন্তু তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) যখন প্রকাশিত হইল, তখন নজরুলের এই দ্বৈতশক্তির অজস্র প্রাচুর্য সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় থাকিল না। উন্মত্ত, আত্মহারা হৃদয়াবেগের এরূপ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস বাংলা কাব্যে আর দেখা যায় নাই। কাব্যে প্রথানিষ্ঠ সৌন্দর্যানুস্মৃতির যত প্রাদুর্ভাব হয়, জীবনের প্রত্যক্ষতা সেই পরিমাণে হ্রাস পায় এবং কাব্যসৌন্দর্যের সহিত জীবনানুভূতির ব্যবধান বৃদ্ধির ফলে উহার আবেদনশক্তিও কমিয়া যায়। নজরুল কাব্যের স্থির, ক্ষীণজীবনস্পন্দিত, স্বপ্নময় সৌন্দর্যলোকে জীবনের আবিল স্রোতের দুর্বার গতি ও আকুতি প্রবাহিত করিয়া ইহার মধ্যে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিলেন। মানুষের বাঁচিবার দুরন্ত ক্ষুধা, তাহার সহজ অসংস্কৃত প্রবৃত্তির অবারিত আত্ম-প্রসারণের অভিলাষ সর্বপ্রথম কাব্যের ছন্দসুন্দর ও শিল্প-শান্ত প্রতিবেশে অভিব্যক্তি লাভ করিল। কাব্যপ্রসাদের ঝাড়-লণ্ঠনের স্নিগ্ধ দ্যুতির মধ্যে কোষমুক্ত তরবারির প্রখর দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল; উহার মৃদু আবেগ ও আত্মমগ্ন ছন্দগুঞ্জরণের মধ্যে জনতার দৃপ্ত দাবি, উচ্চকণ্ঠ অধিকার-ঘোষণা বজ্রনিনাদে

ধ্বনিত হইল। তাঁহার প্রকাশের রূঢ়তা অনেক সময়ই কাব্যানুমোদিত হয় নাই, ইহা ঠিক; কিন্তু তাঁহার সত্যভাষণের আন্তরিকতা, কাব্যরীতি উপেক্ষা করিয়া প্রাণের কথা চিৎকার করিয়া ঘোষণা করার অশালীন সাহসিকতা শেষ পর্যন্ত কাব্যের পরিধি ও জীবনশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। জীবনের অকর্ষিত ক্ষেত্র, অমার্জিত আবেগ, নব-উদ্বুদ্ধ চেতনা ও অভাববোধকে কাব্যকর্ষণার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত না করিতে পারিলে কাব্য ক্রমশঃ জীবনবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে; জীবনের প্রধান ধারা কাব্যের শাখা-নদীকে একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইবে। নজরুলের শক্তিমত্তা যদিও এ পর্যন্ত বাংলা কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে অনুসৃত হয় নাই, তথাপি ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার বীজ নিহিত আছে।

নজরুলের শব্দভাণ্ডার

বাংলা কাব্যে শব্দভাণ্ডারও নজরুল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন; যে সমস্ত আরবী বা উর্দু শব্দ তিনি কবিতায় প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে নৈসর্গিক ঔচিত্যবোধ সেগুলির প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বাংলা কাব্য কাব্যভাষার মধ্যে স্থায়িভাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। তিনি যখন 'ফরমান' বা 'আরজ' শব্দ প্রয়োগ করেন তখন তাহাদের ভাব-প্রকাশিকা ব্যঞ্জনাশক্তি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠে। হয়ত কিছু কিছু আতিশয্য ও অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু মনে হয়, তাঁহার কাব্যপরিণতির পথে অপ্রত্যাশিত বাধা না আসিলে, তিনি বাংলা সাহিত্যে মুসলমানী শব্দপ্রয়োগের সুষ্ঠু নীতিটি চিরকালের জন্য নির্ধারণ করিয়া যাইতেন। প্রতিভাবান লেখকের প্রয়োগই এই ক্ষেত্রে ঔচিত্যের চরম মানদণ্ড।

নজরুলের স্বল্পায়তন কাব্যজীবনে বিবর্তনের একটি স্তর সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। প্রথম জীবনে তাঁহার বিদ্রোহী সত্তা যে কবিসত্তাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাঁহার বিদ্রোহী মনোভাব অগ্ন্যুদ্‌গিরণ করিয়া কিছুটা শান্ত হইলেই তাহা আবার স্বচ্ছন্দ-বিকশিত এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছে। এই পরিবর্তন-রেখার একদিকে তাঁহার 'অগ্নিবীণা', 'ফণিমনসা' (১৩৩৪), 'সর্বহারা' (১৩৩৩) প্রভৃতি উগ্র প্রচারধর্মী কাব্য, অপর দিকে 'দোলন চাঁপা' (১৩৩০), 'ছায়ানট' (১৩৩২), 'সিন্ধুহিন্দোল' (১৩৩৪) প্রভৃতি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যপ্রাণ রচনা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে তাঁহার অজস্র গীতিস্তবকও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নজরুলের সকল দায়মুক্ত, রূপোল্লাসহিল্লোলিত ও সূক্ষ্ম

অনুভূতিসম্পন্ন কবিপ্রাতভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। তাঁহার প্রথম পর্যায়ের কবিতাতেও বিদ্রোহের অপ্রকৃতিস্থ অত্যুচ্ছ্বাস হইতে অপেক্ষাকৃত শান্ত, সংযত, আত্মশক্তিতে আস্থাশীল, আতিশয্যবাজত মনোভাবে পরিবর্তনের লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়। 'বিদ্রোহী'তে যে আবেগ বে-সামাল, 'সাম্যবাদ'-এ তাহা তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ ও আক্রমণদক্ষতার বহিঃপ্রয়োজনে কতকটা নিয়ন্ত্রিত, 'ফরিয়াদ'-এ তাহা বিষন্ন-গম্ভীর, মর্যাদাপূর্ণ অভিযোগ-উপস্থাপনে স্থির ও ভগবানের প্রতি অভিমানে করুণ। 'দারিদ্র্য' কবিতাকে পৌছিয়া কবি নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দশাকেও আন্দোলনকারীর দৃষ্টিতে না দেখিয়া কবির শান্ত-সুন্দর মনোভঙ্গীতে গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার কবিদৃষ্টিকে বাহির হইতে ফিরাইয়া, কোন অভিযোগে আবিল না করিয়া উহাকে অন্তরের মধ্যে সংহৃত করিয়াছেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠ অনুভূতি উহার ভালমন্দ দুই দিকই সমদর্শিতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছে; বঞ্চিত কবিসত্তার করুণ, বস্তু হইতে ভাবরূপে উদ্বর্তিত ক্রন্দন যেন সমস্ত কবিতাটিকে দেবদূতের অশ্রুপাতের (angel's tears) অমৃতনির্যাসে স্নিগ্ধ করিয়াছে।

নজরুলের কাব্য-জীবনের বিবর্তন

নজরুলের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিতে যে রূপমুগ্ধতা ও সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতির পরিচয় মিলে তাহা পরিণত প্রজ্ঞা ও আবেগের গভীরতার সহিত যুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ কবিতায় উন্নীত হয় নাই। নজরুলের আবেগের মধ্যে তরুণের স্বপ্নাবেশ, ভাবাতিরঞ্জনের স্পর্শ প্রচুর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অপরিণতির কিছু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি ও প্রেমবিষয়ক কবিতার মধ্যে রূপবিহ্বলতা আছে, কিন্তু কোন গভীর সুর নাই। মনে হয় যে, এই জাতীয় কবিতায় তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতিবেদ্য রূপাস্বাদন অপেক্ষা গভীরতর কোন স্তরে অবতরণ করেন নাই। যে সুলভ কল্পনাবিলাসের নিকট মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম একই সাধারণ লক্ষণে চিহ্নিত, একইরূপ আবেগতরলতায় বিগলিত, বিশিষ্টসত্তাহীন ভাবনির্যাসের সংমিশ্রণে একীভূত, কবি-চেতনা সেই স্তরকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাঁহার আবেশে স্বপ্নমন্থরতা ও বর্ণাঢ্যতা আছে, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা নাই; চিত্রকল্পতা আছে, হৃৎস্পন্দনের বলিষ্ঠ ধ্বনি ও গতিবেগ নাই; সঙ্গীতের কল্পলোক আছে, জীবনরসের স্বাদবৈচিত্র্য নাই। তাই তাঁহার মন শীতের রৌদ্রমধুর প্রভাতে প্রজাপতির ন্যায় তিসির ক্ষেতে ঘুরিয়া বেড়ায়; নদীতীরের কাশবনের মন্দান্দোলনের সহিত দোল খায়। তাই গুবাকতরুর শাখাপত্র তাঁহাকে নিতান্ত অকারণেই

নজরুলকাব্যে গভীর জীবনরসের স্বল্পতা

প্রিয়ার দেহলাবণ্যের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। এই চঞ্চল রূপানুরাগ, এই অলস স্মৃতি-রোমন্থন, এই সামান্য যোগসূত্র ধরিয়া প্রসঙ্গ হইতে অনুরূপ প্রসঙ্গে লঘু সঞ্চরণ, কবির সমস্ত ভাবাকাশ যে তাঁহার যৌবনস্বপ্নে আচ্ছন্ন তাহারই পরিচয় বহন করে। মানবজীবনের জটিল সমস্যা, প্রৌঢ় পরিণতির বহুমুখী জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁহার অন্তরকে একেবারেই আলোড়িত করে নাই। তিনি শেকস-পীয়রের নাটকের এরিয়েলের মত যে মোহন সঙ্গীত-নির্ঝর প্রবাহিত করিয়াছেন তাহা মানব-কর্ণে সুধাবর্ষণ করিলেও মানব-অনুভূতিতে কোন গভীর রেখাপাত করে না। তাঁহার সমস্ত কবিতা যেন তাঁহার একসুরো গানেরই বৃহত্তর সংস্করণ। তাই নজরুলের কবি-জীবনের অতর্কিত পরিসমাপ্তি এক বিরাট সম্ভাবনাকে অর্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া দিয়াছে। তাঁহার সৌন্দর্যকল্পনার সহিত পরিণত জীবন-অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিবার সুযোগ হইল না। তাঁহার গানের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-সংস্কৃতির যে আশ্চর্য সংশ্লেষপ্রবণতা দেখা গিয়াছিল, পরিণত বয়সের কাব্যসাধনার মধ্যে তাহার সুষ্ঠুতর অনুশীলন হইলে বাংলা কাব্যে এপর্যন্ত অলিখিত এক অধ্যায় সংযোজিত হইত।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) অকালে ঝরা, সৌরভ-নিবিড় কবি-পুষ্পের আর একটি দৃষ্টান্ত। তাঁহাকে ইংরেজ কবি স্পেন্সারের মত 'কবির কবি'-আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা প্রভাবই ব্যাপকতর। তাঁহার নিজস্ব সুরটি তাঁহার আপন রচনায় যতখানি শিল্পপরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা তাঁহার সমকালীন কবিগোষ্ঠীর মনে, আকাঙ্ক্ষিত, অথচ অনধিগম্য, অতি-সূক্ষ্ম বেদনাময় একটি ভাবাকৃতিরূপে বেশী অনুরণিত হইয়াছে। সমস্ত অতি-আধুনিক যুগের মনে যে লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তি, যে অনির্দেশ্য হৃদয়-বিক্ষোভ নানা রূপে ও বিচিত্র সুরে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই জীবনানন্দের আত্মমগ্ন অনুভূতিতে একটি জ্বালাহীন, বস্তুভারমুক্ত, মননের মুন্সিয়ানাবর্জিত, করুণ-সুন্দর রূপতন্ময়তার শিশির-বিন্দুতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মেজাজ ও রুচির দিক দিয়া তিনি সমকালীন কবিগোষ্ঠীর মধ্যে এক একক আত্মা। যুক্তিতর্কের ব্যূহরচনা, আঘাত-প্রতিঘাত-কুশলতা, বিদ্রোহের উত্তপ্ত ধূম্র-উদ্‌গিরণ, অবাঞ্ছিত প্রতিবেশের বিরুদ্ধে রক্তক্ষরা সংঘর্ষ—তাঁহার সমস্ত কবি-প্রকৃতি এই জাতীয় সংগ্রামবিক্ষুব্ধ, ভারসাম্যচ্যুত মনোভাবের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ। তিনি এই রূঢ়, দ্বন্দ্ব-কর্কশ প্রতিবেশকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া নিজ সৌন্দর্যধ্যানমগ্ন আত্মার গভীরে আশ্রয় লইয়াছেন। অনন্তকাল, অসীম

জীবনানন্দ দাশের কবিতার একক বৈশিষ্ট্য

বিশ্বব্যাপ্তি, গ্রহ-নক্ষত্রের কল্পনাতীত দূর-প্রসার সমস্তই যেন তাঁহার অনুভূতিতে একবিন্দু স্নিগ্ধ-সজল শিশির-স্পর্শের মত ঘনীভূত হইয়াছে, তাঁহার মোহাবেশকে নিবিড় ও নিশ্ছিদ্র তন্ময়তায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। অসীম নভোবিহারের পর শ্রান্ত পাখীর ন্যায় তিনিও সুদূর অতীত যুগে বিচরণের পর, শ্রাবস্তী-বিদিশার অবলুপ্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডার হইতে কিছু বিহ্বল, প্রত্যক্ষ-ভোলান স্মৃতিসার সঞ্চয় করিয়া নিজ কল্পনা-বিভোর অন্তর-নীড়-নিভৃতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সমস্ত রূপগন্ধ-শব্দস্পর্শময় জগৎ তাঁহার জ্যোতির্ময় কল্পলোকনির্মাণে প্রতীকধর্মী ইঙ্গিতরশ্মি প্রেরণ করিয়াছে; সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি উহাদের পারস্পরিক সীমারেখা হারাইয়া এক দ্রবীভূত ভাবরূপকের সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। প্রকৃতি-তন্ময়তার দিক দিয়া একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার তুলনা চলে। কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রকৃতিমগ্নতা এক ঊর্ধ্বতর দিব্য অনুভূতির অনুগামী—বিশ্বরহস্য-উপলব্ধির সহায়ক, লোক-লোকান্তরে প্রসারিত, সদাগতিশীল চেতনার ইঙ্গিতবাহী। জীবনানন্দের এরূপ কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় নাই; তিনি রূপসাগরে অবগাহন করিয়াছেন কোন অরূপরতনের আশায় নয়, ইহার অতলস্পর্শ গভীরতায়, ইহার সাঙ্কেতিক বোধের গহনতায় নিজ বাস্তব-বিস্মৃত ভাবমুগ্ধতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, নিজ কল্পলোকাশ্রয়ী কল্পনার রক্ষাকবচস্বরূপ এক সৌন্দর্যঘন অন্তরাল-রচনার উদ্দেশ্যে। জীবনানন্দের এই মনোভাবের পিছনে যদি কোন তত্ত্বাভিপ্রায় ছিল, তাহা অপরিস্ফুটই রহিয়া গিয়াছে।

জীবনানন্দের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

অবশ্য তাঁহার সমস্ত রচনায় যে এই রূপবিহ্বলতা সার্থক ও অনিবার্য কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহা তাঁহার রুচি ও মানসপ্রবণতার নির্দেশক, সর্বত্র তাঁহার কবিশিল্পের নিদর্শন নহে। যে তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও অভ্রান্ত শিল্পবোধ থাকিলে কবিমনের অনির্দেশ্য আকৃতি, ইহার শিথিল স্বপ্নাবেশ সার্থক রূপসৃষ্টির সুস্পষ্টতায় প্রতিভাত ও পাঠকের গ্রহণশীল মনে অখণ্ড প্রতিবিম্বাকারে মুদ্রিত হয়, তাহা সব সময় এই আত্মভোলা, অব্যবস্থিতচিত্ত কবির আয়ত্তাধীন ছিল না। কবির রূপকল্পনায় আলোকের সঙ্গে যে অনেক পরিমাণে কুহেলিকা মিশ্রিত ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার 'বনলতা সেন', 'সোনালি ডানার চিল', 'রূপসিরি নদী' ইত্যাদি রূপকণিকাগুলি তাঁহার নিজের মনের আকাশে তারা হইয়া ফুটিয়াছিল; কিন্তু ইহাদের রূপকচ্ছটা সার্বভৌম রসিক-চিত্তে মাঝে মধ্যে চমক জাগাইলেও স্থির জ্যোতিষ্কদীপ্তিতে চিরভাস্বরতা লাভ করে নাই। কুয়াশার

ভিতর দিয়া দেখা নক্ষত্রের ন্যায় কবির আবেগ-কম্পিত, অথচ পরিণত শিল্পের পরমপ্রকাশবাঞ্ছিত কল্পনা যেন গোধূলিরহস্যভরা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মতই আমাদিগকে উন্মনা করে কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। জীবনানন্দের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁহার কবিকৃতিতে ততটা নয়, যতটা এই সৌন্দর্যবিমুখ, সংশয়কণ্টকিত যুগে তাঁহার আবির্ভাব-রহস্যের মধ্যেই নিহিত। জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার যে আধুনিক বাংলায়ও সম্পূর্ণ অপচিত হয় নাই, জীবনানন্দের কবিতা সেই আশ্বাসের বাণীই বহন করে।

অষ্টম অধ্যায়

ছোটগল্প ও উপন্যাসের উত্তরপর্ব

(১)

পূর্বানুস্মৃতি

পরিবর্তমান পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষের মন কদাচ স্থির থাকিতে পারে না—কালপ্রবাহের অবিশ্রান্ত স্রোতের টানে উত্তাল তরঙ্গহিন্দোলে আন্দোলিত তরণীর মত নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণে নব নব রুচি ও নীতির ঊর্মি-সংঘাতে উহা অভিনব ভাব ও রূপের মধ্যে বিচিত্র আকার গ্রহণ করে। ইহাকে যুগলক্ষণ বা যুগধর্ম বলিয়া স্বীকৃতি দান করা হয় এবং বিশেষ স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করিয়া, পূর্বাপরের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিতে হয়। সামাজিক মানুষের হৃদয়ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর এই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর থাকে সাহিত্যের মধ্যে। বিশেষ যুগের প্রধান সাহিত্যিকদের রচনার ভাব ও রূপাদর্শের মধ্যেই সেই যুগের সাহিত্যের বিশেষ আদর্শের ছবি ফুটিয়া উঠে এবং সেই কারণেই তেমন প্রতিভাধর সাহিত্যিক যুগপুরুষ বলিয়া অভিনন্দন লাভ করেন। প্রতিভার গভীরত্ব ও বিস্তার বিশাল হইলে তাহার নামেই যুগের পরিচয় হয়।

যুগধর্ম ও যুগন্ধর সাহিত্যিক

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তেমনি যুগন্ধর সাহিত্যিক এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিশেষতঃ উপন্যাস-সাহিত্যে একটি প্রবল সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল। তদানীন্তন সাহিত্য-কর্ষণক্ষেত্রে সঞ্জাত অসংখ্য উপন্যাস-ওষধির চিহ্ন কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিম সাহিত্যের নিত্য-পাদপের পার্শ্বে বিভিন্ন উচ্চতা আয়তনের কেবল দুই চারিটি বনস্পতির সাক্ষাৎ মেলে। রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক।

বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিক

রমেশচন্দ্রের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের বড় উপন্যাস দুইখানি 'মাধবী লতা' ও 'কণ্ঠমালা' উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস হিসাবে এই দুইখানিতে অসম্পূর্ণতা ও সমন্বয় কৌশলের অভাবের পরিচয় আছে এবং তাহাদের মধ্যে খাঁটি উপন্যাসের রস জমিয়া উঠে

সঞ্জীবচন্দ্র

নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লব্ধ চিন্তাশীলতার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও বিশ্লেষণ পটুতা প্রমুখ অনন্যসাধারণ গুণগুলি অপর কোন পরবর্তী লেখকের মধ্যে উদাহৃত হয় নাই।

অন্যান্য ঔপন্যাসিক

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপপরাজয়' দামোদর মুখোপাধ্যায়ের রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপসংহার মূলক 'মৃন্ময়ী', 'নবাবনন্দিনী' ও তাঁহার স্বাধীন রচনা 'মা ও মেয়ে', 'দুই ভগিনী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এই যুগের অন্যতর জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙালী সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের করুণরস-প্রধান ও ধর্মনীতিমূলক আখ্যানকে বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস রচনা করিয়া প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বর্ণলতা উপন্যাসখানি একদিকে বস্তুধর্মী, অপরদিকে নীতিতে আস্থাশীল ও রোমান্স-কৌতূহলী। উনবিংশ শতকের শেষ পাদের বাঙালী মানসিকতায় যে বাস্তব দুঃখ ও দৈবনির্ভরতায় বিপরীত জাতীয় উপাদান মিশ্রিত ছিল স্বর্ণলতা উপন্যাসে তাহারই সার্থক প্রতিফলন হইয়াছে।

(২)

মহিলা-ঔপন্যাসিক

স্বর্ণকুমারী

মহিলা-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে রচনায় উৎকর্ষ ও পরিমাণের দিক দিয়া সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম। তাঁহার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস চতুষ্টয়ে—দীপনির্বাণ, ফুলের মালা, মিবাররাজ, বিদ্রোহ—উৎকর্ষের ও মৌলিকতার দাবি অকিঞ্চিৎকর। রচনাতে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রমেশচন্দ্র দ্বারাই তিনি বেশি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। স্বর্ণকুমারীর উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস হিসাবে—ছিন্নমুকুল, হুগলীর ইমামবাড়ী, স্নেহলতা (দুই খণ্ড), কাহাকে—এই চারিখানির নাম করা যাইতে পারে। সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের প্রবল উত্তেজনা তখন উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তুফান তুলিয়া তাহার গঠন-সৌষ্ঠব নষ্ট করিয়া ফেলিত। তর্কবিতর্ক ও তত্ত্বালোচনার পরিস্ফীত ধূম্রকুণ্ডলীর অস্পষ্টতায় বাস্তব জীবনরস ধূসর হইয়া হারাইয়া যাইত। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসগুলিও এই দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। উহাদের মধ্যে 'কাহাকে' উপন্যাসখানি স্বর্ণকুমারীর

সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। উহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে পর্যাপ্ত তর্কবিতর্ক ও পাণ্ডিত্য-আস্ফালন থাকা সত্ত্বে-ও ইহাতে আগাগোড়া স্ত্রী-হস্তের লঘু কোমল স্পর্শ অনুভব করা যায়।

দুই বিপরীতমুখী ধারা

স্বর্ণকুমারীর পরবর্তী মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনার ভাব ও ভঙ্গী দুই বিপরীত মুখী ধারার অনুবর্তন করিয়াছে। ইহার এক কোটিতে আছেন হিন্দু সমাজের সনাতন আদর্শের সমর্থক মুখ্যতঃ অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী, অন্য কোটিতে নারী সমাজের আধুনিক মনোবৃত্তির সমর্থক সীতাদেবী ও শান্তাদেবী প্রমুখ লেখিকাদল।

অনুরূপা দেবী

অনুরূপা দেবী অনেক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে মন্ত্রশক্তি, মহানিশা, পথহারা, মা, পোষ্যপুত্র, গরীবের মেয়ে, জ্যোতিঃহারা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জনপ্রিয়তার দিক হইতে 'মা' উপন্যাসখানি প্রথম হইলে-ও অনুরূপা দেবীর প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস চতুষ্টয় হইতেছে—গরীবের মেয়ে, মহানিশা, মন্ত্রশক্তি ও পথহারা। ইহাদের মধ্যে-ও মন্তব্যের সংযম ও পরিমিতি কাহিনীর সরল, স্বচ্ছন্দ ও সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত গতিবেগ প্রমুখ উৎকর্ষের দিক হইতে 'মন্ত্রশক্তি' অনুরূপা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

নিরুপমা দেবী

নিরুপমা দেবীর উপন্যাস ও ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প এবং কাহিনীতে বিষয়-বৈচিত্র্য-ও কম। প্রেমের বিরোধ ও দাম্পত্য জীবনের সংঘর্ষই প্রায় সমস্ত উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তাঁহার রচিত উচ্ছৃঙ্খল, অন্নপূর্ণার মন্দির, বিধিলিপি, শ্যামলী, দিদি প্রমুখ উপন্যাসগুলি উল্লেখযোগ্য। নিরুপমা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দিদি'। সাধারণ একটি দাম্পত্য মনোমালিন্যের কাহিনী এমন সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে যে উপন্যাস সাহিত্যে ইহা একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হইয়া রহিয়াছে।

অনুরূপা ও নিরুপমার তুলনা

অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর মধ্যে তুলনায় আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা কঠিন। অনুরূপার মন্তব্য অনেক সময় পাণ্ডিত্য-ভারাক্রান্ত ও গুরুপাক, নিরুপমার মন্তব্যের মধ্যে এই দোষের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব। সৃষ্টি-শক্তির দিক দিয়া অনুরূপার শ্রেষ্ঠত্ব, কলাকুশলতা ও চিত্ত-বিশ্লেষণে নিরুপমাই বোধ হয় প্রাধান্যের দাবি করিতে পারেন। নিরুপমার 'দিদি' বোধ হয় অনুরূপার 'মন্ত্রশক্তি' হইতে উচ্চতর সৃষ্টি।

আধুনিক ধারার লেখিকা সীতা দেবীর রচনার মধ্যে বজ্রমণি, ছায়াবীথি ও আলোর আড়াল এই ছোটগল্পের সমষ্টি এবং পথিক বন্ধু, রজনীগন্ধা, পরভৃতিকা,

বন্যা—এই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসগুলি উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্পের মধ্যে অধিকাংশই সামাজিক বৈষম্য ও অসঙ্গতিমূলক। 'রজনীগন্ধা' সীতা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। স্ত্রীজাতির পক্ষ হইতে তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত করিবার জন্য উপন্যাস লিখিলে কিরূপ নূতন আর্টের সৃষ্টি হইতে পারে, 'রজনীগন্ধা' তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

সীতা দেবী

শান্তা দেবীর ছোটগল্পের মধ্যে উষসী, সিঁথির সিঁদুর ও বধূবরণ উল্লেখযোগ্য। উহাদের মধ্যে কয়েকটি গল্প ভাব ও ভাষার দিক দিয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাস স্মৃতির সৌরভ, জীবনদোলা, চিরন্তনী প্রভৃতির মধ্যে 'চিরন্তনী' উপন্যাসখানি শ্রেষ্ঠত্বের আসন পাইবার যোগ্য।

শান্তা দেবী

সাম্প্রতিক কালের মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(৩)

হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস

হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসের দৃষ্টান্ত বাংলাতে অপ্রচুর। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রায় সমস্ত মুখ্য চরিত্রই কৌতুক-কর হাস্যরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উপন্যাসে প্যারীচাঁদ এবং নাটকে দীনবন্ধু-ই এই প্রকার রসিকতা প্রবর্তনে অগ্রণী হইয়াছেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট দুই একটি চরিত্রে ও কথোপকথনে রসিকতার সৃষ্টি করিলেও তাঁহাদের উপন্যাসে humour-এর প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখান নাই। 'কমলাকান্তের দপ্তর' এক ধরনের প্রবন্ধ হিসাবেই আলোচ্য, উপন্যাস হিসাবে ইহার পরিচয় পূর্ণাঙ্গ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও কমলাকান্তের চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার ফলে চরিত্রটি জীবন্ত ও ঘাত-প্রতিঘাতের গতিতে চঞ্চল হইয়া উপন্যাসের ইতিহাসেও একটি স্থান করিয়া লইয়াছে।

হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস

বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসের প্রধান স্রষ্টা বলিয়া বিবেচিত। পঞ্চানন্দের হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম'। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর রচিত উপন্যাসগুলিতে ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের সাহায্যে হাস্যরস ও বীভৎসরস সৃষ্ট

পঞ্চানন্দ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

হইয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের মডেল ভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস চরিতামৃত, নেড়া হরিদাস, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সুদীর্ঘ কাল পরে হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস ধারার পরিত্যক্ত সূত্রটি ধারণ করিয়াছেন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)। প্রমথবাবুর হাস্যরস সৃষ্টির প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহার প্রধান ভঙ্গী হইতেছে সৃজনী শক্তির আবেশময়তার সহিত সমালোচনা শক্তির অতন্দ্রিত বিচারবুদ্ধির এক প্রকারের অদ্ভুত হাস্যকর সমাবেশ। চার ইয়ারী কথা, নীললোহিতের আদি প্রেম প্রমুখ উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্য অনায়াসের প্রত্যক্ষ হয়।

প্রমথ চৌধুরী

বাংলা উপন্যাসে সর্বপ্রথম উদ্ভটকল্পনা-সংবলিত ও ভৌতিক ও মানবিক ঘটনার যদৃচ্ছ সংমিশ্রণে কৌতুককর কাহিনী প্রবর্তনের কৃতিত্ব ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের। তাঁহার রচনার মধ্যে কঙ্কাবতী, মুক্তামালা ও ডমরু চরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে মানস প্রতিবেশে রূপকথার জন্ম ও সাধারণ জীবনের সহিত উহার সহজ সহ অবস্থান, তাহা প্রচুর পরিমাণে ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে রক্ষিত আছে। এই রূপকথার কল্পনাকে তিনি বাস্তব জীবনের সহিত নূতন সংশ্লেষে মিলাইয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

এই দিক দিয়া তিনি রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) অগ্রবর্তী ও পথপ্রদর্শক। তবে রাজশেখর বসুর পরিমিতি বোধ আর-ও সূক্ষ্ম ও তাঁহার অলৌকিক জগতে পদক্ষেপ যদৃচ্ছ নহে, বিশেষ উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। হাস্যরস প্রধান কথা সাহিত্যে বীরবলের পরে পরশুরামে স্থান। তাহার 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী' এই জাতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর বা প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরসের প্রকৃতি হইতে রাজশেখর বসুর হাস্যরসের প্রকৃতি ভিন্ন। যোগেন্দ্রচন্দ্র অতিরঞ্জন-প্রয়োগে ও প্রমথ চৌধুরী নানা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা, হাস্যকর সূক্ষ্ম তর্ক, অতর্কিতভাবে বিপরীত রসের প্রবর্তন ও বুদ্ধির কসরত দেখাইয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজশেখর বসুর হাস্য-রসের মধ্যে কিন্তু একটা স্বতঃ-উৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার রসিকতার প্রবাহ বুদ্ধির বপ্রক্রীড়ায় ঘোলাটে হইয়া যায় নাই, সূর্য-করোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ সাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে।

রাজশেখর বসু

উপন্যাস ক্ষেত্রে হাস্যরসিকদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান-ই

বোধ হয় সর্বোচ্চ। হাস্যরসের অজস্র প্রাচুর্য ও প্রকাশভঙ্গীর দ্যুতিমান ও অর্থ গৌরবপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা তাঁহার সমস্ত রচনায় ঝলমল করিতেছে। রাজশেখর বসুর হাস্যরসের তুলনায় তাঁহার হাস্যরসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুভূত হয়। পরশুরামের হাস্যরসের প্রাণ হইতেছে তাঁহার পরিকল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা এবং তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি এই পরিকল্পনার প্রতিবেশলীন। হাস্যকর প্রতিবেশ-প্রভাবের জন্য তাঁহার রসিকতার মধ্যে করুণ রসসঞ্চারের কোন চেষ্টা পাওয়া যায় না। সুতরাং উচ্চাঙ্গের humour-এর যে প্রধান লক্ষণ—হাস্যরসের সহিত করুণ রসের সমাবেশ—তাহা পরশুরামের রচনাতে মেলে না। পক্ষান্তরে কেদারবাবুর হাস্যরসের প্রধান গুণ হইতেছে উহার সহিত করুণ রসের সমাবেশ ও কোথাও কোথাও চমৎকার সমন্বয়। কি ছোট গল্প, কি বড় উপন্যাস—সর্বত্রই এই কারুণ্য-প্রবাহ তাঁহার হাসির মধ্যে বিষাদ-গাম্ভীর্যের একটা গাঢ়তর সুর ধ্বনিত করিয়াছে। শেষ খেয়া, আমরা কি ও কে, কবুলতি, দুঃখের দেওয়ালী, ভাদুড়ী মশাই, কোষ্ঠীর ফলাফল প্রভৃতি এই দিক দিয়া প্রশংসার অধিকারী। কোষ্ঠীর ফলাফল ও ভাদুড়ী মশাই—এই দুইখানিই তাঁহার প্রতিভার সার্থক প্রতিনিধি।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, রাণুর তৃতীয় ভাগ, রাণুর কথামালা প্রমুখ গল্পগ্রন্থ ও পোনুর চিঠি ও কাঞ্চনমূল্য বড় উপন্যাস—হাস্যরসাত্মক রচনা হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে। হাস্য-রসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে যে কবিসুলভ সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিকের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাঁহার পরবর্তী রচনায় ক্রমাগত স্পষ্টতর হইয়াছে। নীলাঙ্গুরীয়, রিক্সার গান, মিলনান্তক, নয়ান বৌ, রূপ হ'ল অভিশাপ প্রভৃতি বিভূতিভূষণের অপেক্ষাকৃত গম্ভীর রচনা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

উপন্যাসে নবপরিকল্পনা

(৪)

উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য প্রবর্তনের জন্য যাঁহারা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নরেশচন্দ্রের উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশক্তি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁহার প্রথম রচিত উপন্যাসগুলিতে তিনি যৌন ও অপরাধ-তত্ত্ব বিশ্লেষণকেই মুখ্য স্থান

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

স্থান দিয়াছেন; উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের যে অপরিহার্য দুর্বলতা তাহা এই সমস্ত উপন্যাসে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যে সমস্ত উপন্যাসে ঠিক উদ্দেশ্যমূলক আদর্শ অনুসৃত হয় নাই সেগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্যের দাবি করিতে পারে। শুভা, মেঘনাদ, লুপ্তশিখা, অভয়ের বিয়ে, তারপর, মিলন-পূর্ণিমা প্রভৃতি নরেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মনে হয় অগ্নিসংস্কার ও বিপর্যয়—এই দুই খানিকে নরেশচন্দ্রের বহুসংখ্যক উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার উপন্যাসগুলি হইতে নরেশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ মানসিকতা ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান অভাব হইতেছে রসানুভূতি ও ভাবসঞ্চয়ের তীব্রতার।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁহার চোরকাঁটা, যমুনা পুলিনে ভিখারিনী, দোটানা প্রভৃতি উপন্যাসকে ঠিক মৌলিক বলা চলে না। তাহাদের উপর বৈদেশিক উপন্যাসের ছায়াপাত হইয়াছে। হেরফের উপন্যাসের গল্পাংশ রবীন্দ্রনাথের দান বলিয়া লেখক স্বীকার করিয়াছেন। তাহার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে পঙ্কতিলক, নষ্টচন্দ্র, রূপের ফাঁদ, মন না মতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস ছাড়া ছোটগল্প রচনায় ও লেখক সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পুষ্পপাত্র, পঞ্চদশী, বরণডালা প্রভৃতি গল্প সংগ্রহে কয়েকটি গল্প উচ্চতর উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট কলা-সংযম ও লিপি-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মন্তব্য বিশ্লেষণে গভীরার্থক চিন্তাশীলতা ও সংক্ষিপ্ত প্রকাশক্ষমতা যুগপৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কথোপকথনের ধারার মধ্যে সহজ ভদ্রতা, সাবলীল উত্তর-প্রত্যুত্তর নিপুণতা ও লঘু সরসতা প্রভৃতি গুণ সুপরিস্ফুট—তবে মার্জিতবুদ্ধি ও রুচিপ্রাধান্যের জন্য ভাবগভীরতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে হয়। উপেন্দ্রনাথের উপন্যাসসমূহের মধ্যে শশিনাথ, অমূলতরু, অমলা, অন্তরাগ, দিকশূল উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্রনাথের নবগ্রহ ও গিরিকা নামে দুইটি ছোট গল্পের সমষ্টি ছোট গল্প সাহিত্য পর্যায়ে উচ্চ স্থান অধিকার করে।

গীতি-কাব্যধর্মী উপন্যাস

(৫)

রচনার সংখ্যা-প্রাচুর্য, রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে পরীক্ষামূলক অনিশ্চয়তা, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন সমালোচনায় বিশেষত্বে একদিকে পূর্বতন ধারার প্রতি আনুগত্য-হীনতা, অন্যদিকে মৌলিকতার নিরংকুশ প্রতিষ্ঠার অভাব প্রমুখ নানা কারণে অতি আধুনিক উপন্যাসের যথার্থ সমালোচনা ও মূল্যায়ন অত্যন্ত দুরূহ। কাজেই মুখ্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে কয়েকটি শাখায় মোটামুটি বিভক্ত করিয়া এই উপন্যাসগুলির তথা ঔপন্যাসিকগণের কেবল একটা সাধারণ পরিচয় লওয়া যাইতে পারে।

অতি আধুনিক উপন্যাস সমালোচনার দুরূহতা

খুব ব্যাপক ও গভীর ভাবে গীতিকাব্যধর্মী উপন্যাস যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। রচনার অজস্রতা ও অভিনব লিখনভঙ্গী এই দুইদিক দিয়াই তাঁহারা খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের ও ক্ষেত্রবিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের গীতিধর্মিতা ও কাব্যোচ্ছ্বাস হইতে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের কাব্যধর্মিতার প্রধান পার্থক্য এই যে এই দুই পরবর্তী যুগের ঔপন্যাসিকের কবিত্ব উপন্যাসের মধ্যে সর্বব্যাপী, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ-প্রণালী একান্তভাবে কাব্যধর্মী। তাঁহারা উপন্যাসে যে ঘাতপ্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেন, তাহাতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য। জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে দেখিবার ভঙ্গী, জীবন সমালোচনার প্রণালী, ইঁহাদের সম্পূর্ণভাবে কাব্যানুমোদিত।

উপন্যাসে গীতিধর্মিতা

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলি—অকর্মণ্য, রডোডেনড্রনগুচ্ছ, সানন্দা, যেদিন ফুটল কমল প্রভৃতির মধ্যে ক্রমবর্ধমান কাব্যপ্রবণতার সাক্ষাৎ মিলে। দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে তিথিডোর, নির্জন স্বাক্ষর, শেষ পাণ্ডুলিপি, শোন পাংশু, হৃদয়ের জাগরণ প্রভৃতি নূতন জীবন-সমীক্ষা-রীতির পরিচয়বাহী। বুদ্ধদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'তিথিডোর' কলিকাতার মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনের অপূর্ব রসসমৃদ্ধ আলেখ্য। ছোটগল্প রচনাতে-ও তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

বুদ্ধদেব বসু

অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির ধারা বেদে, উর্ণনাভ ও আসমুদ্র এই কয়টি উপন্যাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আকস্মিক, কাক-জ্যোৎস্না, প্রচ্ছদপট, রূপসী রাত্রি প্রমুখ উপন্যাসগুলি-ও উল্লেখ-যোগ্য। ইতি ও অকালবসন্ত প্রমুখ গল্পগ্রন্থ অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প রচনার নৈপুণ্যের নিদর্শন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৬)

বুদ্ধি-প্রধান জীবনবিচার

গল্পে-উপন্যাসে বুদ্ধিপ্রধান জীবন-সমালোচনা করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রবোধকুমার সান্যাল। বুদ্ধ-অচিন্ত্যের সমবেষ্টনীতে থাকিয়াও প্রেমেন্দ্র গল্প-উপন্যাস রচনা-প্রণালীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যের আতিশয্য বিষয়ে তিনি অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কল্পনাবিলাস ও কাব্যচর্চার লেশমাত্র বাষ্প তাঁহার গল্পে নাই। একপ্রকার শুষ্ক, আবেগহীন, বুদ্ধিপ্রধান জীবন-সমালোচনা, বাঙালীসুলভ ভাবার্দ্রতার সম্পূর্ণ বর্জন ও আবেগপ্রবণতার কঠোর নিয়ন্ত্রণই তাঁহার মুখ্য বিশেষত্ব। তাঁহার ছোটগল্পের সমষ্টি বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা, ধূলিধূসর প্রভৃতি তাঁহার বিশেষত্বের পরিচয় দেয়। একথা-ও উল্লেখযোগ্য যে প্রেমেন্দ্র বড় উপন্যাস রচনায় ছোট গল্পের মত সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একদল লেখক আছেন যাঁহারা জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপপত্তি (theory) লইয়া সমাজ-বিন্যাসের একটা অচিন্তিত পূর্বরূপকল্পনার প্রেরণায় জীবন পর্যালোচনায় অগ্রসর হন। জীবনের ভালমন্দ, হাসিকান্না সব লইয়া সমগ্রতা হইতে তাঁহারা রস আহরণ করেন না। জীবনের যতটুকু খণ্ডাংশ তাঁহাদের পূর্বনির্ধারিত মানস-কল্পনা সমর্থিত হয় ততটুকুর প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। জীবন-গ্রন্থের কয়েকটি নির্বাচিত পাতা অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের বিশিষ্ট জীবনদর্শন গড়িয়া উঠে। প্রবোধকুমার এই শ্রেণীভুক্ত। কোনটা সম্ভব, কোনটা অসম্ভব, কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা অস্বাভাবিক ইহা লইয়া প্রবোধকুমার মাথা ঘামান না। তাঁহার ভ্রমন-কৌতূহলে সময় সময় বাস্তব নিষ্ঠা অতিক্রম করিয়াছে। প্রবোধকুমারের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'মহাপ্রস্থানের পথে' মূলতঃ ভ্রমণকাহিনী। প্রিয়বান্ধবী, তুচ্ছ, বনহংসী, নবীন

প্রবোধকুমার সান্যাল

যুবক প্রমুখ উপন্যাসে তাঁহার বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর নিদর্শন সুস্পষ্ট। ছোটগল্প রচনাতেও প্রবোধকুমারের ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ও শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় আছে।

(৭)

সমস্যাপ্রধান উপন্যাস

সমস্যাপ্রধান উপন্যাস লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্নদাশঙ্কর রায়।

দিলীপকুমার রায়

উপন্যাসের একটি বিশেষ ক্ষেত্র দিলীপকুমার সম্পূর্ণরূপে নিজের করিয়া লইয়াছেন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্তরঙ্গ মিলন। প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের প্রথম পরিচয় ও সংঘর্ষ ও উহাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার বিবরণ বাংলা সাহিত্যের ও উপন্যাসের একটা বড় অধ্যায়। দিলীপকুমার এই বহুব্যবহৃত পথে সর্বাপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার মন একদিকে যেমন সমাজ ও হৃদয় সমস্যার আলোচনায়, যুক্তিতর্কে তীক্ষ্ণ নিপুণতা ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছে, অন্যদিকে কাব্য ও ললিতকলায় রসোপলব্ধির দিক দিয়া নিজেকে সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতিশীল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। এই চিন্তাশীলতা ও নিবিড় রসোপলব্ধির যুগপৎ মিলন তাঁহার রচনাকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। আর-ও একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার উপন্যাসের ঘটনাস্থল পাশ্চাত্যদেশে ও নরনারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলের। মনের পরশ, রঙের পরশ, দুধারা, বহুবল্লভ, দোলা প্রমুখ উপন্যাসগুলি একদিক দিয়া বিশিষ্টতার দাবি করিতে পারে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেই অধিকতর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। গল্পরচনা-রীতির দিক দিয়া ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার গল্পরচনা-রীতি ঠিক একই রূপ, গল্পের convention-এর প্রতি বিদ্রূপ ও উহার ভিতরকার কলকজার রহস্যোৎঘাটন। তাঁহার গল্পসমষ্টি 'রিয়ালিস্ট' এ ধূর্জটিপ্রসাদ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা উপন্যাসে তিনি অনুকরণ কাটাইয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁহারা ব্যক্তিজীবন-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী যে জটিল চিন্তাধারা ও সমস্যাসংকুলতা মানবমনকে আচ্ছন্ন

ও অভিভূত করিতেছে—তাহার আলোচনাতেই মুখ্যভাবে ব্যাপৃত থাকেন, অন্নদাশঙ্কর রায় বোধহয় সেই শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার মননশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও সক্রিয়। অতি সহজ সরল কথায়, তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া তিনি দুরূহ আলোচনার মর্মভেদ করিতে পারেন। অসমাপিকা, আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা উপন্যাস রচনার পর অন্নদাশঙ্কর ছয়টি খণ্ডে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ 'সত্যাসত্য' উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। ইহাতে আধুনিক যুগের সমগ্র জটিল সমস্যা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ, মানবকল্যাণের পরস্পরবিরোধী আদর্শ অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থখানির অন্যতম গৌরব ইহার মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও অবয়ব-বিশালতা। ইহা ছাড়া 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে যে বিপ্লবোন্মুখ, ভারকেন্দ্রচ্যুত নবীন সৃষ্টির স্বপ্নাবিষ্ট পৃথিবীর সাময়িক উদ্‌ভ্রান্ত রূপ স্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে—তাহা তাঁহার উপন্যাসের সর্বপ্রধান পরিচয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

(৮)

উপন্যাসে সাংকেতিকতা

জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ করিয়া উপন্যাস রচনা করিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল-নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, জননী, শহরতলী, চতুষ্কোণ প্রভৃতি উপন্যাসে ও অতসীমামী, সরীসৃপ, ভেজাল প্রভৃতি ছোটগল্পগ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা মানিকবাবু ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়া লইয়াছেন। এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার সুর ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য জীবন-আলোচনার স্বকীয় রীতি সুস্পষ্ট-হইয়াছে। তাঁহার 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' যে উদ্ভট কল্পনা-বিলাস ও সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যালোচনা লক্ষ্যগোচর হয়, তাহা—হয় মিশ্রিত ভাবে, কি এককভাবে মানিকবাবুর সমস্ত রচনাতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; উপন্যাসের আসরে এই নূতন সুর প্রবর্তনই তাঁহার মৌলিকতার নিদর্শন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৯)

রোমান্স-প্রধান উপন্যাস

বাস্তব-প্রধান যুগে রোমান্সের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া যে স্বল্প-সংখ্যক সাহিত্যিক লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত

স্থান অধিকার করিয়াছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারাশঙ্করের ছোট গল্পের সমষ্টি—জলসাঘর, রসকলি, হারানো সুর—তাঁহার ক্রমবর্ধমান শক্তির সুন্দর পরিচয়স্থল। ছোট গল্পের লেখক হিসাবে তারাশঙ্করের রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণাগ্র সাংকেতিক হৃদয়ের জটিল অরণ্যপথে বিচরণের স্বচ্ছন্দ নৈপুণ্য বা সাংকেতিকতা, অর্থগূঢ় প্রতিবেশ রচনা-কৌশলের অভাব। মনে হয় ছোট-গল্পের আঙ্গিক-ও তারাশঙ্কর সর্বত্র আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার রচনায় এমন একটা জীবনের রসোচ্ছলতা ও প্রকাশভঙ্গীর আন্তরিকতা বিদ্যমান যাহাতে আঙ্গিকের এই সমস্ত ত্রুটি ঢাকিয়া যায়। তারাশঙ্কর ততটা বোধ হয় আর্টিস্ট নহেন, যতটা জীবন-রসিক।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প

তারাশঙ্করের বড় উপন্যাসের মধ্যে অকৃত্রিমতা ও ভাষার ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস নীলকণ্ঠ, রাইকমল, পাষাণপুরী, আগুন, কবি প্রভৃতির মধ্যে শক্তির যে ক্রমোন্নতির সূচনা তাহাই দ্বিতীয় পর্যায়ের ধাত্রী-দেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়া উন্নততর প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ-পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই উপন্যাসগুলিতে রাঢ়ের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিভিন্ন স্তর চমৎকারভাবে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী উপন্যাসের তুলনায় এইগুলিতে বিষয়গৌরব, গঠনসংহতি, রসের গাঢ়তা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ-শক্তির উৎকর্ষ সুস্পষ্ট। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' তারাশঙ্করের উপন্যাসরাজির মধ্যে কেবল যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে তাহা নহে, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। একটা সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন ও মর্মরহস্য, সমগ্র সমাজবিন্যাসের মূলতত্ত্ব ও অন্তরপ্রেরণা এই উপন্যাসে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কোন ব্যক্তি বিশেষ নহে। হাঁসুলিবাঁকের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডল ও ইহাদের বেষ্টনরেখায় সংহত একটি মানবসমাজ। সমস্ত সমাজমনের এইরূপ ভাবঘন, অন্তঃসঙ্গতিশীল নিবিড় নিচ্ছিদ্র চিত্র যে কোন দেশের কথা সাহিত্যে বিরল। অজস্র ও অনর্গল স্রষ্টা তারাশঙ্করের পরবর্তী উপন্যাসসমূহের মধ্যে আরোগ্য নিকেতন, নাগিনী কন্যার কাহিনী, বিচারক, সপ্তপদী, রাধা, উত্তরায়ণ যোগভ্রষ্ট প্রভৃতিতে তাঁহার উৎকর্ষের মান ও রচনার বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ আছে।

তারাশঙ্করের উপন্যাস

রোমান্স-প্রবণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব

অবিসংবাদিত। মেঘমল্লার মৌরীফুল, কিন্নরদল প্রভৃতি গল্পসমষ্টির মধ্যে তাঁহার বিশেষত্বের চমৎকার নিদর্শন মিলে। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' দুই খণ্ড বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই তিন খণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ উপন্যাস একটি কল্পনাপ্রবণ অধ্যাত্ম স্বষ্টিসম্পন্ন জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির মহাকাব্য নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহার মৌলিকতা ও সরস নবীনতা বঙ্গসাহিত্যের গতানুগতিকতার মধ্যে একটি পরম বিস্ময়াবহ আবির্ভাব। প্রকৃতি-বর্ণনা, শৈশবচিত্র ও বাস্তবতার সুর বহিয়া আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ—এই ত্রিবিধ প্রভাবের অনবদ্য ভাব পরিণতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসকে বরণীয় করিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, বিপিনের সংসার উল্লেখযোগ্য। 'আরণ্যক' উপন্যাসটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিস্ময়কর—ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির। প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতি-ভূষণের উপন্যাসের গৌরব, তাহা আরণ্যকে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাংলা উপন্যাসে তো নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোজ বসুর রচনার মধ্যে 'বনমর্মর' ও 'নরবাঁধ' এই দুইটি ছোট গল্পের সমষ্টি তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন। অতি প্রাকৃতের খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় জগতের শিহরণ জাগাইবার অসাধারণ ক্ষমতা ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। মনোজ বসু পরবর্তীকালে অনেকগুলি জনপ্রিয় উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 'জলজঙ্গল', 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'বনকেটে বসত', 'আমার ফাঁসি হল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিষয়ের বৈচিত্র্য ও রচনার দ্রুত পারম্পর্য উভয়ই প্রমাণ করে যে মনোজ বসু উপন্যাসক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ গতি ও জীবনপর্যবেক্ষণ-শক্তি অর্জন করিয়াছেন।

মনোজ বসু

সার্থক ছোট গল্পের লেখক হিসাবে সুবোধ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ছোটগল্প-সংগ্রহ ফসিল, পরশুরামের কুঠার, শুক্লাভিসার, জতুগৃহ প্রভৃতির মধ্যে পরিকল্পনার মৌলিকতা ও আলোচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য—ছোটগল্পের এই উভয়বিধ উৎকর্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। সুবোধ ঘোষের প্রথম দিকের উপন্যাস তিলাঞ্জলি ও গঙ্গোত্রীর মধ্যে তেমন সার্থকতার আভাস নাই। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাস 'ত্রিযামা'তে সাংকেতিকতার প্রতি প্রবণতা-পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার অন্যতর শক্তিশালী

সুবোধ ঘোষ

উপন্যাস 'শতকিয়া'তে রূপকপ্রয়োগ আরও উন্নততর কালারীতির নিদর্শন—ইহা সমস্ত পাত্রপাত্রীর স্বরূপদ্যোতনা ও প্রকৃতির নিগূঢ় পরিচয়ের বাহনরূপে দেখা দিয়াছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প ও সম্পূর্ণ উপন্যাস উভয় দিকেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিষের ধোঁয়া, কালের মন্দির, তুমি সন্ধ্যার মেঘ প্রমুখ উপন্যাসগুলি সুলিখিত। তাঁহাদের আখ্যানভাগ সুসংবদ্ধ, চিত্তাকর্ষক এবং রচনানীতি সুমিত বাক্যপ্রয়োগ ভাবগ্রন্থন প্রভৃতি গুণে সুখপাঠ্য। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন গভীর অন্তর্ভেদী জীবন-পরিচয়ের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। চুয়াচন্দন, কানু কহে রাই, জাতিস্মর প্রমুখ গল্পগ্রন্থগুলিও সরস ও সুলিখিত।

(১০)

উপন্যাসের নব রূপায়ণ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) রচনার পরিকল্পনার মৌলিকতা আখ্যান-বস্তুর সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া মানবচরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উদ্রেক করে। উপন্যাসের আঙ্গিকের মধ্যে নানা নূতনত্বের প্রবর্তন-ও তাঁহার অন্যতম প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। তাঁহার প্রথম পর্বের রচনা—তৃণখণ্ড, কিছুক্ষণ, সে ও আমি প্রভৃতির মধ্যে মুখ্যতঃ ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বৈরথ, মৃগয়া, নির্মোক প্রভৃতির মধ্যে আঙ্গিকের ব্যাপারে তাঁহার পরীক্ষা-মূলক মনোভাব অনেকটা সংযত হইয়াছে। তৃতীয় পর্বের উপন্যাস মানদণ্ড, নবদিগন্ত ইত্যাদি মোটামুটি ঘটনা ও মনস্তত্ত্ব-প্রধান। চতুর্থ পর্বের স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যে নূতন উপস্থাপনা রীতি উদাহৃত হইয়াছে। তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ জঙ্গম উপন্যাসটিকে বনফুলের ঔপন্যাসিক সৃষ্টির সার্থকতম নিদর্শন রূপে অভিনন্দিত করা যাইতে পারে।

অন্যান্য শক্তিমান ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার, সজনীকান্ত দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির নাম। অতি নবীন ঔপন্যাসিকদের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ রচনাগুলির সন্নিবেশ এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে অনিবার্য কারণেই সম্ভব হইল না।

বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিকা

দশম—দ্বাদশ শতক

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়

পঞ্চদশ শতক

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	:	বড়ু চণ্ডীদাস
রামায়ণ	:	কৃত্তিবাস ওঝা
শ্রীকৃষ্ণবিজয়	:	মালাধর বসু
মনসামঙ্গল	:	বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস
পদাবলী	:	বিদ্যাপতি ঠাকুর

ষোড়শ শতক

মহাভারত	:	কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী
চৈতন্যভাগবত	:	বৃন্দাবন দাস
চৈতন্যমঙ্গল	:	লোচন দাস
চৈতন্যচরিতামৃত	:	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
পদাবলী	:	মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দদাস
চণ্ডীমঙ্গল	:	দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

সপ্তদশ শতক

মহাভারত	:	কাশীরাম দাস
রামায়ণ	:	অদ্ভুতাচার্য
মনসামঙ্গল	:	বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষমানন্দ
ধর্মমঙ্গল	:	রূপরাম, রামদাস আদক
শিবমঙ্গল (মৃগলুব্ধ)	:	রতিদেব
পদ্মাবতী	:	আলাওল

অষ্টাদশ শতক

ধর্মমঙ্গল	:	ঘনরাম
গোরক্ষবিজয়	:	শ্যামাদাস সেন, ফয়জুল্লা
ময়নামতীর গান	:	সুকুর মামুদ
শিবায়ন	:	রামেশ্বর চক্রবর্তী
অন্নদামঙ্গল	:	ভারতচন্দ্র
কালিকামঙ্গল	:	রামপ্রসাদ সেন
মহারাষ্ট্র পুরাণ	:	গঙ্গারাম

ঊনবিংশ শতক ঃ প্রথমার্ধ

লোক ও জন-সাহিত্য : [কবি পাঁচালী, যাত্রা, তর্জা, আখড়াই, টপ্পা, ঢপ ইত্যাদি]
হরু ঠাকুর, এণ্টনী ফিরিঙ্গি, রাম বসু, দাশরথি রায়, রসিক রায়, গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, মধুসূদন কিন্নর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি।

গদ্য নিবন্ধ : রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত।

সাময়িক পত্রিকা : মার্শম্যান, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত।

ঊনবিংশ শতক ঃ দ্বিতীয়ার্ধ

কাব্যপ্রয়াস ঃ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি।

গদ্যপ্রচেষ্টা : তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়,

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মীর মশারফ হোসেন প্রভৃতি।

উপন্যাস-রচনা : প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নাট্যনিবন্ধ : যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ সিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি।

বিংশ শতক : প্রথম পাদ

কাব্যপ্রয়াস : রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রিয়ম্বদা দেবী, সতীশচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচি, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, চিত্তরঞ্জন দাশ, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কিরণচাঁদ দরবেশ, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

গদ্যপ্রচেষ্টা : রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রামপ্রাণ গুপ্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ চৌধুরী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

গল্প-উপন্যাস-রচনা : রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা

ঘোষজায়া, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, মানিক ভট্টাচার্য, নরেশ সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি।

নাট্যনিবন্ধ ঃ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন রায়, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রভৃতি।